আলওয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজির উপর যে মহান্ কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তিনি তৎসম্পাদনের সময় উপস্থিত কি না জানিবার জন্য এবং ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ লাভের পক্ষে তাঁহার সহ ভ্রমণকারী গুরুভাইদিগের সহবাসও এক মহা অন্তরায় স্বরূপ দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, "গুরুভাইদের মায়া ত্যাগ করতে হবে, একলা ভ্রমণ করতে হবে, নইলে এদের রোগাদি হলে এদের জন্য বড়ই চিত্তচাঞ্চল্য আসে—এ এক মহা বিঘ্ন। তপস্যার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে হবে।" সেই আজ্ঞা লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ মন সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। নানা দেশে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া ভ্রমন করিয়া ভারতীয় জীবনের অনন্ত সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টাই সেই ভগবদাজ্ঞা লাভের তপস্যা স্থির করিয়া তিনি গুপ্তভাবে একাকী ভারতের নানাস্থানে পর্য্যাটন করিবেন, সংকল্প করিলেন এবং তদনুযায়িক দিল্লী হইতে গুরুভাইদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একেলা ভারতের পূর্ব্ব গৌরব স্থান রাজপুতানায় প্রবেশ করিলেন।

ইংরাজি খৃঃ অঃ ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই একদিন প্রভাতে স্বামীজি আলওয়ার ষ্টেসনে নামিলেন। আলওয়ার একটী আধুনিক রাজ্য; দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন দিল্লীর সম্রাটের বলবীর্য্য খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় প্রতাপ সিংহ নামে জয়পুরের বিখ্যাত মানসিংহের বংশোদ্ভব জনৈক রাজপুত, বিনা আয়াসে এই রাজ্য স্থাপন করেন।

রেল ষ্টেসনের পশ্চিমে আলওয়ার নগর, তাহার পশ্চিমে পর্ব্বত শ্রেণী; চতুর্দ্দিকেই ছোট ছোট পাহাড়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই চতুর্দ্দিকে ময়ূরগণের কেকারব; পথে প্রান্তরে বৃক্ষে অট্টালিকার ছাদে প্রাঙ্গনে তাহারা দিক্ আলো করিয়া, পথিকের আর অসহায় নিরাশা-পূর্ণ কৃষকের হৃদয়ে প্রাণপ্রদ আশাবীজ রোপিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যেন আনন্দে তাহাদের আশে পাশে নৃত্য করিতেছে, আর আহ্লাদ পূর্ব্বক 'আও আও' বলিয়া চীৎকার করিতেছে! তাহারা যেন ভারতের ভাবী গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়া

[illegible]

[illegible] আত্মারাম [illegible]

স্বামী [illegible] দেখিতে পাইয়া [illegible]

[illegible] চতুর্দিকে [illegible]

পরে [illegible] পথ দিয়া [illegible] হইয়া উপরে

[illegible] ঠিক সেই সময়ে [illegible]

[illegible]। স্বামীজি [illegible] প্রবেশ করিয়া আসিলেন, [illegible]

[illegible] সরকারী

চিকিৎসালয় [illegible] স্বামীজি চিকিৎসা-

[illegible] দেখিয়া বুঝিলেন যে, উনিই

সেই [illegible] এবং তাঁহাকে আপন মাতৃভাষায় সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, "[illegible] সন্ন্যাসী [illegible] স্থান হতে পারে?"

ডাক্তার [illegible] সহিত [illegible] দাঁড়াইয়া খুব স্বামীজিকে

নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, [illegible] ধীরে ধীরে স্বামীজির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা

সঞ্চারিত হইতেছিল। স্বামীজি আসিয়া তাঁহাকে [illegible] করিবামাত্র

[illegible] করিয়া [illegible] বলিলেন, "নিশ্চয়। আসুন

[illegible] তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চিকিৎসালয়ের [illegible]

[illegible] এবং বলিলেন,

"[illegible]"

স্বামীজি [illegible] ডাক্তার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিরাম নাই; শ্রোতৃবর্গের যাহার যাহা খুসি জিজ্ঞাসা করিতেছে। স্বামীজি কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। হৃদয়স্পর্শী উত্তরে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেছেন। হয়ত স্বামীজি ভাবে বিভোর হইয়া তীব্র বৈরাগ্য জ্ঞানমার্গ বা ভক্তিমার্গের কথা কহিতেছেন; ইতিমধ্যে একজন একটু সময় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন্ শরীর ?" স্বামীজি অমনি উত্তর করিলেন, "কায়স্থ শরীর।" আবার খানিক পরেই হয়ত এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী মহারাজ, আপনি গেরুয়া পরেন কেন ?" বাবাজি উত্তর করিলেন, "এটা ভিক্ষুকের বেশ। সাদা কাপড় পরে থাকলে অনেক দরিদ্র লোকে ভিক্ষে চায়। নিজে ভিক্ষুক, অনেক সময় কাছে এক পয়সাও থাকেনা যে তাদের দিই। আবার চাইলে না দিতে পারলে কষ্ট হয়। গেরুয়া পরা দেখলে তারা বোঝে যে, এও আমাদের একজন, এর কাছে আবার কি চাইব ?" পরক্ষণেই আবার সেই পূর্ব্ববৎ তত্ত্বপ্রবাহ চলিতেছে। ক্রমে সেই তত্ত্বপ্রবাহ চলিতে চলিতে মাকালীর কৃপা ও মহিমার প্রসঙ্গ আসিল, প্রাণ মাতিয়া উঠিল, স্বামীজির মুখে আর অন্য কথা আসিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" ধ্বনি হইতে লাগিল, সেই মধুর স্বর ক্রমে করুণ হইয়া অন্তরে মিলিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ স্থির, সেই আরক্তিম আয়ত লোচনদ্বয় হইতে বেগে প্রেমাশ্রু ছুটিতে লাগিল। শ্রোতাগণের প্রাণ আর্দ্র হইল ও তাঁহারাও নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সকলেই স্থির নিস্তব্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া স্বামীজির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। স্বামীজি আবার গান ধরিলেন; তাঁহার মধুর কণ্ঠপ্রবাহের সহিত নয়নের স্নিগ্ধবারি মিশিয়া সকলের প্রাণে ভগবদনুরাগের প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিল। আবার ক্ষণেক পরে নানা দেশের নানা কথায় হাঁসির হিল্লোলের মধ্য দিয়া অপূর্ব্ব উপদেশ দিতেছেন। দ্বিপ্রহরের সময় গৃহস্বামী পণ্ডিতজি স্বামীজিকে আহারে আহ্বান করিলেন। স্বামীজি সকলের নিকট বিদায় লইয়া ভোজনে গমন করিলেন এবং তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব স্থানে মধ্যাহ্ন ভোজনে গমন করিলেন।

ভোজনান্তে স্বামীজি বাহিরে আসিয়া দেখেন, নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে পুনরায় পূর্ব্বের মত জনতা হইল, এবং সেই প্রাণস্পর্শী কথার প্রস্রবণও ছুটিল। স্বামীজি বলিতে লাগিলেন—"মহাসাম্যবাদ আমাদের দেশে চিরকালই বর্ত্তমান। সেই সাম্যবাদ

স্বামী [illegible] তাঁহাকে আপনার নিকটে সকল প্রকার [illegible] করিতে লাগিলেন এবং অনেক [illegible] করিলেন। কোন্নগরের একটি [illegible] আছে। প্রায় এগার বৎসর পূর্বে সেখানে যাওয়া গিয়েছিল, [illegible] সেই [illegible] আছে। সেটি [illegible] টাকায় [illegible]

অতঃপর স্বামীজির [illegible] করিতে [illegible] প্রতিকাশালী [illegible] উপস্থিত হইয়াই [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] কার্য্যশেষ করিয়া স্বামীজির [illegible] পুনরায় [illegible] লাগিলেন। [illegible] কথা শুনিয়া [illegible] লাগিলেন। [illegible] বা উপনিষদ [illegible] করিয়া [illegible] তুলসীদাসের এবং তাঁহার [illegible] উল্লেখ করিয়া [illegible] দুই তিন দিন কাটিলে [illegible] করিয়াছিলেন যে, স্বামীজি [illegible] যাইয়া তাঁহাকে দর্শন [illegible] করিতে [illegible] হইতে পারে। [illegible] আপনাদের [illegible] স্বামীজিকে [illegible] বলিতে লইয়া গেলেন। [illegible] দান ও [illegible] তিনি [illegible] অনেক লোক তাঁহার [illegible] দেখা [illegible]

চর্চ্চা করিলে তাহাতে কুফল ব্যতীত সুফল ফলে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমে আপনার ধর্ম্ম সাধন করেন, তৎপরে অন্যান্য ধর্ম্ম সাধনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সেই এক ঈশ্বর লাভ।"

স্বামীজি প্রতি দিন বৈকালে যখন ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ দশ বার জন লোক থাকিতেন। ইতস্ততঃ পদচারণ করিয়া সকলে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিতেন। সন্ধ্যার পর সকলেই স্ব স্ব কার্য্য হইতে অবসর পাইয়াছেন, সুতরাং এই সময়ে জনতা আরও বেশী। স্বামীজি আসিয়া গান ধরিলেন—বাঙ্গালা কীর্ত্তন; সকলকে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া গাহিতে কহিলেন। দুই চারি দিন এইরূপ করিবার পর, সকলে তাঁহার সহিত সমস্বরে বেশ বাঙ্গালা কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত। রাজপুতানা বৈষ্ণবপ্রধান স্থান, কৃষ্ণ বিষয়ক গান সকলের অত্যন্ত ভাল লাগে, তাই স্বামীজি একদিন গাহিলেন,—

(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি॥

আমি মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কোন ঘরে মিলে প্রাণ বঁধু
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
আমি আপন বঁধুয়া আপনি বাঁধিব
রাখিতে নারিবে কেউ রে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ
নারী বধ দিব তারে॥"

স্বামীজি গানটী বুঝাইয়া দিয়া তৎপরে গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে দরবিগলিত অশ্রুধারায় সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল। সকলেরই চক্ষে জল, দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের প্রতি; কেহ ভাবিতেছেন, বাবাজি বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পাইতেছেন, তাই এত বিভোর, এত প্রেম! নতুবা আমরাও তাঁহাকে ডাকি, কিন্তু আমাদের ত এরূপ তন্ময়তা জন্মায় না। কেহ বা ভাবিতেছেন,—এই টুকু ঈশ্বরের বিভূতি, ইনি ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন। গান গাহিতে গাহিতে স্বামীজির স্বর করুণ হইতেও করুণতর হইয়া আসিল,

আকবর [illegible] সময় [illegible] ছিল। তিনি [illegible] একটী [illegible] করিয়া হিন্দু মুসলমান [illegible] [illegible] লোকদিগকে [illegible] [illegible] আপনি [illegible] করিতেন। [illegible] হইত। [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] অবমাননা [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] অবমাননা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কাই।—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কোন আপত্তি থাকবে না, এমন বন্দোবস্ত করা হবে। বৈটকখানার সমস্ত আসবাব সরিয়ে ফুল কেড়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে ঘরটী ধোয়াব। ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে পিত্তলের হাঁড়ি বাসন ইত্যাদি আনিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে বাজার করিয়ে রসুই করাব। স্বামীজি গিয়ে সেই ঘরে বসে সেবা গ্রহণ করবেন, আর এই সমস্ত ক্ষণ এই অধম যবন দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে আর চরিতার্থ হবে।" করজোড়ে মৌলভী মহাশয় এরূপ আন্তরিক নম্রতার সহিত পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি কহিলেন যে, উপস্থিত সকলে হাঁসিয়া উঠিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ও হাঁসিয়া সাদরে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন এবং কহিলেন, "স্বামীজি দরবেশ, ওঁর আবার জাত কি, ত্যাগী মহাত্মার ত ওসব কোনই বিচার থাকে না, আপনার এত করবার কোনও আবশ্যক ছিল না, আমার ত কোনই আপত্তি হতে পারে না, তবে আপনি স্বেচ্ছামত যে বন্দোবস্ত করেন সে আপনার অভিরুচি।" সকলেই একবাক্যে মৌলভী মহাশয়ের ভক্তি ও অকৃত্রিম দীনতায় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজি আবার কহিলেন, "ওরকম বন্দোবস্তে আমারি আপনার বাড়ী খাবার কোনই আপত্তি থাকে না, তা স্বামীজি ত মুক্ত পুরুষ; ওঁর ত আপত্তি হতেই পারে না।" সকলে আরও হাসিলেন এবং মৌলভী মহাশয়কে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

এদেশের হিন্দুগণের সহিত মুসলমানগণের এতই সদ্ভাব যে, তাঁহারা কোন মুসলমান বন্ধুর বাটীতে যাইয়া ফরাস পাতা উত্তম বিছানায় একত্রে উপবেশন করেন, এবং তাঁহাদের উপস্থিতি কালে মুসলমান বন্ধু সেই বিছানায় বসিয়া ভোজনাদি করিলেও কোন আপত্তি করেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তে পণ্ডিতজির কোনও আপত্তি জন্মিল না। মৌলভী মহাশয় প্রাণ ভরিয়া সাধু সেবা করিলেন। মৌলভী মহাশয় এই মহাপুরুষের সেবা করিয়াছেন দেখিয়া অপরাপর ঈশ্বরানুরাগী মহাশয় মুসলমানগণও তদ্রূপ সাধুসেবা করিবার জন্য অতি আগ্রহ সহকারে স্বামীজিকে আপনাদের বাটী লইয়া যাইতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে ধনী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত নির্ধনের বা নিম্নপদস্থ লোকের বাটীতে গমন করিতে কোন প্রকার অভিমান প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এখানে মানের ভয়েই হউক বা যে কোন কারণেই হউক উচ্চপদস্থ ধনী ব্যক্তিকে নির্ধন বা নিম্নপদস্থ লোকের বাটী গমন করিতে প্রায় দেখা না। পণ্ডিত শম্ভুনাথজি অপেক্ষা উচ্চপদস্থ লোকেরা সেই জন্য স্বামী-

[illegible]

মঙ্গল সিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন, "বাবাজি মহারাজ, এই যে সকলে মূর্ত্তি পূজা করে, আমার তাতে বিশ্বাস নেই। তা আমার গতি কি হবে?"

স্বামীজি একটু বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "একি ঠাট্টা হচ্ছে?"

মঙ্গল সিংহ কহিলেন, "না স্বামীজি, ঠাট্টা নয়। আমি ও কাঠ মাটী পাষাণ ধাতু ওসবের উপাসনা করতে পারিনি। তা কি আমার সদ্‌গতি হবে না?"

স্বামীজি উত্তর করিলেন, "যাঁর যেমন বিশ্বাস তাঁর তাই ভাল।"

স্বামীজির এবম্প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া উপস্থিত অন্যান্য সকল লোকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা সকলেই মূর্ত্তিপূজায় দৃঢ়বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণভক্ত। স্বামীজির কৃষ্ণভক্তি তাঁহারা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং একদিন তাঁহাকে বিহারীজির সমক্ষে প্রেমে বিভোর হইয়া গড়াগড়ী দিয়া অশ্রুজলে ভাসিতেও দেখিয়াছেন। তবে কেন তিনি এরূপ কথা বলিলেন, সকলের মনে এই সমস্যা জাগিয়া উঠিল।

শ্রী শ্রমণক।] [ক্রমশঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী।

শ্রী গুরুদাস বর্ম্মন্‌।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরানাথকে জানাইলেন যে, তাঁহার সোণার থালে আহার করিবার অতিশয় বাসনা হইয়াছে। মথুরানাথ তখনি একজন স্বর্ণকার ডাকাইয়া একপ্রস্থ সোনার থালা বাটী গেলাস প্রভৃতি তৎপর প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। স্বর্ণকার দুই চারি দিবস পরে সেই সমস্ত বাসন প্রস্তুত করিয়া আনিলে প্রভুদেব বালকের মত মহানন্দে তাহাতে আহার করিতে বসিলেন কিন্তু আহার করিতে করিতে তাঁহার ভাবাবস্থা আসিল—তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। হৃদয় তাঁহার মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া আহার করাইয়া দিলেন। এই একবার মাত্র ব্যবহার করিয়াই তিনি সেই সমস্ত বাসন ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার সাধন অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন মতের সিদ্ধ পুরুষগণ তাঁহার নিকট আসিতেন, এবং ভাল ভাল সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব পরমহংস বাউল সাঁই দরবেশ যে কত আসিতেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহার সাধনায় প্রায় শেষ অবস্থায় তোতাপুরী নামক একজন উলঙ্গ পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। ইনি সাত শত নাগার প্রধান ছিলেন এবং হৃষীকেশে থাকিতেন। যদিও ইঁহার শাস্ত্রবিদ্যা অধিক ছিল না তথাপি তাঁহার প্রভূত দৈবশক্তি ছিল। পৌষ মাসে গঙ্গাসাগরে স্নান করিবার জন্য হৃষীকেশ হইতে গঙ্গাসাগরে যাইবার পথে রাণীরাসমণির দক্ষিণেশ্বরস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়ে তিন দিবস মাত্র অবস্থিতি করিয়া যাইবেন, এই মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব আপন মনে করতালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া আপন প্রকোষ্ঠে পদচারণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রতি তোতাপুরীর দৃষ্টি পড়িল। তোতা শুষ্ক অদ্বৈতবাদী, বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যা, রোটী ঠোকতে হো? তোম কুছ বেদান্ত শিখোগে?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হামারা মাই কহেগা তো শিখেগা।" তোতা মনে করিলেন, বালক আপন গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন; বলিলেন, "তব্ যাও তোমারা মাইকো পুছো।" রামকৃষ্ণদেবও সরল বালকের ন্যায় "আচ্ছা" বলিয়া দ্রুতপদে কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি মা কালীর আজ্ঞাবহ সন্তান, যখন যে কার্য্য করেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তবে করেন। একথাও মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মা বলিলেন, "হঁ্যা শেখ্।"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শেখাবে মা?"

কালী উত্তর করিলেন, "ওই তোকে বেদান্ত শেখাবার জন্যে এসেছে। ওরি কাছে শেখ্।"

রামকৃষ্ণদেব কালী মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভাবস্থ হইয়া এইরূপ প্রশ্নোত্তর আপনাপনি করিয়া তৎপরে তোতাপুরীর নিকট পুনারাগমন করিলেন এবং কহিলেন, "হাঁ, আমারা মাই বোলা হায়, তোমারা পাশ বেদান্ত শিখেগা, তুম্ শিখাও!"

তোতাপুরী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাহাতে রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ন্যাসী হইতে হইলে কি করিতে হইবে? তোতা তদুত্তরে

কহিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ হোমাদি করিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব তাহা সমস্তই করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু কহিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া অন্যত্রে যাইতে পারিবেন না। তোতা কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন যে, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী জীবিতা আছেন, সন্ন্যাসী হইতে দেখিলে তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইবেন, কারণ তাঁহার আর কোন পুত্র জীবিত নাই। তোতা পুরী ইহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ কালী মন্দির মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং বেদান্তের উপদেশ মত 'নেতি নেতি' বিচার শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ ধ্যানের প্রথমাবস্থায় তিনি যে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতেন, এই সময় ধ্যানে বসিয়া তৎসমুদয় নেতি নেতি বিচার পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া তাহার অতীত অবস্থায় গমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিচার ও ধ্যান করিতে করিতে নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তদবস্থায় তিন দিবস রহিলেন। রামকৃষ্ণদেব কেবল মাত্র তিন দিবস বেদান্ত মতে বিচার ও সাধনা করিয়া নির্বিকল্প সমাধিস্থ এবং ব্রহ্মে অবস্থিত আছেন দেখিয়া তোতা পুরী অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "চল্লিশ বরস্ সাধনা করকে হামারা যো অওস্থা নেহি মিলা হ্যায় তিন রোজ সাধনা করকে ইন্‌কো ওহি অওস্থা হুয়া! ইএ ক্যা দৈবী মাযা হ্যায়!! ইএ ক্যা দৈবী মাযা হ্যায়!!" পরে এক দিবস তোতা পুরী রামকৃষ্ণ-দেবকে বলিলেন যে প্রত্যহ ধ্যান করা আবশ্যক, এবং উপমা দিলেন যে একটী ঘটি প্রত্যহ না মাজিলে অপরিষ্কার হইয়া আইসে। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, যদি স্বর্ণময় ঘটি হয় ত তাহা না মাজিলেও সে কখন অপরিষ্কার হয় না। তোতা পুরী স্বয়ং প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান করিতেন এবং সর্ব্বদা সম্মুখে একটী ধুনী জ্বালাইয়া রাখিতেন। সেই ধুনীটীকে এতই পবিত্র জ্ঞান করিতেন যে, কোন গৃহস্থ কিম্বা অন্য কোন লোককে তাহা স্পর্শ করিতে দিতেন না। এক দিবস তিনি ধুনীর নিকটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ভারী আসিয়া সেই ধুনী হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিল। তোতাপুরী তদ্দর্শনে অতিশয় কুপিত হইয়া ভারীকে গালাগালি দিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে পঞ্চবটীতে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন; এখন ভারী পলায়মান এবং তোতাপুরী প্রহারে উদ্যত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবমান দেখিয়া, তিনি তোতাপুরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিতে লাগিলেন, "আরে দুর, দুর; তোর এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে! আরে দুর, তোর এখনো এত ভেদবুদ্ধি! তোর এখনো এত ভেদবুদ্ধি।"

তোতাপুরী এই কথা শ্রবণ মাত্র চমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহা অপরাধীর ন্যায় রামকৃষ্ণদেবের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ তোম্ ঠিক বাতায়া, ভাই ঠিক বাতায়া, মেরা কসুর হুয়া হ্যায়! বড়া কসুর হুয়া হ্যায়!" তোতাপুরী রামকৃষ্ণদেবের নিকট এইরূপে আপন অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং তদবধি তাঁহাকে শিষ্যের মত না দেখিয়া আপন গুরুভাইয়ের মত দেখিতেন ও তাঁহার সহিত সেই মত ব্যবহার করিতেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে তোতাপুরীর অত্যন্ত পেটের পীড়া উপস্থিত হইল; যন্ত্রণায় অস্থির, কোন উপায়েই যন্ত্রণা নিবারণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া ক্রমে এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তোতা রাত্রিকালে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছায় জলে নামিতে লাগিলেন। যতদূর গমন করেন তাঁহার জানুর উপর আর জল উঠে না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, যন্ত্রণার উপশম কিছুতেই হইল না; এমন সময় রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, "তুম্ হামারা মাইকো পাশ্ প্রার্থনা করো, শান্তি হোগা।"

তোতাপুরী সাকার দেবদেবী মানিতেন না, তথাপি নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে আশু অব্যাহতি পাইবার আশায় অগত্যা মা কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিলেন। যে দিন প্রার্থনা করিলেন, সেই দিবসেই সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইল! তোতাপুরী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, সমস্ত দেবদেবী মানিতে লাগিলেন, এবং রামকৃষ্ণদেবের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, "তোমারা পরমহংস অওস্থা হুয়া হ্যায়।"

তোতাপুরী একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম উচ্চারণ না করিয়া তাঁহাকে 'ন্যাংটা' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তোতাপুরীর কথা মত ঐ সময় হইতে রামকৃষ্ণদেবকে সকলে 'পরমহংস' বলিয়া ডাকিতেন। রামকৃষ্ণদেবের সহিত বেদান্ত বিচার ও ঈশ্বরীয় নানা প্রসঙ্গ, তাঁহার অদ্ভুত ঐশীশক্তি এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাবেই সেই এক পরমানন্দের ভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া তোতাপুরী তিন দিবসের স্থলে কএক মাস কাল তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এক দিবস তিনি রামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন যে,

তোতা তিন দিনের অধিক কুত্রাপি থাকেন না কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে কি যাদু করিয়াছেন যে, তিনি এস্থান হইতে যাইতে পারেন না? ইহার উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার যতদিন বেদান্ত সাধনা ঠিক না হয় তত দিন তোতাকে ছাড়িবেন না। তোতাপুরী রামকৃষ্ণদেবের আকর্ষণে একাদশ মাস তথায় থাকিয়া পরে বিনীত ভাবে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে স্বয়ং বলিতেন, "ন্যাংটা ট্যাংটাকে যে গুরু করে ছিলুম, সেটা কেবল বেদ বিধির প্রমাণ আর তার মান্য রাখবার জন্যে। সাধনার সময়ে আমার ভেতর থেকে ঠিক আমার মত এক সন্ন্যাসী বালক মূর্ত্তি বার হোয়ে আমাকে উপদেশ করত। আর যতক্ষণ না সেই মূর্ত্তি আবার শরীরে ঢুক্‌তো ততক্ষণ বাহ্যজ্ঞান হত না।" তিনি যাঁহাদিগকে গুরু করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে তাঁহাকে আপনাদের গুরুভাবে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার এরূপ উজ্জ্বল আভাযুক্ত কান্তি এবং এমন শক্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইয়া থাকিত, এবং যিনি যাহা মনে করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেন, তাঁহার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইত। এমন কি সেই সময়ে কোন উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি রামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র রোগী আরোগ্য লাভ করিতেন। রামকৃষ্ণদেব এই ভাব গোপন করিবার জন্য সর্ব্বদা একখানি ঘনবস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিতেন। কিন্তু ক্রমে বস্ত্রের উপর হইতেও সেই আভা দেখা যাইত। অবশেষে তিনি মাকালীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা এভাব চেপে দে মা, এভাব চেপে দে।" এইরূপ প্রার্থনা করিবার কিছু পরে তাঁহার ঐভাব বিলুপ্ত হয়।

ভক্তি অনুরাগ বিহীন লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করা তাঁহার পক্ষে এই সময়ে অতীব কষ্টকর হইয়া উঠে, এবং সেই জন্য চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির সন্ধান পাইলে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন শুনিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি। ইহা শুনিয়া মথুরানাথকে কহিলেন যে, একবার দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন। মথুরানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থায় দুই জনে এক বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন এবং সেই জন্য পরস্পর আলাপও ছিল। মথুরানাথ একদিন

রামকৃষ্ণদেব ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া দেবেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব কটিদেশে বস্ত্রাদি রাখিতে পারিতেন না, এজন্য কেবল মাত্র একখানি মোটা চাদরে আবৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রকোষ্ঠে মথুরানাথ প্রবেশ করিলেন, রামকৃষ্ণদেব সেই প্রকোষ্ঠের সম্মুখের দালানে হৃদয়ের সঙ্গে পদচারণ করিতে লাগিলেন। মথুরানাথ যাইয়া দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার আগমন সম্বাদ দিলেন। তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া ভিতরে লইয়া উপবেশন করাইলেন।

উপবিষ্ট হইয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং তৎপরে ক্রমে সহজাবস্থা আসিলে কহিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি, কলিকালের জনক। সংসারে থেকে ভগবানে মন রাখতে পেরেছ।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা তুমি গায়ের কাপড় খোল, আমি দেখব।" দেবেন্দ্রনাথের পরিধানে একখানি বস্ত্র ও গাত্রে একটী পিরান ছিল। দেবেন্দ্রনাথ পিরান খুলিলে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন, "তুমি কিছু ঈশ্বরীয় কথা বল।"

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই সংসারটা যেন গ্যাসের ঝাড় আর জীব যেন তারি এক একটী বাতি জ্বলছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভুদেব পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধি ভঙ্গের পর কহিলেন, "ঠিক বটে, তাই বটে। কিন্তু তুমি কি বুঝলে বল।"

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, 'সেই এক ব্রহ্ম হতেই এই জগতের উৎপত্তি। গ্যাস যেমন সেই গ্যাস ঘর থেকে সকল বাতির মধ্যে এসে জ্বলছে, তেমনি প্রত্যেক জীবের ভেতর তিনিই চৈতন্য রূপে বিরাজ করছেন।" এই কথা শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণদেব পুনরায় ভাবস্থ হইলেন। এইরূপ আরও ঈশ্বর প্রসঙ্গের পর তথা হইতে বিদায় লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমাদের সমাজের উৎসবে আপনাকে আস্‌তে হবে।"

রামকৃষ্ণদেব। "সে মার ইচ্ছা।" বলিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ মথুরানাথকে কহিলেন, "দেখ, সেদিন অনেক ভদ্রলোক আসবেন। তুমি ওঁকে কাপড় চোপড় পরিয়ে এন।"

মথুরানাথ কহিলেন, "সে ওঁর ইচ্ছা। আমার কথায় কিছুই হবে না।"

মথুরানাথ তাঁহার ইষ্টদেবতাকে গাড়ীতে উঠাইয়া বলিলেন, "বাবা, দেবেন্দ্রের বড় ইচ্ছে যে তুমি তাদের উৎসবে একবার যাও।" কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরদিন দেবেন্দ্রনাথ পত্রদ্বারা মথুরকে জানাইলেন যে, পরমহংসদেব যদি বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক সভ্য হইয়া আইসেন ত ভাল নতুবা তাঁহাকে আনিবার আবশ্যক নাই।

রামকৃষ্ণদেবের এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম সাধন করিবার ইচ্ছা হইলে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব গোবিন্দ চন্দ্র রায় নামক জনৈক দরবেশ সাধক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহারই নিকট 'আল্লা মন্ত্র' গ্রহণ করিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কাছা খুলিয়া 'আলা আল্লা' স্মরণ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং এই ভাবে তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। এই তিন দিবস কালী বা অন্য কোন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না, কোন দেবদেবীর নামোচ্চারণ করিলেন না। মন্দিরগুলির উত্তরে রাণীর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যে অট্টালিকা আছে, তথায় যে সকল হিন্দু দেবদেবীর ছবি ছিল, সে সমস্ত স্থানান্তরিত করিয়া তন্মধ্যে এই কয় দিবস বাস করিলেন। আল্লা মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই মুসলমানের দ্বারা রন্ধন করাইয়া আহার করিবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মথুরানাথ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "সে কি বাবা! মোছলমানের হাতে কি খেতে আছে, নিন্দে হবে যে! আমি একজন ভাল মোছলমান রসুয়ে এনে দিচ্ছি। সে দেখিয়ে দেবে, আর একজন ভাল ব্রাহ্মণ রসুয়ে রাঁধবে। তাই খাওনা কেন?"

বালকস্বভাব রামকৃষ্ণদেব অমনি কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা বেশ তাই হবে।" মথুরানাথ তদ্দণ্ডে লোক পাঠাইয়া একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পাচক ও একজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ পাচক আনাইলেন। ব্রাহ্মণ পাচক মুসলমান পাচকের কৌশল মত পলাণ্ডু প্রভৃতি যুক্ত মুসলমান প্রথায় নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করেন। রামকৃষ্ণদেব এই তিন দিবস সেই সকল আহার করিলেন, এবং সর্ব্বদা কাছা খুলিয়া আল্লা আল্লা বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইতেন এবং তদবস্থায় পয়গম্বর মহম্মদকে দর্শন করিতেন। এক দিবস মসজিদে যাইয়া নামাজ করিবার প্রবল বাসনা হইলে তিনি ক্রমে ভাবস্থ হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী মসজিদে উপস্থিত হইয়া তথায় নামাজ পড়িতে লাগিলেন; এদিকে

হৃদয় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অবশেষে সেই মসজিদে যাইয়া দেখিলেন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নামাজ করিতেছেন। হৃদয়ানন্দ তাঁহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র তিনি বালকের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন মথুরানাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন, "রামকৃষ্ণদেব যথার্থ কামজিৎ হয়েছেন কি না পরীক্ষা করতে হবে।" এই ভাবিয়া গুপ্তভাবে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক অনেকগুলি সুন্দরী বার-বনিতাকে একটী বাটীতে আনাইয়া তাহাদের বলিলেন, "দেখ তোমাদের একটা কাজ করতে হবে। আমি একজন লোককে আজ এখানে নিয়ে আসবো। আর তোমরা তাঁকে নানা রকম হাব ভাব দেখিয়ে তাঁর কামভাব জাগিয়ে দেবে।" তাহারা সকলেই সম্মত হইলে মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে কোন কথা না বলিয়া কলিকাতায় লইয়া চলিলেন, হৃদুও সঙ্গে চলিলেন। গাড়ী আসিয়া সেই বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল। মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া যে ঘরে বারবনিতাগণ তাঁহার জন্য বসিয়াছিল সেই ঘরে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া হৃদয়কে লইয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন। বেশ্যারা নানাবিধ বেশভূষা করিয়া অর্দ্ধ-বিবসনা হইয়া বসিয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব ঘরে প্রবেশ করিয়া, "মা আনন্দময়ী মা আনন্দময়ী" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাদের প্রণাম করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কটিদেশ হইতে খসিয়া পড়িল এবং তিনি দিগম্বর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বারবনিতারা তাঁহার এই ভাব দেখিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিত রহিল। পরে পরস্পর কহিতে লাগিল, "এঁর ত দেখছি কাম্ কাম্ কিছুই নেই!"

কেহ বলিল, "ইনি যে দেখছি মহাপুরুষ!"

অন্য একজন বলিল, "আমরা বেশ্যাবৃত্তি করি বটে, কিন্তু আজ আমাদের মহাভাগ্যি যে এ রকম মহাপুরুষ দর্শন হল।"

আবার একজন কহিল, "দিদি, বহু জন্মের পুণ্যি না থাকলে এমন মহাপুরুষের দর্শন হয় না।"

এইরূপ নানা কথা সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "হাঁ দিদি কি সর্ব্বনাশই করেছি ভাই, আজ আমরা এই মহাপুরুষকে লোভ দেখাতে গিছলুম। আমরা ত ভাই

মহা অপরাধ করেছি!" অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, "হাঁ ভাই, তাই ত এ যে মহাপুরুষের সঙ্গে ঢঙ করতে গিয়ে মহা অপরাধই হয়েছে, এখন যে সর্ব্বনাশ হবে তার উপায় ?" এই বলিয়া সকলে অতীব ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মথুরানাথ ও হৃদয় বারাঙ্গনাদের কোলাহল শুনিয়া তথায় আসিলেন এবং তাহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বারাঙ্গনাগণ তখন যাহার কথায় এরূপ মহাপুরুষের নিকট অপরাধী হইয়াছে, সেই মথুরকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "এখন আমাদের যে সর্ব্বনাশ হবে তার উপায় কি ?" রামকৃষ্ণদেব এই সময় সহজাবস্থা প্রাপ্ত ও তথায় উপবিষ্ঠ হইয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া মুখে ক্রমাগত মা আনন্দময়ীর নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর তাহারা পুনরায় তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি প্রস্থানের জন্য দণ্ডায়মান হইলে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া দিলেন, তৎপরে তিনজনে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে মথুরানাথ প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেবকে আপনার ফিটনে লইয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। এক দিবস মথুর তাঁহাকে জানবাজারে লইয়া যাইবার জন্য ফিটনে করিয়া যাইতেছেন, পথে বরাহ-নগরের নিকট এক সংকীর্ত্তনের দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দেখিয়া রামকৃষ্ণদেবের সেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য করিতে অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা হইল। গাড়ী সংকীর্ত্তনের দলকে ভেদ না করিয়া তাহার সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি তাঁহার হৃদয় হইতে রজ্জুবৎ ঘনীভূত জ্যোতি বাহির হইয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার অনুরূপ একটী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই দলের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, আর কীর্ত্তনও খুব জমিয়া গেল। এইরূপে সেই মূর্ত্তি সেই কীর্ত্তনে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া পুনরায় তাঁহার দেহে আসিয়া প্রবেশ করিলে তৎপরে তাঁহার সংজ্ঞাবস্থা আসিল। মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে এতই যত্ন করিতেন যে যখন তাঁহাকে লইয়া জানবাজারে রাখিতেন তখন সমস্ত বিষয়কর্ম্মত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার পরিচর্য্যাই করিতেন এবং রাত্রিতে তাঁহাকে অন্দরে আপন শয়ন কক্ষে উত্তম পর্য্যঙ্কে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহার নিকটে অন্য এক পর্য্যঙ্কে আপনি শয়ন করিতেন। এই সময়ে এক অনুপলের জন্যও তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না।

মথুরানাথ কিছুদিন পরে একটী স্ফোটকের যন্ত্রণায় শয্যাগত—জানবাজারে আছেন; রামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হওয়াতে তিনি তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই লোককে কহিলেন, "গিয়ে কি করব? আমি কি তার ফোড়া আরাম করতে পারব?" তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, লোকটী যাইয়া মথুরকে ঐ কথা জ্ঞাপন করিল। মথুর আরও ব্যাকুল হইয়া তাহাকে পুনরায় তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। নিতান্ত ব্যাকুলতা বুঝিয়া রামকৃষ্ণদেব জানবাজারে গমন করিলেন। মথুর তাঁহাকে দর্শন করিয়াই পরম আনন্দে কহিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধুল দেও।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "পায়ের ধুল নিয়ে কি হবে? তোমার ফোড়া আরাম হবে কি?"

মথুর কহিলেন, "বাবা ফোড়ার জন্যে ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্যে তোমার পায়ের ধুল চাইছি!"

মথুরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তিনি সমাধিস্থ হইলেন; এবং মথুরানাথ হামাগুড়ি দিয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া অবধি রামকৃষ্ণদেব আর কোন প্রকার ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেন না; তাঁহার দেহ কোন প্রকার ধাতুর সংস্পর্শে আসিলেই অমনি সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত ও তাঁহার মহা যন্ত্রণা উপস্থিত হইত এবং ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পন্দ হইয়া হৃৎপিণ্ডের গতি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। সেই জন্য হৃদয় তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছায়ার মত থাকিয়া সর্ব্বদা সেবা করিতেন। একদিন হৃদয় তাঁহাকে মাকালীর প্রসাদ খাওয়াইয়া তাঁহার মুখ ধৌত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে আপন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিতে কহিলেন। তৎপরে স্বয়ং আহার করিতে বসিলেন। এদিকে রামকৃষ্ণদেব ভাবের ঘোরে আপন প্রকোষ্ঠে না গিয়া গঙ্গার তীরে যাইতে লাগিলেন। দেবালয়ের একজন দাসী রামকৃষ্ণদেবকে মাতালের ন্যায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া দৌড়িয়া হৃদয়কে কহিল. "ওগো পরমহংস বুঝি গঙ্গায় পড়ে যান। শিগ্‌গির দৌড়ে যাও, দৌড়ে যাও, বেহুঁস হয়ে গঙ্গার দিকে যাচ্ছেন।" হৃদয় তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ দিকের পোস্তার ধারে একপদ আছে, অপর পদ ভাগীরথী গর্ভে পড়িতেছে! হৃদয় তাঁহাকে একবারে দুই হস্তে বেড়িয়া নিজ বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন।

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য যদুনাথ মল্লিক রামকৃষ্ণদেবকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট আসিতেন এবং নিভৃতে তাঁহার সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গে মহানন্দ ভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে অতি যত্নসহকারে আপনার দক্ষিণেশ্বরস্থ উদ্যানে লইয়া যাইতেন। এক দিবস রামকৃষ্ণদেব উক্ত মল্লিকের উদ্যানের একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে যিশু খ্রীষ্টের একখানি প্রতিকৃতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং তদবস্থায় জ্যোতির্ম্ময় যিশু মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই মূর্ত্তি ক্রমেই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং "চড়্ চড়্ করিয়া তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিল ;" তিনি চেষ্টা করিয়াও কোনমতে তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। সেই মূর্ত্তি তাঁহার মধ্যে প্রবেশ মাত্র সমস্ত হিন্দু ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত ও তৎপরিবর্ত্তে কৃশ্চানীভাবের উদয় হইল এবং তিনি তাহা নিবারণ করিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন, "মা, এ আবার কি করে দিলি মা, এ আবার কি করে দিলি ?" ইহার পর তিন দিবসাবধি তাঁহার এই ভাব বর্ত্তমান ছিল, এবং তিনি সেই অবস্থায় ভাবাবিষ্ট হইয়া গির্জ্জা ও পাদ্রিগণকে দর্শন করিতেন। একদিন গির্জ্জায় যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে সিন্দুরিয়াপটীর শম্ভুচরণ মল্লিকের নিকট কিছুদিন বাইবেলের যিশুতত্ত্ব শ্রবণ করিতেন।

ক্রমশঃ।

ভিক্ষা।

কত দিন সব প্রভো ! আর এই জ্বালা
প্রাণে কত সয় ? অপূর্ব্ব চরিত্র তব
নেহারি নয়নে যে আদর্শ জীবনের
ভাসে হৃদাকাশে, তুচ্ছ অতি তার পাশে
মোহের মোহনকরী সংসারের ধন—
যশ, মান, কামিনী, কাঞ্চন। ছেলেদের
ধূলি-খেলা সে সকল মানি। জীবনের
ক্ষুধা কভু মিটে কি হে তায় ? যদি কভু
মোহের আবেশে, পূর্ব্ব সংস্কারের বশে,
কু-বাসনা কাল-মেঘ উঠি হৃদাকাশে

ক্ষণেকের তরে, জীবনের ধ্রুব তারা
করে আচরণ, পথ-ভ্রান্ত পথিকের
প্যারা ঘুরে ঘুরে মরি, কভু বা নেহারি
তৃষিত নয়নে সংসারের সুখ পানে।
কিন্তু যবে পরক্ষণে, উদ্ভাসিত ঝল
ঝলি তব মুখ-ছবি, কি জ্বালায় জ্বলে
উঠে প্রাণ, কি আর বলিব নাথ! জান
সব, অন্তর্যামী তুমি। অসংখ্য বৃশ্চিক
যদি দংশে এককালে, সেও বুঝি তার
চেয়ে ভাল। বল নাথ কৃপা করি, কত
দিন যাবে এই ভাবে? বলে দাও—
কবে যাবে হৃদয়ের মলিনতা যত?
কবে চাহি নিজ পানে, আনন্দেতে পূর্ণ
হবে প্রাণ; দেখিব আপনে একীভূত
আদর্শের সনে! নাহি আর রিপুর তাড়না;
ভস্মীভূত যতেক বাসনা; শান্ত মন;
হৃদিগ্রন্থি খসে যাবে, দূরে পলাইবে
সকল সংশয়। আনন্দের উৎস উঠি
হৃদয় মাঝারে, প্লাবিত করিতে বিশ্ব
চরাচর; ভেসে যাব আপনিও তায়।
বহু আর না রহিবে, তুমি একা বিরাজিবে,
আদি-অন্ত-মধ্যহীন আনন্দ সাগর।
সে শুভ মুহূর্ত্ত দেব! আনহ সত্বর॥
কত কথা শুনাইয়া, কত ভাব প্রদর্শিয়া,
তুমিই রোপেছে হৃদে এ সাধ আমার।
তুমি না পুরালে সাধ যাব কোথা আর?
দিয়া সাধ না মিটাবে, তুমি নিদারুণ হবে,
এ কথা কি স্থান পায় মনেতে আমার?
আমি যে দেখেছি—তুমি দয়া অবতার॥

ভিখারী—

শিব সঙ্গীত।

(স্বামী বিবেকানন্দ রচিত।)

[স্বামী বিবেকানন্দ রচিত নিম্নলিখিত নূতন সঙ্গীতটী আমরা সম্প্রতি স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট হইতে পাইয়াছি।]

সুরফাঁকতাল।

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিণাকপাণি॥
ঊর্দ্ধ জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাধনা (কাব্য) শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। ৯নং হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট হইতে প্রকাশিত। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আলোচ্য কাব্যখানিতে ৪৬টী কবিতা আছে। সময়াভাবে সবগুলি পড়িতে পারি নাই—কয়েকটী পড়িয়াছি। 'উড়িষ্যায় জগন্নাথ দর্শনে' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। লেখিকার লেখার ভিতরে ভাব আছে, একটা স্বাভাবিকতাও আছে। কাব্যখানি পাঠের যোগ্য।

শ্রীহট্টে ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

আমরা উদ্বোধন পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছি যে, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত কামারখাল নামক গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন হইতে একটী দুর্ভিক্ষ মোচন-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তথায় যিনি কার্য্য করিতে গিয়াছেন, তাঁহার পত্র হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই সেখানে কিরূপ ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, পাঠকবর্গ তাহার কিছু আভাস পাইবেন।

কামারখাল

(শ্রীহট্ট)

৮ই ডিসেম্বর, ১৯০৬।

"বিগত ২রা ডিসেম্বর তারিখে নোয়াখালি হইতে রওনা হইয়া সোমবার প্রাতে এই জেলান্তর্গত করিমগঞ্জ সাবডিভিজানে আসিয়া পৌঁছি। সেখান হইতে সংবাদ লইতে লইতে ক্রমশঃ মঙ্গলবার শ্রীহট্ট সহরে আসি। সেখানে স্থানীয় দুর্ভিক্ষমোচনসমিতির (যাঁহারা সংবাদপত্রে আবেদন করিয়াছিলেন) সভ্যগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষপীড়িত জানিতে পারিয়া অতি কষ্টে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ক্রমাগত ৬ দিন ধরিয়া কখন ট্রেনে, কখন নৌকায়, কখন ষ্টিমারে, কখন বা পদব্রজে আসিতে হইয়াছে। কামারখাল গ্রামটী শ্রীহট্ট জেলার সোনামগঞ্জ সাবডিভিজনের মধ্যে নৈগাং পরগণার এলাকায়। এই পরগণার পার্শ্বে আর ২টী পরগণা আছে—পাগলা ও পাতয়াজান। সেখানেও কষ্টের একশেষ। নৈগাং পরগণায় ৮০টী গ্রাম। আমরা আসিবার সময় পাগলা পরগণা এবং এই নৈগাং পরগণার কতকাংশের মধ্য দিয়া প্রায় ১০ মাইল হাঁটিয়া আসিয়াছি! এই ১০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত মাঠ দেখিলাম, তাহাতে ধান্যের লেশমাত্র নাই, সম্পূর্ণ শুষ্ক। আমন ধান এই তিন পরগণায় আদৌ হয় নাই। শ্রীহট্টের অন্যান্য অংশে কিছু কিছু ধান হইয়াছে বটে; কিন্তু এ দেশে যাতায়াতের অথবা মাল সরবরাহের উপায়ের এতই অভাব যে, এক স্থানের জিনিষ অন্য স্থানে আনা বড়ই কঠিন। এখানকার লোকগুলির একমাত্র ভরসা এক্ষণে আগামী বৈশাখ মাসের বোরো ধান। তাহা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ইহাদের ঘোর দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। সুতরাং এখানে আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেই হইবে। এই তিনটী পরগণায় সাহায্য করিতে গেলে অন্ততঃ ৪টী কেন্দ্র করা আবশ্যক। নোয়াখালি জেলায়ও এরূপ দেখি নাই যে, জমি একেবারে শুষ্ক পড়িয়া আছে। এখানকার সমস্ত মাঠ গুলি ধুধু করিতেছে—একটু ধানের চিহ্নও নাই। আবার যে জমীতে আমন ধান হয়, তাহাতে 'বোরো' ধান হয় না। * গভর্ণমেণ্ট হইতে তাগাবি দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু সে টাকা লোকে কৃষিতে ব্যয় না করিয়া খাইয়া ফেলিতেছে। যদি সে টাকা পেটেই খাইয়া ফেলে এবং কৃষিতে ব্যয় না করে, তাহা হইলে কিরূপে ধার শুধিবে? ইহারা যদি এ সময় খাইতে পায়, তাহা হইলে উহা

কৃষিতে লাগাইতে পারে। আবার অনেক গ্রামও আছে, যেখানে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য আদৌ পৌছায় নাই। * * খুব বেশী টাকা না হইলে এখানে সাহায্য কিছুই হইবে না। কারণ, অনেক দিন কার্য্য করিতে হইবে এবং কার্য্যক্ষেত্রও অনেক বেশী। শুধু নৈগাং পরগণায় কাষ্য করিতে হইলে কমবেশ ৬০০০৲ টাকা এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটী পরগণায় করিতে হইলে কমবেশ ১৫০০০৲ টাকা আবশ্যক।" ইত্যাদি

পাঠক মহাশয়, শ্রীহট্টের সংবাদ শুনিলেন—এক্ষণে ডায়মণ্ড হারবারের সংবাদ শুনুন।

৮ই জানুয়ারি, ০৭
চৌকিতলা কাছারি,
মগরাহাট পোঃ

"* * উপস্থিত ৪।৫ দিন যে অঞ্চলে কার্য্য করিতেছি, সে দিকে ধান্য একেবারেই জন্মায় নাই। গ্রামগুলি জলে ভাসমান। শাক পাতাই প্রধান খাদ্য, অল্প লোকেরই সেই সঙ্গে এক মুটা খুদ জোটে। পুরুষেরা দূরস্থ গ্রামে খাটিতে যায়, কিন্তু প্রতিদিন সকলের কায যোটে না। স্ত্রীলোকে ঘুষো চিংড়ি মাছ ধরে ও শাকপাতা তোলে। বিক্রী হইলে ২।৪ পয়সা পায়, নতুবা খাইয়া ফেলে। তাহাও সব দিন পায় না। যাহারা বিধবা অথচ যাহাদের ৩।৪টী ছেলে, তাহাদের কিরূপ অবস্থা, ইহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন" ইত্যাদি!

পাঠক মহাশয়, যদি এই কার্য্যে সাহায্য করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনার সাহায্য অতি সত্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ, (প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ (কলিকাতা) ঠিকানায় পাঠাইয়া দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

পূর্ব্বে স্বীকৃত	৪৫৩২॥/১০
শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গাছিহাটা (ময়মনসিংহ)	॥০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণনগর কলেজ, গোয়াড়ি	৫৲
	৪৫৩৮/১০

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন।

সাধনার শেষ হইয়াছে, এক দিবস রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে দেখিলেন, মা কালী আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্ত আছে। তারাও সব আস্‌বে।" তিনি এই সম্বাদ পাইয়া মথুরানাথকে বলিলেন, "মথুর, মা বল্‌লেন, তোর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্ত আছে। তারাও সব আসবে।"

মথুরানাথ এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কহিতেন, "কই বাবা, তোমার ভক্তেরা কবে আস্‌বে ?"

এই কথায় রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিতেন, "তারা আস্‌বে। পরে আসবে।" কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল অথচ কোন ভক্তের আগমন হইল না, ততই তিনি ভক্তগণকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনপ্রাণ উত্তরোত্তর এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, সন্ধ্যার সময়ে ভাগীরথীতীরে যাইয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন। শেষে প্রতিদিন সন্ধ্যার আরাত্রিকের সময় মন্দিরের উত্তর দিকে কুঠিখানার ছাদের উপর উঠিয়া, "ওরে তোরা কোথা আছিস্, শিগ্‌গির আয়রে, তোদের জন্যে যে বুক ফেটে যায় রে! ওরে তোদের দেখবার জন্যে যে প্রাণ যায় রে! তোরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির আয় রে!" বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ভক্তগণকে আহ্বান করিতেন। ক্রমে তাঁহার ভক্তদর্শনের ব্যাকুলতা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কখন সেই ছাদের উপর কখন বা ভাগীরথীতীরে ঐরূপ চীৎকার করিতে করিতে ছট্‌ফট্‌ করিতেন, শেষে পাগলের ন্যায় দুই হস্তে আপনার জিহ্বা ধরিয়া সজোরে টানিতেন! তখন হৃদয় আসিয়া বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য কহিতেন, "বাবা, তোমার আর অন্য ভক্তের দরকার কি? আমি যে তোমার একাই একশ। তুমি আমায় বল না, কি করতে হবে।" কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সেই ব্যাকুলতা দূর হইত না।

কিছুকাল এই ভাবে চলিয়া তাঁহার ব্যাকুলতার কিছু উপশম হইয়া আসিলে এক দিবস মথুরকে কহিলেন যে, তাঁহার কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে, একজন ভাল পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিবেন। হৃদয় ও মথুরানাথ কহিলেন যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ইঁদেশনিবাসী গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য তর্কভূষণ একজন উত্তম পণ্ডিত, তাঁহাকে আনাইলে ভাল হইবে। রামকৃষ্ণ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং একখানি পত্র লিখাইয়া হৃদয়ানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘবরতন মুখোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া তাহাকে ইঁদেশ পাঠাইলেন।

গৌরীকান্ত একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার একটী বিশেষ শক্তি ছিল। সেইজন্য তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করেন, এমন কেহই ছিলেন না। তিনি পত্র পাইবার কয়েক দিবস পরে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখন বৈটকখানা বাটীতে আছেন। গৌরীকান্ত তথায় উপস্থিত হইয়াই "হা রে-রে-রে—নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণং" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই শব্দ শ্রবণ মাত্র সিংহের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন এবং গৌরী অপেক্ষা চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ২জনের এইরূপ অদ্ভুত চীৎকারে সমস্ত উদ্যানসহ দেবালয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। রামকৃষ্ণদেবকে ঐ প্রকার চীৎকার করিতে এবং লাফাইতে দেখিয়া গৌরীকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। রামকৃষ্ণদেব কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া স্থির হইলে গৌরী তাঁহার পদানত হইয়া করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! আজ আমি দিব্য জ্ঞান পেলুম। আপনি আমায় কৃপা করুন। আমি সাধন করে অতি উচ্চ অবস্থা পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু, প্রভো, আমার পতন হয়েছে! আপনি জগদ্‌গুরু, আপনি কৃপা না করলে আর আমার গতি নাই।" রামকৃষ্ণদেব সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং নানারূপ ঈশ্বর-প্রসঙ্গে দুইজনে আনন্দ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আপনার কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৌরীকান্ত তাঁহাকে শাস্ত্রমত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর রামকৃষ্ণদেব তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। তাঁহার তালু হইতে রুধিরস্রাব ইত্যাদি সমস্ত শ্রবণ করিয়া গৌরীকান্ত কহিলেন, "লোকে পায়ে হেঁটে কাশী যাবার চেষ্টা করছে, আর আপনি একেবারে কলের গাড়ী করে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন। আমরা

শাস্ত্রে অবতারের যে সব লক্ষণ পাই, আপনার তা ত সবই রয়েছে, তা ছাড়া আবার এত হয়েছে যে, শাস্ত্রে তার কিছুই পাওয়া যায় না আর আমরাও তার কিছুই বুঝিনি। আপনি ত আর মানুষ নন—সাক্ষাৎ মা কালী, তা আর বুঝব কি ?”

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “আচ্ছা তুমি এই কথা পণ্ডিতদের কাছে বলতে পার ?”

গৌরী কহিলেন, “আচ্ছা, মথুর বাবু বড় বড় পণ্ডিত নিয়ে আসুন, দেখ্‌ব কে বিচার করে আমার কথা কাট্‌তে পারে।” ইতিমধ্যে মথুরা-নাথ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, “এর আর আশ্চর্য্য কি ? আমি সমস্ত বড় বড় পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে আনাচ্ছি।” রামকৃষ্ণ-দেব মথুরানাথকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “না, লোকে বল্‌বে, নিজের দেশের পণ্ডিতকে শিখিয়ে রেখেছে।”

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে অন্তরালে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামা, তোমরা দুজনে ওরকম বিট্‌কেল চীৎকার করলে কেন ?”

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “ওরে, গৌরী ঐ রকম চীৎকার করলে তার ভেতর একটা মহাশক্তির উদয় হত। আমি তাই ওর মত চীৎকার করে তার শক্তিটা টেনে নিলুম।” এই বলিয়া তিনি হৃদয়কে বুঝাইয়া কহিলেন যে, সন্তানোৎপাদন করিয়া গৌরীর পতন হইয়াছিল, সেই জন্যই তিনি তাঁহার শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

গৌরীকান্ত দক্ষিণেশ্বরে আছেন, এমন সময়ে একদিন মথুরানাথ কলি-কাতা নিবাসী পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীকে তথায় আনিয়া রামকৃষ্ণদেবকে সম্বাদ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে পানিহাটীর মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণ-দেবকে ভগবান্ ভাবে সেবা করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র ভাবাবেশে লম্ফ দিয়া তাঁহার স্কন্ধে উঠিয়া বসিলেন ; বৈষ্ণবচরণ তখনি রচনা করিয়া তাঁহাকে অবতার ভাবে দেবভাষায় স্তব করিতে লাগি-লেন। স্তব শেষ হইলে রামকৃষ্ণদেব নামিয়া বৈষ্ণবচরণের সম্মুখে উপবেশন করিয়া গৌরীকান্তকে বৈষ্ণবচরণের সহিত বিচার করিতে আহ্বান করিলেন। গৌরীকান্ত এই সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্তই অবলোকন করিয়াছিলেন, সুতরাং কহিলেন, “এঁর সঙ্গে আর বিচার কি করব, ইনি ত দেখছি আমার মতেরি লোক।”

এক দিবস হৃদয় ও মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের কথা উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে বেদান্ত এবং ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ কহিলেন, "বাবা, তুমি হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে আর যত লোক জন দরকার হয় নিয়ে বর্দ্ধমানে যাও, আমি সমস্ত খরচ দেব।"

রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া মা কালীকে কহিতে লাগিলেন, "মা, তুই আমার মা থাক্‌তে বর্দ্ধমানে কি করতে যাব? তুই মা তাকে এইখানে এনে দে।" বারম্বার এই কথা বলিয়া বালকের মত রোদন করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া তৎপরে কহিলেন, "দশ দিন পরে আস্‌বেক, যেতে হবে না।" তিনি সকল সমস্যার বিষয় এই প্রকারে ভাবাবিষ্ট হইয়া সেবক ভাবে মা কালীকে প্রশ্ন করিতেন আবার তৎপরক্ষণেই স্বয়ং মা কালী ভাবে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উত্তর করিতেন। রামকৃষ্ণদেব যখন এইরূপ কহিলেন, তখন হৃদয় ও মথুরানাথ ভাবিলেন যে, বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত এইখানেই দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবেন সুতরাং তাঁহাকে আর তথায় যাইতে হইবে না।

পদ্মলোচন কাশীধামে বহুকাল ধরিয়া ন্যায় এবং বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের চর্চ্চা বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না। এই জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দশ দিনের মধ্যেই একদিবস মথুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে রামকৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমার সেই বর্দ্ধমানের পণ্ডিত কল্‌কেতায় এসেছে। রাজা রাধাকান্তদেবের সঙ্গে তাকে কথাবার্ত্তা কইতে দেখিছি।" রামকৃষ্ণদেব এই সম্বাদ পাইয়া হৃদয়কে কহিলেন, "হৃদু, পদ্মলোচন কোথায় থাকে সন্ধান করতে পারিস্?" হৃদয় দুই এক দিনের মধ্যে সন্ধান পাইলেন যে, পদ্মলোচন দ্বৈকালীন জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন, আঁড়িয়াদহে বিমলাচরণ বিশ্বাসের উদ্যানে আছেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হৃদু, তুই প্রথমে যা, গিয়ে দেখে আয়। যদি অহঙ্কারী না হয় আর ভাল লোক হয়, তা হলে যাব।"

হৃদয় পদ্মলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব মথুরকে কহিলেন, "হৃদু দেখে এলেই আমার অর্দ্ধেক দেখা হয়।" যথার্থই তাঁহার হৃদয়ের উপর এতই কৃপা ছিল যে, কাহারও সহিত প্রথম আলাপ করিতে হইলে তিনি অগ্রে হৃদয়কে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

হৃদয় পদ্মলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কি হৃদু, কেমন দেখলি ?"

হৃদয় কহিলেন, "বেশ লোক মামা, খুব ভাল লোক বলে বোধ হল মামা।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই কেমন করে বুঝ্‌লি ?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "মামা, সে ভাল লোক না হলে, আমি সামান্য লোক, আমায় এত খাতির যত্ন করবে কেন ? আমায় পান খাওয়ালে, কতক্ষণ ধরে সদালাপ করলে, তার পর আমি যখন তোমার কথা বল্লুম, খুব আগ্রহ করে শুন্‌লে।" এই বলিয়া পদ্মলোচনের সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিলেন, এবং রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার জন্য পদ্মলোচন যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলেন। রামকৃষ্ণদেব এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

হৃদয় পর দিবস বৈকালে একখানি নৌকা করিয়া রামকৃষ্ণদেবকে পদ্মলোচনের নিকট লইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইয়াই পদ্মলোচন যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন, একেবারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মলোচন আলুথালু ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য রূপ দেখ্‌লুম, বাইরে মানুষের মত আকার আর ভেতরে কালী রূপ !" এই বলিয়া করজোড়ে তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে প্রার্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণদেব উপবেশন করিয়া ভাবস্থ হইলেন, এবং কহিলেন, "তোমারি নাম পদ্মলোচন ?"

পদ্মলোচন কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমারি নাম পদ্মলোচন।"

রামকৃষ্ণদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি খুব পণ্ডিত ?"

পদ্মলোচন বলিলেন, "আপনি যখন পণ্ডিত বলছেন, তখন পণ্ডিত।"

তৎপরে সেই ভাবাবস্থায় রামকৃষ্ণদেব গান ধরিলেন ;—

কে জানে গো কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন।

কালী পদ্ম বনে, হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥

তৎপরে সেই ভাবের অবস্থাতেই পুনরায় গাহিলেন,—

বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি;
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করেছে পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

তিনি এইরূপ উপর্যুপরি আর দুই তিনটী গান করিলেন। ভাবে টলমল, অপূর্ব্ব স্বরে গাহিতেছেন, পদ্মলোচন স্থিরদৃষ্টে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছেন, আর অবিরল নয়নধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, গান শেষ হইলে পদ্মলোচন চক্ষু মুছিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য মশাই, আমার জীবনে কখনো চোকে জল আসে না। আজ এঁর গান শুনে আমার চোকে জল এল!" এই বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "আজ এঁর দর্শন পেয়ে আমার জীবন সার্থক হল। আমার শাস্ত্র পড়া এতদিনে ফলবতী হল।" পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি ছাত্র ছিল, তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা দেখলে? আমার একঘর পুঁথি পড়ে যা হয়েছে, কিছু না পড়ে তার কত কোটীগুণ বেশী এঁর হয়েছে!"

রামকৃষ্ণদেব সেই ভাবের অবস্থাতেই কহিলেন, "হ্যাঁ রে হ্যাঁ।" তৎপরে বালকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, এটা কি হয় বলতে পার?"

পদ্মলোচন কহিলেন, "এটা দেবতার দুর্লভ রত্ন সমাধি।

হৃদয় কহিলেন, "অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা এঁকে অবতার বলেন। কিন্তু সে কথা যাক্; মশাই কি বলেন?"

পদ্মলোচন এই প্রশ্নে যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, "অবতার! এঁর যদি কৃপা হয় ত অনেকে অবতার হতে পারেন!"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি রাজার সভাপণ্ডিত, তুমি যে আমাকে এত মান্য করছ?"

পদ্মলোচন উত্তর করিলেন, "আপনার পায়ের ধূল পেলে কত শত মহা-মূর্খ আমার চেয়ে পণ্ডিত হতে পারে।" পণ্ডিত মহাশয় ক্রমে আরও উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অবতার ত সামান্য কথা; যাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে অবতারের উৎপত্তি হয়, আপনি স্বয়ং তিনি! আচ্ছা, আমি আপনাকে যা বল্লুম তা কারুর সাধ্য থাকে খণ্ডন করুন, আমি শাস্ত্রমতে তর্ক করতে প্রস্তুত আছি।"

কিছুক্ষণ পরে আবার কহিলেন, "আমি এদেশে এসে কলকেতায় পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের পিতা উৎসবানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে লিখে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বিচার করিছি, সে সমস্ত আপনাকে পড়ে শোনাব; আপনি শুনলে আমার সে সব বিচার করা সার্থক হবে!"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাগা, তুমি রাসমণির বাগানে যাবে?"

পদ্মলোচন একজন অতিশয় আচারী ব্যক্তি, কিন্তু পরমার্থ লাভের জন্য সে সমস্ত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত কিনা জানিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রশ্ন করিলেন। পদ্মলোচন তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "কেন যাব না? আপনি হাড়ী মুচির বাড়িতে থাকলে, আমি ত আমি, আমার চৌদ্দ পুরুষ সেখানে যাবে! রাসমণি আর মথুর বাবু ত মহা ভাগ্যবান্; আপনি সাক্ষাৎ মা কালী, আপনাকে যখন এত যত্ন করে তাঁরা রেখেছেন, তখন রাসমণিও ধন্য, মথুর বাবুও ধন্য। আমি একটু ভাল হলেই যাব, জানবাজারে মথুর বাবুর বৈঠকখানায় যাব। যেখানে যত বড় বড় পণ্ডিত আছেন, মথুর বাবুকে দিয়ে নেমন্তন্ন করে আনাব, আর আপনাকে নিয়ে বিচার করব, দেখব আমার কথা কে খণ্ডন করতে পারেন।"

পদ্মলোচন তাঁহার পুত্রকে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গে আনন্দ করিতেন। স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উপায় নাই, কারণ রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "মশাই, ধর্ম্মকর্ম্ম সব মুখে দাঁড়িয়েছে। কেবল মুখস্থ বিদ্যে আর কূট তর্ক, আর দলাদলী। ইনি বলেন আমার বিষ্ণু বড়, উনি বলেন আমার শিব বড়! সে দিন বর্দ্ধমানে ত একটা মহাসভা করে বড় বড় পণ্ডিতরা বিচার করতে বসলেন—বিষ্ণু বড় না শিব বড়। কোন পণ্ডিত শিবকে খুব বড় করলেন; আবার আর একজন বিষ্ণুকে খুব বাড়ালেন। শেষ বিচারে কিছুই মীমাংসা হল না। ক্রমে পণ্ডিতদের ঝগড়া কচ্‌কচিই বাড়তে লাগল। মশাই, লোকগুলো এতই অসার যে, যা অনুভূতির বস্তু, আর আখেরে একই জিনিষ, তার আস্বাদ উপলব্ধির চেষ্টা ছেড়ে, এ বলে আমার দেবতা বড়, ও বলে আমার দেবতা বড় আর ঝগড়া। শেষে আমায় ধরে টানাটানি, বলে—মীমাংসা কর! তা বল্লুম, আমার চোদ্দ পুরুষে কখন শিবও দেখিনি, বিষ্ণুও দেখিনি। কে বড় কে ছোট কেমন করে বলি? তবে শাস্ত্রে যেমন আছে বলতে পারি। শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে; আর বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় করেছে। তা দুই বড়, কেউ ছোট নয়।" সভায় পণ্ডিতগণ তখন পদ্মলোচনের মতই সমর্থন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব শেষ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন, পরে বলিলেন, "তোমার জ্ঞান হয়েছে।"

এই সময়ে মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একটা অন্নকূট করিয়া সহস্র সহস্র মন ধান্য তিল ও সর্ব্বপ্রকার শস্য এবং বহুসংখ্যক অর্থ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তথায় সুপ্রসিদ্ধা কীর্ত্তনীয়া সহচরীর কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে সভাস্থলে মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং দাওয়ানজিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "টাকা আন।"

দাওয়ানজি কহিলেন, "আজ্ঞা কত টাকা আনব?"

মথুরানাথ—"কত টাকা কি, এক তোড়া আন। এনে বাবার সামনে সাজিয়ে দেও।"

দাওয়ান এক সহস্র টাকা আনিয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিল। রামকৃষ্ণদেব যখনি গান অতি মধুর বিবেচনা করিলেন,

অমনি বস্ত্র দ্বারা ঠেলিয়া এক থাক টাকা সহচরীকে দান করিলেন। এইরূপে সমস্ত অর্থ দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবদ্বিষয়ে গান শুনিয়া তাঁহার ভাল বোধ হইলে আর কিছু না থাকিলে তিনি গায়ককে অন্ততঃ আপনার পরিধেয় বস্ত্র উলঙ্গ হইয়া খুলিয়া পারিতোষিক দিতেন।

মথুরানাথ এই অন্নকূট উপলক্ষে পদ্মলোচনকে আনিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পদ্মলোচন বড় আচারী, সে আসবে না।" মথুরানাথ তথাপি হৃদয়কে কহিলেন, "ভাই হৃদু, এত বড় বড় পণ্ডিতরা সব আসবে, পদ্মলোচন আসবে না এ বড় দুঃখ হবে। তুমি কোন ফিকিরেও যদি তাকে আনতে পার ত পণ্ডিত মশাইকে আমি হাজার টাকা দান করি।" হৃদয় পদ্মলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৌশল-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা জানাইলেন। পদ্মলোচন উত্তর করিলেন, "না মশাই, আমায় দশ হাজার টাকা দিলেও আমি সে দিন তাঁর বাড়ী যেতে পারিনি। বরং অন্য এক দিন যাব।" কিন্তু তাঁহার সে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিছুতেই উপশম হইল না দেখিয়া পদ্মলোচন কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইয়া কাশীধামে দেহ ত্যাগ করিবেন, এই মানসে একদিন বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্যাদি তাহার পুত্রের হাতে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলেন। পুত্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট সেই সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া প্রসাদ চাহিলে তিনি কহিলেন, "প্রসাদ পেলে কি তোমার বাবার রোগ আরাম হবে?" পদ্মলোচনের পুত্র উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, সে জন্য নয়। বাবা আপনার ভেতর ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখতে পান। আপনাকে স্বয়ং ভগবান্ বলে জানেন, তাই আপনার প্রসাদ খেয়ে কাশী যাত্রা করবেন, এখানে ব্যারাম সারলো না।" পণ্ডিত মহাশয় কাশী-ধামে উপস্থিত হইয়া অচিরে পরলোক গমন করেন।

ক্রমশঃ।

আলওয়ারে স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রী প্রমথক।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ইতিমধ্যে মহারাজের একখানি ফটো সম্মুখের দেয়ালে দেখিতে পাইয়া স্বামীজি একজনকে তাহা আনিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। ছবিখানি হস্তে লইয়া স্বামীজি কহিলেন, "আচ্ছা এ কার ছবি?"

রামচন্দ্রজি কহিলেন, "মহারাজের।"

স্বামীজি পুনরায় রামচন্দ্রজিকে কহিলেন, "আচ্ছা, আপনাকে এতে থুতু দিতে অনুরোধ কচ্চি, আপনারা কেউ এতে থুতু দিন। কারণ, দেখুন এটা ত কেবল একটুক্‌রা কাগজ বই আর কিছুই নয়? এতে আপনাদের একটু থুতু দিতে কি আপত্তি?"

দাওয়ান রামচন্দ্র বড়ই বিপদে পড়িলেন। সকলেই স্বামীজির কথায় ভয়ে জড়সড় একবার; মহারাজের দিকে আবার স্বামীজির দিকে তাকাইতেছেন। স্বামীজির কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি রামচন্দ্রকে সেই ফটোতে থুৎকার দিতে জিদ্ করিতেছেন।

রামচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি স্বামীজি? এ যে মহারাজের ছবি! আপনি কি বল্‌ছেন?"

স্বামীজি উত্তর করিলেন, "বেশ, মহারাজ ত আর এর ভেতর নেই। এ ত কেবল মাত্র এক টুক্‌রা কাগজ। এতে না আছে মহারাজের মাস, না আছে মহারাজের হাড়, না আছে মহারাজের রক্ত; চাল, চলন, কথা কিছুই ত নেই। এটা কেবল এক টুকরা কাগজ আর মহারাজের একটু ছায়া। এই ছায়াটকুর জন্যে আপনারা ভাবছেন যে, আমি যদি এতে থুতু দিই, তাহলে আপনাদের মনে কষ্ট হবে। ভাবছেন, মহারাজের অপমান করা হবে। এতে থুতু দিলে আপনাদের মনে হয়, যেমন মহারাজের গায়েই থুতু দেওয়া হবে, মহারাজকেই অপমান করা হবে। এই না?"

রামচন্দ্র হাঁফ্ ছাড়িয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ত বটে!"

এইবার স্বামীজি মহারাজের প্রতি তাকাইয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এঁরা আপনার ভক্ত। এই কাগজ টক্‌রোতে আপনার হাড় মাস রক্ত

চামড়া, হাবভাব, চাল চলন কিছুই নেই; আপনার মত এ কাগজটা হুকুম-জারিও করে না। তবু এঁরা আপনার ভক্ত কি না তাই, এই কাগজ টুক্‌রোকে ঠিক আপনার মতই ভাবেন; এই ছাপটুকু আছে বলে। এটাকে দেখলে আপনাকে মনে পড়ে, এমন কি, এইটাই আপনি মনে হয়। তাই আমি এর ওপর থুতু দিতে চাইলে এঁরা এত ঘাবড়ে অস্থির হয়েছিলেন। তেমনি, মহারাজ, ভক্তেরা যে দেবদেবীর পাষাণ বা ধাতু মূর্ত্তি গড়ে পূজা করেন, তা তাঁরা ধাতু বা পাষাণের পূজা করেন না। আমি এত দেশ ত বেড়িয়ে দেখলুম, কোথাও কারুকে 'ও পাষাণ, আমি তোমায় পূজা করছি তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হও'; কি, 'ও ধাতু আমি তোমার পূজা করছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও', এ বলে পূজা করতে দেখলুম না। সকলেই সেই চিন্ময় ঈশ্বরের পূজাই করে, ঐ পাষাণ ধাতু মূর্ত্তি দেখলে সেই চিন্ময় কৃষ্ণকে মনে পড়ে, ঐ মূর্ত্তি দেখে ভক্তরা আপনার আপনার ইষ্ট মনে আনেন আর তাঁরই পূজা করেন। তবে আপনি যদি কোথাও পাষাণ বা ধাতুকে সম্বোধন করে পূজা করতে দেখে থাকেন ত আমি জানি নি।"

নিবিষ্টচিত্তে মঙ্গল সিংহ এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। স্বামীজির কথা শেষ হইলে তিনি করজোড়ে কহিলেন, "না স্বামীজি, তা আমি কখন দেখিনি। এ সমস্ত এতদিন আমি কিছুই বুঝিনি। আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু দিলেন। তা মহারাজ, আমার গতি কি হবে? আপনি আমায় কৃপা করুন।"

স্বামীজি। "কৃপা সেই এক ভগবান্‌ই করতে পারেন আর করে থাকেন। তাঁকে জানান, তাঁকে ডাকুন, তিনি নিশ্চয় কৃপা করবেন।" এই বলিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন। স্বামীজি প্রস্থান করিলে পর মঙ্গল সিংহ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ও স্থির হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "দাওয়ানজি, এমন মহাত্মা ত কখন দেখিনি। আপনার এখানে ওঁকে কিছুদিন রাখতে পারেন না?"

দাওয়ানজি উত্তর করিলেন, "বলতে পারিনি মহারাজ, বড়ই তেজস্বী পুরুষ। তবে চেষ্টা করব।" দাওয়ান রামচন্দ্র অনেক মিনতি করায় স্বামীজি তিন চারি দিন তাঁহার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন কিন্তু অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "দাওয়ানজি, আমার কাছে যে সমস্ত ভদ্রলোকেরা সদা সর্ব্বদা এসে থাকেন, তাঁরা যদি অবাধে এখানে এসে

আমার সঙ্গে ইচ্ছামত দেখা শুনা করতে পারেন ত আপনার ওখানে দু চার দিন থাকবার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তাঁদের এংলা করে তবে আমার কাছে আসতে হয় ত আমি নাচার, থাকতে পারব না।" দাওয়ান রামচন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলে তবে স্বামীজি তথায় আগমন করেন।

স্বামীজির উপদেশে অনেকের জীবন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং সকলেই তাঁহাকে এতই ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে অনেকের মুখ বিশুষ্ক হইয়া গেল; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, দয়া করে আর কিছুদিন থাকুন, আপনাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না।" স্বামীজির হৃদয় পুষ্প হইতেও কোমল, সুতরাং আর তাঁহার যাওয়া হইল না, অথচ এই প্রকারে প্রায় এক মাসের অধিক এই স্থানে অতিবাহিত হইয়াছে। একজন বৃদ্ধ প্রত্যহই তাঁহার নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন, আর স্বামীজি বলেন, "কৃপা এক ভগবান্ই কর্‌তে পারেন, আমার কি সাধ্য? আপনি তাঁর শরণাগত হউন।" বৃদ্ধকে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলেন, তিনি তাহা না করিয়া প্রত্যহ আসিয়া সেই একই প্রার্থনা করেন। একদিন স্বামীজি দূরে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, "আজ একে বিদায় কর্‌তে হবে।" এই বলিয়া সেইখানে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে সেই বৃদ্ধ আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; স্বামীজি কোনই উত্তর করিলেন না। অন্যান্য অনেকে তাঁহার সহিত যে প্রকার বাক্যালাপ করেন, তদ্রূপ করিতে যাইয়া দেখিলেন, স্বামীজি এক বর্ণেরও উত্তর করেন না। অনেকে ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত, স্বামীজি সেই একইভাবে উপবিষ্ট আর সেই বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, "মহারাজ, আমায় কিছু করে দিন, আপনি না করে দিলে আমার কিছুই হবে না। আপনি কৃপা করুন বাবাজি।" স্বামীজি সেই একই ভাবে রহিয়াছেন, কোন উত্তর নাই। আরও কিছুক্ষণ বৃদ্ধ ঐ প্রকার করিয়া শেষে সমং বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া আপন মনে বকিতে বকিতে প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ প্রস্থান করিলে পর স্বামীজি বালকের মত খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবজি, এ বুড়োর প্রতি এত কঠিন হলেন কেন?"

প্রশ্নকার জনৈক যুবা। স্বামীজি সস্নেহে তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা, আমি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা বালক, যা বলব প্রাণ-পণে করতে চেষ্টা করবে, আর করতেও পারবে। এরা বুড়ো, জীবনের পনের আনা তিন পাই সময় সংসারের কীট হয়ে থেকে তার পর যা উপদেশ দেব তা এক তিলও করবে না; পুরুষকার একেবারেই নেই। যার পুরুষকার নেই তাকে কি ভগবান্ কৃপা করেন? অর্জ্জুন পুরুষাকার হারিয়ে কাপুরুষ হয়ে পড়েছিলেন, তাই না শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা বলে তাঁর পুরুষার্থ জাগিয়ে দিলেন, কর্ম্ম, স্বধর্ম্ম করালেন। যার পুরুষার্থ নেই, সে ত তমোগুণী! তমোগুণীর কি ধর্ম্ম হয়? তাকে পুরুষার্থ অবলম্বন করে রজোগুণী হতে হবে; স্বধর্ম্ম পালন, নিষ্কাম কর্ম্ম করতে করতে সত্ত্বগুণী হবে, তবে ধর্ম্ম হবে। যে গৃহী স্বধর্ম্মই করতে পারে না, কোন প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তার নিবৃত্তি আসবে কেমন করে? প্রবৃত্তি না থাকলে কি শেষে নিবৃত্তি আসে? ও চায় নিবৃত্তি, এদিকে প্রবৃত্তির কোন কাজেরই অনুষ্ঠান করবে না মহা তমোগুণী। চোর হয়ে চুরী করতেও যে পারে তার পুরুষার্থ আছে, এই জন্যে তার নিবৃত্তিও আসে। সে একদিন সেই দীননাথের কৃপাও পাবে আর তার জ্ঞানেরও উদয় হবে।" যে সকল যুবক তাঁহার নিকট সর্ব্বদা আসিতেন তাঁহারা সকলেই স্বামীজির উপদেশ মত সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের লইয়া স্বামীজি মধ্যে মধ্যে স্বয়ং পড়াইতেন। সংস্কৃত বিদ্যার প্রভৃত চর্চ্চার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে স্বামীজি পুনঃ পুনঃ বলিতেন। কারণ তিনি বলিতেন, এ দেশের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস ত একেবারে নাই, ইংরাজি ভাষায় যে সমস্ত আধুনিক ইতিহাস আছে, তাহাতে আমাদিগের অধঃপতনের চিত্রই বিশেষ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তৎপাঠে আমরা অধিকতর নির্ব্বীর্য্য ও অধঃপতিত হইতেছি। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের প্রকৃত ইতিহাস প্রস্তুত করিতে হইবে। ইংরাজ পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টায় যে কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহা পক্ষপাতদোষদুষ্ট, কারণ, তাঁহারা আমাদের ধর্ম্ম আচার ব্যবহার কিছুই বুঝেন না ও মানেন না। তজ্জন্য সেই সমস্ত অনুসন্ধান নিরপেক্ষ ভাবে করা হয় নাই। তন্মধ্যে অনেক অলীক বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ সমস্ত আমাদেরই কার্য্য, আমাদেরই করা চাই, তবেই বিশুদ্ধ নির্ভুল ইতিহাস হইবার সম্ভাবনা। যদিও ইংরাজ

পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু আমরা যদি নিরপেক্ষ ভাবে ঐ সকল তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহাদেরই মতে অন্ধের ন্যায় পরিচালিত হই, তবে তাহাতে আমাদের সর্বনাশেরই অধিক সম্ভাবনা। প্রকৃত পক্ষে বৈদিক সময় হইতে বুদ্ধদেবের পর সহস্র বৎসর পর্যান্ত আমাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু আজকাল বিদ্যার সাহায্যে কত দেশের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে এবং হইতেছে। আমাদের সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে প্রত্যেক ভারত ভারতীর যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। কাহারও শিশুসন্তান হৃত হইলে সে যেরূপ মমতা ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই হৃত শিশুর উদ্ধার সংকল্পে ধাবমান হন, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের সেইরূপ মমতা ও অধ্যবসায়ের সহিত ভারতের সেই লুপ্ত গৌরব-ছবির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, তবে আমাদের জাতীয় শিক্ষা পাইবার উপায় হইবে এবং এইরূপ জাতীয় শিক্ষা হইতে থাকিলে ক্রমে জাতীয়তার বিকাশ হইবে।" স্বামীজি এই যুবকগণকে আপনার প্রাণসম ভালবাসিতেন ও এইরূপ উত্তেজক বাক্যসকল দ্বারা তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা পাঠে প্রবৃত্ত করিতেন। তাঁহার এই সমস্ত কথা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হয়।

একদিন স্বামীজি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আলওয়ার রাজধানীতে কোন সাধু আছেন কি না। তিনি কহিলেন যে, একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী অনতিদূরে আছেন। স্বামীজি কহিলেন, "তবে আমাকে সেখানে নিয়ে চল, তাঁর দর্শন করিয়ে দেও।" দুই জনে সেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গমন করিলেন। স্বামীজি তাঁহার নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ব্রহ্মচারী কহিতে লাগিলেন, "তুই গেরুয়া পরেছিস্ কেন? আমি গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীদের দুচক্ষে দেখতে পারিনি." এই বলিয়া সন্ন্যাসী কুলে অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া তৎপরে আবার স্বামীজিকে কহিলেন, "আচ্ছা তা হোগ্ তুই কিছু খাবি? আমার তোর ওপোর তেমন রাগ নেই।"

স্বামীজি করজোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞে এই মাত্র ভিক্ষা করে আসছি এখন আর কিছু আহারের আবশ্যক নাই। আপনি অনুগ্রহ করে কিছু তত্ত্ব কথা বলুন, আমি শুনি।"

ব্রহ্মচারী ঠাকুর বিষম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "তবে যা দূর হ, কিছু খাবিনি ত দূর হ।" স্বামীজি পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে সাধু দর্শন করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি স্বামীজির

এতদ্রূপ অবমাননায় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া মনে করিতেছেন, স্বামীজি হয়ত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামীজির অসন্তোষের পরিবর্তে বরং এত আমোদ বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহার অত্যন্ত হাসি পাইয়াছিল। যাহা হউক, যতক্ষণ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট ছিলেন ততক্ষণ অতি কষ্টে উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন, রাস্তায় খানিক দূর আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, এমন হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার সহচরটী হাসির কারণ কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে না পারিয়াও সেই স্রোতে পড়িয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে আরও কিছুদূরে আসিয়া স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা সাধু দেখালে বাবা, কি গালাগালীর চোট রে বাবা!" এই বলিয়া পুনরায় হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সেই ব্রহ্মচারীর মত নকল করিয়া আপনি হাসিতে লাগিলেন ও তাহার সঙ্গীটীকেও ততোধিক হাসাইতে লাগিলেন।

তাঁহার অসীম ঈশ্বরপ্রেম, অপার অবিচ্ছিন্ন আনন্দ এবং সকলের প্রতি অগাধ ভালবাসা সকলকেই মুগ্ধ করিল। যে সকল লোক তাঁহার নিকট প্রতি দিন আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি একদিন একজন অনুপস্থিত হইতেন ত স্বামীজি তাঁহার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইতেন। সে কেন আইসে নাই, তাহার ত কোন বিপদ্ হয় নাই? এইরূপ চিন্তায় তাঁহাকে কাতর করিত। কাহারও দ্বারা সেই ব্যক্তির প্রকৃত সন্ধান লইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। একদিন একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক তথায় আসিয়া উপস্থিত। তাহার উপনয়নের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, পেটের অন্নই জুটে না, তা উপনয়ন সংস্কার কিরূপে হইবে! স্বামীজির আর অন্য চিন্তা নাই, যিনি তাঁহার নিকট আগমন করেন, তাঁহাকেই বলেন, "আমার একটী ভিক্ষা আছে।" তৎপরে সেই ব্রাহ্মণবালকের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া যাহাতে সকলে একটা চাঁদা তুলিয়া তাহার উপনয়ন দেওয়াইতে পারেন, তাহার প্রস্তাব করিলেন। একদিন সকলে উপস্থিত হইলে কহিলেন, "দেখুন, গৃহস্থ বলেই এইটী আপনাদের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চাঁদা করে ছেলেটার পৈতে দিন? ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হয়ে বেড়ায় সেটা ভাল নয়। যদি বিদ্যাশিক্ষারও কিছু বন্দোবস্ত করে দেন ত বড় ভাল হয়।" এই ঘটনার কিছু পরেই স্বামীজি আলওয়ার পরিত্যাগ করিয়া যান কিন্তু এক মাস পরে আবু পর্ব্বত হইতে আলওয়ারে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যে

প্রথম পত্র লিখেন তাহা পড়িলে দেখা যায়, তিনি উক্ত ব্রাহ্মণ বালকটীর কথা ভুলেন নাই। উক্ত পত্রটীর কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেয়া গেল।

মাউণ্ট আবু

"বৎস! ৩০শে এপ্রেল, ১৮৯১।

আশা করি তোমরা আনওয়ারে সুস্থ আছ। এই আবু স্থানটী অতি সুন্দর, তবে এখানকার পানীয় জল অত্যন্ত খারাপ। আমি টীকেদার আপিষের (Vaccination) প্রধান কেরাণী শ্রীযুক্ত মুরলীলালের বাসায় আছি। ইনি তোমাদের ডাক্তার বাবুর একজন বিশেষ বন্ধু, আর সেই জন্য ইনি আমাকে এত আদর যত্ন করে রেখেছেন। ডাক্তার বাবুকে একথা জানাবে আর আমার সহস্রাধিক সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ দিবে। তোমাদের ডাক্তার বাবু যথার্থই একজন উৎকৃষ্ট ভদ্রলোক।

"সেই ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন দিয়েছ? তুমি সংস্কৃত পড়্‌ছ? কেমন, কতদূর পড়া হল? বোধ হয় এতদিনে প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে? তোমার ভ্রাতৃদ্বয় কেমন আছে? নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠার সহিত শিবপূজা কচ্চ ত? না কর ত কর্‌বার চেষ্টা কর। প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যাহা কিছু আবশ্যক তোমার সব আসিবে। অগ্রে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা কর, উপরন্ত ধন মান পাইবে। * *

"বৎস, ধর্ম্ম মতমতান্তরে নহে, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে। সৎ হওয়া ও সৎ কর্ম্ম করা—এ ছাড়া ধর্ম্ম বল্‌তে আর কিছুই বুঝায় না। যিনি কেবল হে প্রভু হে প্রভু বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলা যায় না—যিনি সেই পরম পিতার আদেশ পালন করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক।

"তোমরা আলোয়ারী যুবকদলটী বেশ। আশা করি, তোমরা অচিরেই সমাজের ভূষণ স্বরূপ এবং যে দেশে তোমরা জন্মিয়াছ, তাহার পক্ষে এক মহা কল্যাণ স্বরূপ হইবে। * ইতি

তোমাদেরই

বিবেকানন্দ।"

স্বামীজি এই পত্রে প্রত্যেকের নাম করিয়া কে কেমন আছেন এবং কি প্রকার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু সকলের অগ্রে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণবালকের উপনয়ন হইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আলওয়ারে প্রায় দুই মাস অবস্থিতি করিয়াছেন আর এখানে থাকিবেন না। ইহা শুনিয়া তাঁহার জনৈক মন্ত্রশিষ্য তাঁহাকে আপন আলয়ে ভিক্ষা করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজি তাঁহার বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন, শিষ্য তখন স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজি উপবিষ্ট হইলে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "বাবাজি, তেল মাথায় কি কোন উপকার আছে?"

স্বামীজি কহিলেন, "আছে বৈকি। এক ছটাক তেল ভাল করে মাখলে, এক পোয়া ঘি খাওয়ার কাজ করে।"

আহারাদির পর নানা কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজি মহারাজ, আপনি বলেন, চরিত্রের দিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা চাই—সত্যনিষ্ঠ, সরল (Sincer) পরোপকারী, কর্ম্মঠ, আর অসীম সাহসী হওয়া চাই; এ সব না থাকলে গৃহস্থ স্বধর্ম্ম করতে পারে না, চিত্তশুদ্ধি হয় না। কিন্তু চাকরী করা ত দাসত্ব, তাতে এসব ভাব আসে না দেখছি। তাই ভাবি, আমাদের ত অর্থোপার্জ্জন করতে হবে, নইলে নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান কেমন করে করব? আজকালকার ব্যবসা যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে এতে ত অনেক মাচকোফের আছে। আমার মনে হয়, এতে অনেক অর্থের আবশুক, তারপর সরলতা থাকে না। তা মহারাজ, কোন্ কাজ করলে সব দিক বজায় থাকে?"

স্বামীজি উত্তর করিলেন, "দেখ এ বিষয় আমিও অনেক ভেবেছি। কিন্তু দেখতে পাই চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জ্জন করতে কেউ বড় চায় না, এ বিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে একটা সমস্যা ওঠেনা, আমাদের শিক্ষার দোষেই এটা দাঁড়িয়েছে। যাহক আমি ত ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটা বড়ই ভাল মনে করিছি। চাষ বাসের কথা বল্লেই এখন মনে হয়, তবে লেখা পড়া কেন শিখলাম? চাষ বাসের কথা বল্লেই প্রথমেই মনে হয়, দেশশুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে? দেশশুদ্ধ লোক ত চাষা আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি। তা নয়, মহাভারত পড়ে দেখ। জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। আমাদের দেশে ঋষিরা সকলেই ঐ কাজ করেছেন। আবার আজকাল দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে। নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষবাস নয়, বিদ্বান্ বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরেজি পড়ে সহরে পালিয়ে আসে। গ্রামে

হয়ত অনেক জায়গা জমী আছে, তাতে তাঁদের পেট ভরে না, মনের তৃপ্তি হয় না। সহরে হতে হবে, চাকরী করতে হবে। অন্যান্য জাতের মত আমাদের হিন্দু জাতটা ত বেড়ে উঠ্‌তে পারছে না! আমাদের মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী যে, যদি এ রকম ভাবে জন্ম মৃত্যু চল্‌তে থাকে, তাহলে ত আমরা মরতে বসেছি। এর একটা কারণ, উৎপন্ন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না, সহরে বাস করার ঝোঁক বেশী, আর একটু পড়া শুন করেই চাষার ছেলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামী করতে দৌড়ায়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ ত প্রায় হয় না। ছোট খাট খারাপ গ্রামগুল ভাল হয়ে ওঠে, লেখাপড়া জানা লোকে পল্লীগ্রামে বাস করলে, আর চাষবাসটা বিজ্ঞানসাহায্যে করলে উৎপন্ন বেশী হয়, চাষাদের চোক খুলে যায়, তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখাপড়া করতে ইচ্ছে হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক তাও হয়।"

শিষ্য আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটা কি স্বামীজি?"

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন, "এই ছোট জাতে আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামিশি হয়, যদি তোমাদের মত লোকেরা কিছু লেখা পড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষা লোকদের সঙ্গে আপনার মত ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, ত দেখবে তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে, যে তোমার জন্যে জান দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক, জনসাধারণকে শিক্ষা (Mass cducation), ছোট জাতের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি ভালবাসা উপকার করতে শেখান, তাহাও অতি অল্প আয়াসেই আরম্ভ হবে।"

শিষ্য আবার প্রশ্ন করিলেন, "সে কেমন করে হবে?"

স্বামীজি বলিলেন, "কেন, দেখ না পল্লীগ্রামে ছোট জাতের সঙ্গে একটু মেশামিশী করলে তারা কেমন আগ্রহের সহিত ভদ্রলোকের সঙ্গ করতে চায়। জ্ঞানপিপাসা যে, সকল মানুষের ভেতর রয়েছে। তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁরে ঘিরে বসে, আর তাঁর কথা গিল্‌তে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়ীতে ঐ রকম তাদের সব জড় করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, ত রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না করতে পারা যাবে, তার শত গুণ বেশী ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।"

শিষ্য ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা মহারাজ, এরকম লোকেরও ত অনেক দরকার তাহলে ?"

স্বামীজি কহিলেন, "লোক ত অনেকই আছে—কেবল শিক্ষিত লোকদের মাথার ভেতর এইটে ঢুকিয়ে দেওয়া চাই; কেবল খবরের কাগজে রাজনৈতিক হুজুক মাচালে কি তা হয় ? যাঁরা ঐ আন্দোলনই কেবল করেন, তাঁদের এই সমস্ত জানাও চাই আর যুবা সম্প্রদায়কে এটুকুও বুঝিয়ে দেওয়া চাই, আর তারা যাতে ঐরূপ কার্য্য করে তার ফিকির করা চাই, নইলে একটা আন্দোলনের সময় এগ ত দুদশ কথা বক্তৃতা ঝাড়লুম তার পর যা হয় হবে, আমিত বাহবা নিয়ে এলুম, তা হলে কি কোন উন্নতি হয় ? তার পর তাঁহাদের মধ্যে এক আধজনকে ঐ রকমে কার্য্যও আরম্ভ করে দেখান চাই। Practicality যে বড়ই দরকার। সেইটে যে এ দেশে নেই কেবল আন্দোলনে যে সেটা আসবার উপায় নেই। লোকে কাজ দেখে কাজ করতে শেখে, না, কেবল কথায় কাজ করতে শেখে ? যে কেবল কথায় কাজ করাতে চায়, সে ত গোলামের ওপর গোলাম বানাতে চায়। যে যে রকম শিক্ষা দিতে চায় তার সেই রকম কাজ করে দেখাতে হয়, তবে লোকে শেখে; এই হচ্ছে জগতের নিয়ম।"

শিষ্য বলিলেন, "ঠিক মহারাজ, তাই এদেশের লোকে বক্তৃতা শুনে শুনে কেবল বক্তৃতা দিতেই শিখেছে; কেননা রাজনৈতিক আন্দোলনে কেবল মাত্র কাজ হচ্ছে বক্তৃতা ঝাড়া আর কাগজ লেখা; আর কিছুই নয়।"

শিষ্য কিছু চিন্তা করিয়া আবার কহিলেন, "আমি ভেবে দেখছি, চাকরী নিয়ে মহা অন্যায় করেছি। সময়ে সময়ে বড়ই ভুল করেছি বলে কষ্ট হয়।"

স্বামীজি কহিলেন, "দেখ, জীবনসংগ্রামে যে হেরে যায়, সেই পেছন দিকে তাকায়। পেছন দিকে তাকালে কি হবে, কেবল সামনের কিছুই দৃষ্ট হবে না। তাই ক্রমাগত সাম্‌নে নজর রাখা চাই, ক্রমাগত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা চাই। যদি একজন একটা পাপ করে থাকে, তা তাই ভেবে কাঁদলে কি ভাল হবে ? তাকে ভাল কার্য্যের অনুষ্ঠান করতে হবে। হার ত আছেই, যার হার নেই তার কোন শিক্ষাও নেই, তাই হারটা একেবারে নিষ্ফল না ভেবে তাতে যে টুকু শিক্ষা আসে, সেই টুকু নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। আর ভেবে চিন্তে বেশ বুঝে সুঝে যে কাজটা ভাল

বলে বিশ্বাস হবে, তার সাধনের জন্য প্রাণপণ করে সেই কার্য্যে লেগে যেতে হয়। আবার সেই কার্য্য করতে গিয়ে প্রথমেই যদি একটা আদটা জোর ধাক্কা খাওয়া যায় ত হেরে পালিয়ে আসা বড়ই দোষ, মহা পাপ। আবার, আরবারও যদি তাতে হার হয়, যদি তাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে শেষে প্রাণ যায়, তাও ভাল। এই পণ করে কার্য্যে নামতে হয়, তবে তার কার্য্য সিদ্ধ হয়।"

পরদিন ২৮শে মার্চ্চ স্বামীজি আলওয়ার হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ অনেকেই অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। ছয় সাত ঘণ্টা রথযাত্রা করিয়া আট নয় ক্রোশ দূরে পাণ্ডুপোল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে হনুমানজির এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তথায় প্রতি বৎসর হনুমান-জির একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। হনুমানজির দর্শন করিয়া সেই রাত্রি সেই মন্দিরেই অবস্থিতি করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে স্বামীজি পদব্রজে চলিলেন। পথ অতিশয় দুর্গম, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী এবং শ্বাপদ সঙ্কুল বন, সঙ্গে দুই চারি জন আলওয়ারনিবাসী বন্ধু স্বেচ্ছায় স্বামীজির সহিত কিছুদূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণার্থ গমন করিতেছেন। স্বামীজি চলিতে চলিতে কখন গান করিতেছেন কখন বা গল্প বলিয়া সকলের উচ্চ হাস্যে বন প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। এইরূপে ষোল মাইল গমন করিয়া টাহ্‌লায় নীলকণ্ঠ মহা-দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ও দর্শনাদি করিয়া সেই রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে চলিতে আরম্ভ করিয়া নয় ক্রোশ দূরে নারায়-ণীতে এক দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রতি বৎসর একটী সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাকে এবং রাজপুতানার অনেক দূর দূরান্তরের লোকে আসিয়া এই জাগ্রত দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পর দিন আরও সাত আট ক্রোশ চলিয়া বস্‌ওয়া রেল ষ্টেশনে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে রেলে জয়পুর গমন করিলেন। আলওয়ারের পূর্ব্বোক্ত শিষ্যটী তাঁহার জন্য বান্দিকুইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ট্রেন তথায় আসিলে তিনি স্বামীজির গাড়ীতে উঠিলেন এবং জয়পুরে গমন করিয়া অগ্রে স্বামীজিকে অনেক বুঝাইয়া তাঁহার একখানি ফটো তুলাইয়া লইলেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মেঘ-দূত। (পদ্যানুবাদ) শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম এ অনূদিত।

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনী প্রসূত মেঘদূতখানিকে বাঙ্গালা পদ্যে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়া সতীশ বাবু বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন॥ আমরা সংস্কৃতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। অনুবাদ অবিকল হইয়াছে। ফুটনোটগুলিও বেশ হইয়াছে। তবে আমাদের বিবেচনায় যদি ফুটনোটের সংখ্যা কিছু অধিক হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালী পাঠকের বুঝিবার পক্ষে আরও সহজ হইত। যাহা হউক, মহাকবির কাব্য-রস আস্বদন করিতে যাঁহাদের অভিলাষ, তাঁহারা এই পুস্তকখানিতে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

বিগত ৬ই জানুয়ারি তারিখে (পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে স্বামীজির গুরুভাই এবং শিষ্যপ্রশিষ্যগণ বিশেষ ভাবে পূজা হোম বেদপাঠাদি করেন। ১৩ই সাধারণের জন্য উৎসব হয়। একটী কুটীরে স্বামীজির একখানি মনোহর তৈলচিত্র লতাপাতাফুল প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দর্শকগণ সকলেই আগ্রহ-সহকারে সেই তেজোময় অথচ মধুরদর্শন মূর্ত্তি দেখিয়া যেন স্বামীজির সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। স্বামীজি যে ঘরে থাকিতেন, তাঁহার মহাসমাধির পর সেই ঘর আর ব্যবহার হয় না। যেখানে যে জিনিষটী ছিল, ঠিক সেই ভাবে সেই জিনিষটী রাখা রহিয়াছে। ঐ ঘরটীও অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। দর্শকগণ এখানেও আসিয়া এই স্থানকে তীর্থজ্ঞানে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ নামক স্বামীজির জনৈক গৃহী-শিষ্য স্বরচিত স্বামীজির মহিমা প্রকাশক একটী স্তব পাঠ করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সন্ন্যাসী হইবেন সংকল্প করিয়া নিজ

পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হইলে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসিলেন, ধনসম্পত্তি দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা আছে আছে কি না। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ধনসম্পত্তি লাভ হইলে ধনবান্ ব্যক্তিগণের ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারা যায়, কিন্তু উহা দ্বারা অমৃতত্বের কিছুমাত্র আশা নাই। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন, ধনের দ্বারা যখন অমৃতত্ব লাভের আশা নাই, তখন সেই ধন লইয়া আমার কি হইবে? তখন ঋষি মহোৎসাহের সহিত পত্নীকে কহিতে লাগিলেন,—অরে, পতির জন্য পতি লোকের প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই প্রিয় হইয়া থাকে, পত্নীর জন্য পত্নী কাহারও প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই প্রিয় হইয়া থাকে, কোন জিনিষই তাহার জন্য প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই প্রিয় হইয়া থাকে — অতএব আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, উহার ধ্যান করিতে হইবে, আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে হইবে।

এইরূপ নানা উপায়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন।

পাঠ সমাপ্ত হইলে রামকৃষ্ণপুরনিবাসী বিখ্যাত গায়ক শ্রী কৃষ্ণকুমার দে ও বৃন্দাবন হইতে আগত জনৈক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ভগবদ্বিষয়ক সুললিত সঙ্গীত দ্বারা আগন্তুকবৃন্দের চিত্তবিনোদন করেন। পরিশেষে এই দিনের প্রধান কার্য্য দরিদ্রসেবা আরম্ভ হইল। প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র দরিদ্র নারায়ণের সমাগম হয়। কলিকাতা ও সন্নিকটস্থ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সমিতিসমূহের সভ্যবৃন্দ এবং অন্যান্য অনেকে এই সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রেও ঐ দিন অল্প বিস্তর উৎসব হইয়াছিল। মুরশিদাবাদ, কাশী, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালোর হইতে আমরা উৎসবের সংবাদ পাইয়াছি।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে স্বামীজির জন্মতিথি পূজা ভোগরাগাদি এবং তাঁহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীত গীত হয়। পরে ভক্তগণ ও নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গত ১৩ই জানুয়ারি ঐ উপলক্ষে প্রায় ৩০০ দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে পয়সা বিতরণ করা হয়।

মাদ্রাজেও জন্মতিথিপূজা, ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ ও স্বামী বিমলানন্দ কর্ত্তৃক 'স্বামীজি সম্বন্ধে আমার ধারণা' সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হয়। উৎসবের দিবস প্রায় ২৫০০ দরিদ্রসেবা করা হয়।

বাঙ্গালোর মঠে নিম্নলিখিত ভাবে উৎসবকার্য্য নির্ব্বাহ হয়,—

১। নগর কীর্ত্তন—প্রাতে ৮ হইতে ১০টা।

২। দরিদ্রভোজন—১২টা হইতে ১টা।

৩। সংস্কৃত কলেজ হলে সঙ্গীত—৪টা হইতে ৬টা।

৪। শ্রীচামরাজেন্দ্র সংস্কৃত কলেজে 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা। (সভাপতি—সার পি, এন, কৃষ্ণমূর্ত্তি কে, সি, আই, ই)

বিগত ২০শে জানুয়ারি কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে এক সভা আহ্বান করেন। প্রায় দ্বিশত যুবকবৃন্দের সমাগম হয়। নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র স্বামীজির আবির্ভাব বিষয়ক তিনটী সঙ্গীত করেন। শ্রীমান্ হেমাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজির 'সখার প্রতি' নামক বাঙ্গালা কবিতা ও শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Angels unawares' নামক স্বামীজির একটী ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করেন। আর শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র সরকার স্বামীজির 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন। সমিতির সম্পাদক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিলে শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'স্বামীজি ও বঙ্গীয় যুবকগণ' নামক একটী সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। আগামী ১লা ফাল্গুনের উদ্বোধনে উহা প্রকাশিত হইবে। সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতান্তে স্বামী সারদানন্দ সমাগত ব্যক্তিগণের কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

ডায়মণ্ড হারবারে দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তৎসম্বন্ধে আমরা এই পত্র পাইয়াছি—'এ অঞ্চলের স্ত্রী পুরুষে ধান ভানিয়া থাকে।

এখানকার ধানচালের ব্যবসাই প্রধান জানিবেন। মাছের ব্যবসাও আছে। পূর্ব্ববার আমরা যে সকল গ্রামে সাহায্য করিয়াছিলাম, সেই সকল গ্রামের অবস্থা এখন অনেকটা ভাল; সকলেই ভানাকুটা করিয়া একরকমে চালাইতেছে। পুরুষেরাও কর্ম্ম করিতেছে। এইবারে যে সকল গ্রামের বিধবাদের সাহায্য করিতেছি, তাহাদের ভানাকুটা বা মাছধরা কোনরূপ কর্ম্মই নাই। বাদায় তেমন মাছও নাই, মাঠে ধানও তেমন নাই। যাহাদের কোন সম্বল নাই, তাহাদের অপরেও বিশ্বাস করিয়া ধান ভানিতে অর্থ বা ধান দিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের চিরদুঃখ অনিবার্য্য। পূর্ব্বে অনেকবার জানাইয়াছি যে, এদেশে মোট বিধবার সংখ্যা অনেক বেশী—কলেরাই ইহার একমাত্র কারণ। ৩।৪ বৎসর মড়কও বেশী। অনাহারের পর নূতন অন্ন আহারই কলেরার প্রধান কারণ। এ বৎসরও কলেরার প্রকোপ দেখা গিয়াছে। এবার আর অভাবগ্রস্তদিগকে দৈনিক এক পোয়া হিসাবে চাউল দেওয়া যাইতেছে না। কারণ, পুনরায় ধান হওয়া পর্য্যন্ত বরাবর সাহায্য করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সকল বিধবাকেই সাহায্য করাও কম অর্থের কাজ নয়। সুতরাং যে সকল বিধবার ৩।৪টী বা ততোধিক নাবালক ছেলে আছে, তাহাদের স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা করা যাইতেছে। যথা—ধান ভানিয়া কারবার করিয়া যাহাতে কোনরূপে খাইতে পায়, এই কারণে ধান্য ক্রয়ের জন্য ৫৲ টাকা ঐরূপ পরিবারগণের মধ্যে কাহারও ঢেঁকি না থাকিলে একটী ঢেঁকির জন্য ২।৩ টাকা এককালীন দানের ব্যবস্থা করা যাইতেছে। উঁহাদের মধ্যে যাহারা নিরাশ্রয় বা যাহাদের ঘরের চাল নাই, তাহাদের ঘরের জন্য ২।৪ টাকা এবং বস্ত্রাভাব ও শয্যাভাব দেখিলে বস্ত্র ও কম্বল দেওয়া হইতেছে।" ইত্যাদি।

কামারখালে চট্টগ্রাম হইতে এক গাড়ী (১৩৫ বস্তা অর্থাৎ ২৭০ মন) চাউল কিনিয়া পাঠান হইয়াছে। তথায়ও সাহায্য আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

রামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে এক্ষণে অর্থের অত্যন্তাভাব। পাঠকবর্গের কাহারও সাহায্য করিতে ইচ্ছা হইলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেন্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ (কলিকাতা) ঠিকানায় অর্থসাহায্য পাঠাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মণ্।)

গোবিন্দ নামে একটী বালক, নিবাস বরাহনগর, জাতিতে তেলি, রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রায় আসিতেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করিতেন। রামকৃষ্ণদেব যতক্ষণ ভগবৎকথা কহিতেন, গোবিন্দ পুলকিত হইয়া শুনিতেন ও অবিরল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। এই বালককে রামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক দিবস গোবিন্দ কহিলেন, "আমার একটী বন্ধু আপনার কাছে আসতে চায়। সে বড় ভাল ছেলে। তাকে আনব কি?" রামকৃষ্ণদেব অনুমতি দিলে গোবিন্দ তাঁহার বন্ধু গোপালকে লইয়া আইসেন। ঈশ্বরীয় কথা শুনিলে গোপালের ভাব হইত, এবং রামকৃষ্ণদেব এই দুই বালকের নিকটে থাকিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের দেখিলে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিস্থ হইতেন। তিনি হৃদয়কে বলিতেন যে, গোবিন্দের প্রহ্লাদের অংশে জন্ম, আর গোপালের ধ্রুবের অংশে জন্ম। তাঁহারা কিছুদিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট এইরূপ যাতায়াত করিলে পর এক দিবস গোপাল তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে বিদায় দিন, আমি আর এ সংসারে থাক্‌ব না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বলিস্ কিরে? তোর এই অল্প বয়েস, আর কিছুদিন থাক্‌না, তার পর যাস্?"

গোপাল কহিলেন, "না বাবা, আমি আর এ সংসারে থাকব না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আবার আস্‌বি ত?"

গোপাল বলিলেন, "আচ্ছা, আবার আস্‌ব।"

এই ঘটনার পর হইতে বালকদ্বয় আর রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেন না। কিছুদিন অতীত হইলে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হৃদয়কে তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। তাঁহাদের জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত আছেন, এবং হৃদয়ও কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই; ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ গোবিন্দ

আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপবেশন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে এতদিন কোথা ছিলি? গোপাল কোথা?"

গোবিন্দ কহিলেন, "গোপাল আপনার কাছে বিদায় নিয়ে তার পর চলে গেছে।"

রামকৃষ্ণদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি রে সে চলে গেছে?"—উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ!" গোবিন্দেরও এ সংসারে থাকিতে আর ভাল লাগিল না সেও কিছুদিন পরে ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

এই সময়ে নানা সম্প্রদায়ের সাধকগণ, পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য বহু লোক রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন। জয়পুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত নবদ্বীপে পঁচিশ বৎসর ন্যায়শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। তথায় অবস্থিতি কালে তিনি লোকমুখে রামকৃষ্ণদেবের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন সেই সময়ে রামকৃষ্ণদেব এক খণ্ড বংশ স্কন্ধে লইয়া বাহ্যহীন ভাবোন্মত্তাবস্থায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে বলিয়াছিলেন, "আহা একেবারে উন্মাদ!" কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যে সাধারণ উন্মাদ নহেন, দেবোন্মাদ—ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার ভবিষ্যদবস্থা কিরূপ হয়, জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইতেন। কখন কখন বা আসিয়া তাঁহার নিকটে কিছুদিন অবস্থিতিও করিতেন, এবং যতবারই তাঁহাকে দর্শন করিতেন ততই অধিকতর বিমোহিত ও তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেন। নবদ্বীপে পাঠ শেষ হইলে জয়পুরের রাজার সভাপণ্ডিত হইবার জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শেষ দর্শন করিয়া যাইবেন মনে করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতির পর চাতুর্ম্মাস্যের সময় উপস্থিত হইল—তিনি সেই খানেই চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল সন্দেহ ছিল, সেই সময়ে রামকৃষ্ণদেবের নিকট তৎসমুদায়ের মীমাংসা করাইয়া লইতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে মহা আনন্দ উপভোগ করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের বারুদখানার পাঞ্জাবী শিখ সিপাহীগণ রামকৃষ্ণদেবকে গুরু নানকের অবতার জ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন; এমন কি, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পথে গমন কালে তাঁহাকে গাড়ীতে দেখিলে সকলে তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করিতেন। প্রতিদিন দৈনিক কার্য্য হইতে অবসর পাইলে তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, এবং যাঁহার যেমন সঙ্গতি তিনি প্রভুদেবের জন্য তদ্রূপ কিছু না কিছু আহার্য্যদ্রব্য আনিতেন। এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে বারুদখানায় লইয়া গিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক গুরু নানকের উপদেশবাক্যের চর্চ্চা করিতেন। এক দিবস রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের সহিত তথায় যাইবার সময় শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একটী উপদেশবাক্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া কিছু উপদেশও দিতে লাগিলেন। শিখগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং "ক্যায়া, গৃহী হোকে জ্ঞান বতাতা!" বলিয়া সকলে আপনাপন তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, তাঁহার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব এই বিষম বিপদ্ দেখিয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিবারণ করিয়া বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার খাতিরে শাস্ত্রী মহাশয়কে মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। প্রভুদেবের এই কথায় তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "গৃহীওঁকো ইয়ে চাল বড়া বুরা হ্যায়। মগর তুম অ্যায়সা কাম আওর মত করো!" শাস্ত্রী মহাশয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল, তিনি কহিলেন, "জি নেহি!"

ক্রমে ক্রমে নানা স্থানের সিপাহীরা আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতেন; এবং বারাকপুরের সিপাহীরা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বারাকপুরে লইয়া যাইতেন। এক দিবস তাঁহারা তাঁহাকে বারাকপুরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে কিরূপে থাকিতে হয়? এই প্রশ্ন শ্রবণ মাত্র তিনি দেখিলেন, তাঁহার মাথার উপর একটা ঢেঁকী; অমনি ঢেঁকীতে চিড়া কুটিবার উপমা তাঁহার মনে উদয় হইল, এবং তিনি সেই উপমা দিয়া কহিলেন, "মেয়েরা যেমন ঢেঁকীর গর্ত্তে হাত দিয়ে চিড়ে পাল্‌টে দেয়, অথচ সেই সঙ্গে একটী ছেলেকে মাই দেয়, আবার হয়ত একটী খোদ্দেরের সঙ্গে দর হিসেব করে, এতগুলো কাজ এক সঙ্গে করে, কিন্তু মনটা আর থাকে সেই ঢেঁকীর দিকে; অই ঢেঁকীটা হাতের উপর পড়ে না। সেই রকম সংসারে থেকে ষোল আনা মনটী ভগবানে দিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আর কোন গোল থাকে না।"

মথুরানাথের পুত্র দ্বারিকানাথ রামকৃষ্ণদেবকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন।

একদিন তিনি কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করাইতে আনিলেন। তিনি বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে দিয়া সম্বাদ পাঠাইলেন, হৃদয় যাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন যে মাইকেল তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হৃদু তুই যা, আমি যাব না।" হৃদয় তাঁহার কথামত উক্ত কুটিতে আগমন করিলে, মাইকেল তাঁহাকে "আসতে আজ্ঞা হয়" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারিকানাথ কহিলেন, "ইনি পরমহংসদেব নন। ইনি তাঁর ভাগ্নে।" তৎপরে হৃদয়কে বলিলেন, "আপনি তাঁকে ডেকে আনুন" এবং দত্তজা মহাশয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ইনি তাঁহাকে দর্শন করতে এসেছেন।" তখন পুনরায় যাইয়া হৃদয় তাঁহাকে আনয়ন করিলে মাইকেল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করে আমায় কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বল্‌ব কি মুখ যেন কে চেপে ধরছে।"

মাইকেল কহিলেন, "আমি আপনাদের দাসকুলে জন্মেছিলুম, আমায় বল্‌বেন না কেন?"

প্রভুদেব কহিলেন, "তা নয়। আমি বল্‌তে চাই কিন্তু আমার বুক যেন কে চেপে ধর্‌ছে, বল্‌তে দিচ্ছে না।"

মাইকেল প্রভুদেবের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি আপনি আমায় কেন বলবেন না।"

রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে কহিলেন, "শাস্ত্রীকে ডেকে আনত" শাস্ত্রী মহাশয় তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া চাতুর্মাস্যের ব্রত পালন করিতেছিলেন। হৃদয় তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি সম্পুট চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে মাইকেলকে উপদেশ করিতে অনুমতি করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুমতি পাইয়া সংস্কৃত ভাষায় মাইকেলের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। দত্তজ মহাশয়ও তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাষা অশুদ্ধ হওয়াতে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ভাষা অশুদ্ধ হচ্ছে কেন?"

মাইকেল। "অনেক দিন চর্চ্চা নাই সেই জন্য।"

শাস্ত্রী। "আপনি কি হিন্দুধর্ম্ম মানেন না?"

মাইকেল। "মানি।"

শাস্ত্রী। "তবে কৃশ্চান্ হলেন কেন ?"

মাইকেল। "আমি ধর্ম্মের জন্য কৃশ্চান্ হইনি। আমার অবস্থা তখন বড়ই খারাপ হয়েছিল, খেতে পেতুম না। দেখলুম কৃশ্চান্ হলে পেট্‌টা চলবে। তাই পেটের দায়ে কৃশ্চান্ হয়েছিলুম। কিন্তু এখন বেশ বুঝেছি, সেটা ভুল করেছিলুম। আর এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, হিন্দু ধর্ম্মের মত আর ধর্ম্ম নেই।"

রামকৃষ্ণদেব এই কথা শুনিয়া গান ধরিলেন, "বল দেখি ভাই কি হয় মলে," তৎপরে "সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। আপনার কর্ম্ম আপনি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥" মাইকেল গান শুনিয়া বলিলেন, "আমাকেও তিনি এই রকম করেছেন, আমি কি করব ?" তাহার পর তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী যাবেন ?"

শাস্ত্রী কহিলেন, "আমি কারো বাড়ী যাই নি, আমার কোন প্রত্যাশা নাই, থাকলে যেতুম।" মাইকেল রামকৃষ্ণদেবের গান দুইটীতেই প্রচুর উপদেশ পাইয়া পরম আহ্লাদিতচিত্তে বিদায় লইলেন।

শাস্ত্রীমহাশয় দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহার জয়পুরের সভাপণ্ডিত হইবার বাসনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, তিনি কাহাকেও মন্ত্র দেন না। শাস্ত্রীর আগ্রহ আরও বাড়িল, তিনি মন্ত্র না লইয়া ছাড়িবেন না। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে মন্দিরে যাইয়া কালীদর্শন করিতে উপদেশ করিলেন। শাস্ত্রী কহিলেন, "এখানে চেতন কালী থাক্‌তে আমি পাষাণ কালী দেখ্‌তে যাবনা।" রামকৃষ্ণদেবই তাঁহার চেতন কালী।

কিছুদিন পরে চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে শাস্ত্রী মহাশয় মনের দুঃখে ভাগীরথী-তীরে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া আছেন, এমন সময় তথায় রামকৃষ্ণদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় অমনি তাঁহার দুইটী চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর আমার মন্ত্র দাও, আমায় দীক্ষা দিতেই হবে, আমি ছাড়ব না।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঐ কালীমন্ত্র জপ কর, তাহলেই হবে।" শাস্ত্রী মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন এবং কিছু

দিন পরে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় প্রভুদেবকে বলিয়াছিলেন, "যদি বস্তু পাই ত আবার আসব, নইলে আর আসবো না।" তৎপরে এক পর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে হঠাৎ বিষম জ্বরগ্রস্ত হইয়া তথায় দেহত্যাগ করেন।

হৃদয়ের ইচ্ছা—রামকৃষ্ণদেবের মত তাঁহারও ঐশী শক্তি জন্মে; ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার মাতুলের পদ্ধতিতে সাধনাদি করিলে ইহা হইতে পারে। এই ভাবিয়া কখন কখন পৈতা ও কাপড় ফেলিয়া দিয়া ধ্যান করিতে বসিতেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা দেখিয়া একদিন কহিলেন, "হৃত, তুই কেন ওরকম করিস্? ওরকম করিস নি। মাকালী আমায় ঐ অবস্থা করে দিয়েছিলেন, আমার বুদ্ধি উল্‌টে দিয়েছিলেন, তাই আমি ঐ রকম করতুম, নইলে আমি কি সাধ করে করতুম? তুই ওরকম করিস্‌নি, তুই কেবল আমার কাছে থাক্‌বি, সেবা করবি; তুই যে আমারি অংশ, সেবার জন্যে এসেছিস্; নইলে কি সেবা কর্‌তে পারিস্, সাধ্যি কি? তুই যে আমার অংশ, তোর আর কিছু করতে হবে না।" রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে এইরূপে বুঝাইয়া তৎপরে মথুরানাথের নিকট বালকের ন্যায় সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন। মথুরানাথ হৃদয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ! অমন যদি করবে, ত তোমার জান নেব! বাবার কাছে আমরা দুজনে নন্দীভৃঙ্গীর মত থাকব, আর সেবা করব। খবরদার আর ওরকম কোরনা!" হৃদয় আর আড়ম্বর বা তাঁহার মাতুলের ক্রিয়া কলাপের অনুরূপানুষ্ঠান না করিয়া মা কালীর পূজাতেই মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণদেবকে কহিতেন, "মামা, তোমার ঐশ্বর্য্য আমায় দেও। আমার বড় সাধ, একটী নবরত্ন কোরে তোমায় সেখানে রাখি, আর তোমার পূজ করি, ভোগ দি।"

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "তুই ও সব করলে কি হবে? এর পর দেখবি, কত লোকে কত কি করবে। আর তুই কেবল দেখে দেখে বেড়াবি। তুই একলা করলে কি হবে? এর পর ঘরে ঘরে পূজ করবে।" ইহার কিছু পরে একদা নিশীথকালে রামকৃষ্ণদেব শৌচে গমন করিতেছেন, হৃদয় গাড়ুটী লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। এমন সময় হৃদয় হঠাৎ দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব শূন্যমার্গে যাইতেছেন, মানুষ নহেন সাক্ষাৎ পতিতপাবন ভগবান্, এবং দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেবও যে বস্তু, তিনিও সেই বস্তু। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া হৃদয় চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ও রামকেষ্ট, ও রামকেষ্ট, ওরে তুইও যে

আমিও সেই। ওরে আমরা মানুষ নইরে—তবে আর কেন, চল্ দেশে দেশে যাই জীব উদ্ধার করিগে।" হৃদয়ের বিকট চীৎকার শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ওরে অমন করে চ্যাঁচাস্‌নি, চুপ কর্, লোকে শুনলে কি বলবে? চুপ কর্।" হৃদয় সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া আরও চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রামকৃষ্ণদেব দ্রুতপদে আসিয়া, তাঁহার বক্ষস্থলে হস্তস্পর্শ করিলেন, কহিলেন, "থাক্ থাক্, জড় হয়ে থাক্। একটু দেখেই এত, আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা এর চেয়ে কত বেশী দেখছি। তোর এখনো সময় হয়নি, চুপ কর্ চ্যাঁচাস্‌নি।" হৃদয় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নির্জীব হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "মামা, তুমি দিব্য চক্ষু দিলে, দিয়ে কেড়ে নিলে কেন? তুমি জড় হতে বল্‌লে কেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বল্‌লুম। তুই এখন স্থির হয়ে থাক, সময়ে কত দেখবি, কত বুঝবি।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হৃদয়ের ভাবাবেশ হইতে লাগিল। ভাবে কখন হাসেন কখন কাঁদেন, কখন বা নৃত্য করেন। একদিন শ্যামার পূজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঐরূপ হাস্য করিতেছেন, এমন সময় রামকৃষ্ণদেব মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। মথুর হৃদয়ের ভাব দেখিয়া কহিলেন, "বাবা এসব ত তোমারি খেলা, তা না হলে এত দিন ত হৃদুর ওসব কিছু হয় নি। সে দিন তোমার কাছে ও কেঁদেছিল' তাই তোমার কৃপা হয়েছে। আচ্ছা বাবা, ভাব হলে মনের ভিতর কি রকম হয়?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ও এবার আর ঢঙ করে নি। একতার হয়ে কচ্ছে। তোমারও যখন হবে তখন বুঝতে পারবে। ঐ অবস্থা না হলে বোঝা যায় না। জলের মাছ জলে ছেড়ে দিলে তার যেমন হয়, সেই রকম হয়। তা তোমার যখন হবে তখন বুঝতে পারবে।" এই বলিয়া হৃদয়ের বক্ষে হস্ত দিয়া কহিতে লাগিলেন, "থাম্‌রে থাম্! আর ভাব দেখাতে হবে না। ভাব দেখিয়ে আমারি বড় সব হল, আবার তুমি ভাব দেখাচ্ছ। চেপে যা চেপে যা, ভাব চাপ্‌তে শেখ্।" হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিলেন, এবং তদবধি আর তাঁহার ঐরূপ ভাব না হইয়া শান্ত ভাবে দর্শনাদি হইত।

ক্রমশঃ।

বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ। *

(শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।)

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ একটী অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশঃ মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁর নাই। তাঁহার সম্পত্তি প্রেম। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আশা-ভরসা ছিল; সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন। তাঁহার এই কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অতি যত্নে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত নানাজনের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। মনে স্থির বিশ্বাস রাখো, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্বার্থত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য্য মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও পশ্চাৎপদ হইও না,"—বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচারকার্য্য—ভারতমাতার কার্য্য। দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতি-সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁহার সেই মহাব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন, প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটী মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইলে, জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে। তিনি তাঁহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন, ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দু।

* গিরীশ বাবু লিখিত এই প্রবন্ধটী—বিগত ২০ শে জানুয়ারি, কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির উৎসব উপলক্ষে পঠিত হয়।

ফরাসী জীবনের কেন্দ্র,—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজ্যশাসনে সকলের অধিকার—এই তাহাদের মূলমন্ত্র ; তাহাদের উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা বিনা বাক্যে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে উন্মাদবৎ আচরণ করিবে, ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না। নগর ভস্মসাৎ করিবে. অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নর-হত্যা করিবে। যতদিন না তাহারা সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজ-জীবন লাভালাভ হিসাবের উপর স্থাপিত, তাহাদের যাহা যাহা করিতে বলো করিবে ; কিন্তু যদি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে। রাজসম্মান দিতে তাহারা সম্পূর্ণ উৎসাহিত, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে এক কপর্দ্দক দিবে না। "তাহারা হিসাবনিকাস না পাইলে একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইবে,"বলেন এই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাজাকেও হত্যা করিয়াছে। হিন্দুর জীবন—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাশনে রাখো, আবাসহীন করো, পদদলিত করো, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,—কিন্তু তাহার ধর্ম্মের উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনরূপেই সহ্য করিবে না। পাঠানেরা রাজা হইয়া ধর্ম্ম চালনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দু কর্ত্তৃক তাহাদের সিংহাসন বারবার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্ত্তে অপরজাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের কোনও বংশীয় ধারা ভারত-সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই। মোগলেরা ভারত-অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে চলিল, কিন্তু যখন আওরংজিব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন, অমনি মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কার্‌ট্রিজ কাটায় ধর্ম্ম নষ্টের আশঙ্কায় সিপাই বিদ্রোহে ইংরাজ রাজ্য টলটলায়মান হইয়াছিল। ধর্ম্ম হিন্দুজীবনের কেন্দ্র স্বরূপ। যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হয়, বিবেকানন্দের মতে তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে, যদি জাতীয় জীবন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, হিন্দুর তো ধর্ম্মনাশ হয় নাই, তবে এরূপ হীনাবস্থা কেন ? তাহার উত্তর, সনাতন ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইবার নয়, কিন্তু স্বার্থচালিত ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের স্বার্থপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম অতি মলিন করিয়াছে। এই হীন অবস্থা সেই মালিন্যের ফল। বিবেকানন্দ বলেন, "অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মযাজকের ব্যাখ্যায়

২

সেই গীতার স্বরূপ অর্থ লুপ্ত হইয়াছে। গীতার মতানুসারে, এক্ষণে দেখা যায়, কৃশ্চাণ ধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্যপ্রদেশ চালিত। বিবেকানন্দ বলেন, কৃশ্চান ধর্ম্মের উপদেষ্টা যিশু বলিয়া গিয়াছেন, 'যদি তোমার একগালে আঘাত করে, তোমার অপর গাল ফিরাইয়া দাও, যীশু আসিতেছেন, সকলে পোঁটলা-পুট্‌লি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।' গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—'বীর বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর; বীর বীর্য্য প্রকাশে চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।' দেখা যাইতেছে, গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ পৃথিবী ভোগ করিতেছে, আর ভারতবাসী পোঁটলা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া বসিয়া আছে।" কেহ বলিতে পারেন, সাংসারিক কার্য্যে ব্রতী হওয়া ত সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। বিবেকানন্দ বলেন,—সন্ন্যাসধর্ম্ম স[illegible] নয়। বুদ্ধদেব সকলের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করায় অনেক ভণ্ড [illegible] হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হইয়াছে। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাঁহাদের নিমিত্ত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাঁহাদের কার্য্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসীদের তিনি বলেন,—"দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো, যাহাতে জনে জনে স্বধর্ম্ম পালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ দাও, গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।" উপস্থিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান মালিন্য এই যে, তমোগুণকে আমরা সত্ত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চ শক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারি, তথাপি তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না, ইহার নাম ক্ষমা। কিন্তু বলবান্ ইংরাজের লাথি খাইয়া আসিলাম, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী আসিয়া বলিলাম, ক্ষমা করিয়াছি। ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব—কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভগবান্ প্রমুখাৎ গীতা শ্রবণে অর্জ্জুনের জড়ত্ব দূর হইল ও তিনি তেজে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। আমরা এক্ষণে সেই জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি, যে যার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন্ জাতি কিরূপে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা দেখিবার সাবকাশ নেই, ধর্ম্মযাজকের কুপ্রথা মতে ভ্রমণ করিলে জাতি যাইবে, আমার ঘরের ভেতরেই বসিয়া থাকিব, কিছুই দেখিব না শুনিব না, মুখে এক একবার উন্নতি উন্নতি করিব,—জড়ত্বের এই অধঃসীমা।

জাপান ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান সকল সভ্যজাতির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জাপানিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইংরাজের যে সকল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন, আমরাও সেইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল চেয়ার আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ, ইংরাজি রকমে চলে, আমরা হিন্দুরকমে চলিব। যেখানে যা ভাল পাইব, লইব, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু। হিন্দুর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটী আপত্তি উঠিতে পারে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম্ম ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন হইবে না। কারণ, ভারতবাসী সকলে এক ধর্ম্ম অবলম্বী নহে। ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নিউপাসক পার্শী প্রভৃতি নানাজাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ না হইলে ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটী চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বলেন,—"নরসেবা তোমার একমাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম। মনুষ্য মাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তি স্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়? বিবেকানন্দ যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আশ্রম দেখিলে এই ভে সংশয় আর কাহারো মনে থাকিবে না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, এই সেবাধর্ম্ম অবলম্বনই,—ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। ইহাতে ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে, যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য, ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। আপত্তি হইতে পারে, ইহা কঠিন পন্থা,—কঠিন পন্থাই বটে, সেই কারণে বিবেকানন্দ

ধনী বা বড়লোকের দ্বারস্থ হন নাই, বিলাসী হইতে শত হস্ত অন্তরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বঙ্গযুবকগণকে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্য্যভার গ্রহণে সক্ষম। তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম। বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না, তোমরাই আত্মবলিদানে ভারতমাতার প্রীতি সাধন করিতে পারিবে, বিশ্বাস করো তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো,—কখনই নিষ্ফল হইবে না; তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র কৃতী।" কাহাকে ঘৃণা করিও না, ভগবান্ রামকৃষ্ণের মানা, বিবেকানন্দের গুরুদেবের মানা। বিশ্বাসে শুষ্ক স্বতন্ত্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে সেই স্বতন্ত্রতা দূর করে। ভক্তির কোমলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তি-জ্ঞান-বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো,—কল্পিত নৈতিক ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিও না, কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্যাগপূর্ব্বক উৎসাহিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করো। ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ নয়, দশকর্ম্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করো। বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে আসিয়াছ, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা সেই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবে। কিন্তু বোঝো, গগনস্পর্শী স্বর্ণচূড়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া, দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রপট স্থাপন করিয়া, সেই মহানুভবের স্মৃতি স্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে জনে তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে পারিবে। তোমরা নিঃস্ব—আরও ভালো, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম! মনুষ্যত্ব লাভ করো, তোমরা মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো, ভগবান্ রামকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন ও কার্য্যশীল বিবেকানন্দ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। "বিশ্বাস করো"—বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই "বিশ্বাস" দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি স্থাপনা করিবে।

বৈধব্যে দেবী।

আমি জীবনে বৈধব্যের নামে অনেককে দুঃখের প্রতপ্তাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি; অনেকেই বৈধব্যের মহনীয় ব্রতের গাধীয়ান্ অর্থের পরিগ্রহ করিতে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ হইয়া, যেন উদ্‌ভ্রান্ত মদিরায় একেবারে বিহ্বল ও বিবশ হইয়া, নৈরাশ্যের বিকট ও বিকৃত আলেখ্য সন্দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধির বিকৃত বিড়ম্বনায় রূপজ মোহ—ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা—পাশব ভোগকেই আদর্শ জ্ঞান করিয়া,—মনুষ্য জীবনের সার্থকতায়, বৈধব্যের মাঙ্গলিকী অর্চ্চনায় আপনাদিগকে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই, অশ্রু তাঁহাদের জীবনানুবন্ধী সহচর, উষ্ণশ্বাস প্রাণাবলম্ব; এবং নৈরাশ্য তাঁহাদের নিত্যসেব্য।

তুমি বৈধব্যের নিরর্থ নিষ্ঠুর কথায় আর আমাকে প্রতারিত করিও না। আমি জীবনে অনেকবার বহুপ্রকারে নৈরাশ্যের নীরস-সঙ্গীতে অভিভূত হইয়াছি। যে স্থানে আদর্শের সুখোজ্জ্বল প্রসন্ন সমীরণ প্রবাহিত হয় না; যে স্থানে আনন্দের সুধাস্রোতঃ সুখ-গতিতে প্রধাবিত হয় না; যে স্থানে মনুষ্য-লক্ষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ চরিতার্থতায় প্রাণে অমেয় আনন্দ ও আশার উচ্ছ্বাসিত প্রবাহ হয় না, সেই অতি বিকট ও অতি ভীষণ শ্মশানস্থানে মনুষ্য হাহাকার ব্যতীত আর কোন্ কদর্য্য আসুরাভিনয়ের প্রত্যক্ষ লীলা সন্দর্শন করিবে? আর, কেমন করিয়াই বা মনুষ্য সেই দুঃখ-তমিস্রাসঙ্কুল ভয়াবহ নরকে অশ্রুসর্ব্বস্ব হইয়া শপেন্‌হাওয়ারের বিষাদ-কাহিনীকেই জীবনারাধ্য মনে না করিবে?

তুমি বৈধব্যের স্বর্গীয় নামে আর হতাশ হইও না। বৈধব্যের মহিমাময়ী গীতি তোমার জীবনকে অনন্তকাল সমুন্নত করুক। তুমি মনুষ্য, ইন্দ্রিয় তোমার দাসানুদাস; ভোগ-তৃষ্ণা তোমার মনুষ্যত্বের মহোচ্চ আদর্শের সৌবর্ণ-বিগ্রহের পুণ্যপাদতলে মহাবলির ন্যায় উৎসর্গীকৃত হউক; রূপতৃষ্ণাকে তুমি পশুসেবা বা দানব ভোগ্য জ্ঞান করিয়া আদর্শের বিজয়-সঙ্গীতে বসুন্ধরাকে সঞ্জীবিত রাখ। যে স্থানে রূপ-তৃষ্ণা—ইন্দ্রিয়পিপাসা—সেই স্থানেই হাহাকার—নৈরাশ্যের প্রতপ্তাশ্রু—বিষাদের দুঃখ গীতি।

প্রেমে বৈধব্যব্রতের সর্ব্বতোমুখী উদ্দীপনা। প্রেম অনন্ত ও অবিনাশি ; বৈধব্য মহাব্রত ;—মহীয়সী সাধনা, সাধনার অন্তে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। যাঁহারা বৈধব্যের নামে অশ্রুসম্পাতে হৃদয় তর্পণ করেন, তাঁহারা প্রেমের নিত্যতায় সন্দেহাকুল ; অথবা, প্রেম ও রূপজ আকর্ষণ তাঁহাদের উদ্‌ভ্রান্ত অভিধানে এক ও অভিন্ন। প্রেম যদি অনন্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের ন্যায় দুঃখচিত্র আর কিছুই পরিকল্পিত হইতে পারে না। অনন্ত সমুদ্র—অনন্ত সমুদ্রে অনন্ত জল-তরঙ্গ,—এই জগতে কোন্ মূঢ় অনন্ত সমুদ্র হইতে তরঙ্গের স্বাধীন সত্তার অবোধ কল্পনায় বিড়ম্বিত হইতে ইচ্ছা করে ? প্রেম বিশ্বব্যাপি। মনুষ্য হৃদয়ে সেই অনাদি সার্ব্বভৌম প্রেমেরই নানাবৈচিত্র্যলীলা। প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতার হতাশ কাহিনী আর শুনাইও না ; প্রেমের অনিত্যতার বিষাদবার্ত্তায় লোকধাত্রী বসুন্ধরাকে কলুষিত করিও না ; প্রেমের সান্ততার হতাশ প্রলাপে পৃথিবীকে পাপভারাক্রান্ত করিও না। তুমি যদি মনুষ্যজীবনের আদর্শ বুঝিতে পারিয়া থাক ; মনুষ্য-জীবন যদি তোমার হাসিকান্নার প্রমোদলীলার বস্তু না হয় ; যদি মনুষ্য-জীবনের অনন্ত লক্ষ্য থাকে ; তাহা হইলে, প্রেমকে অনিত্য, অসার বা রূপজ মোহের বিকৃত আখ্যায় অভিহিত করিও না।

প্রেম উপাসনা—উপাসনায় তন্ময়তা। বৈধব্যে প্রেমের ভাবাত্মিকা গরীয়সী লীলা। সেই জন্যই, বৈধব্যের পুণ্যক্ষেত্রে আত্ম-পরায়ণতার নির্ব্বিশেষ তিরোধান। যিনি ভোগপিপাসার সমূল সমুৎসাদনে আত্মাহুতির বিনিময়ে বৈধব্যের প্রাণময়ী অর্চ্চনায় আপনাকে অনন্তপ্রকারে চরিতার্থা মনে করেন, তিনি লোক-নিবাস বসুন্ধরায় দেবীপ্রতিমা। কেননা, তাদৃশী আত্মাহুতিতে বৈধব্যের প্রাণার্চ্চনায় তিনি সর্ব্বপ্রকারে প্রেমের নিত্যতা, সার্ব্বভৌমত্ব ও অনন্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনি সত্য সত্যই প্রেমকে মহাযজ্ঞ স্বরূপ ধ্যান ও উপাসনা করিয়া মেদমাংসের অনিবার্য্য শাসনের উপর আপনার আরাধ্য মহাসত্যের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যাশ্রু ভাগীরথীর সুখপ্রবাহ, তাঁহার নির্ব্বিকার সাধনায় সর্ব্বতোমুখ আত্মবিসর্জ্জন, তাঁহার আত্মত্যাগে আকাঙ্ক্ষা নাই আশা আছে, ভীতি নাই আনন্দ আছে, তৃষ্ণা নাই প্রাণ আছে। তাঁহার আশা অনন্ত—উদ্দেশ্য অসীম, সিদ্ধি অনন্তকালস্থায়িনী। বিরহে প্রেমের ব্যত্যয় হয় না। বৈধব্যের অতি অবোধ্য দর্শনে যাহাদের প্রাণাতঙ্ক হয়, তাহারা অদর্শনে বিস্মৃতির বিভীষিকা

দেখিয়া ভীতভীতবৎ অবস্থান করে.। বিরহে প্রেমের বলবতী উদ্দীপনা। অদর্শন প্রেমের উদ্দীপক পুণ্য বন্ধন-সূত্র। কালব্যবধি বা স্থান-দূরত্ব প্রেমকে কদাপি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, প্রেম জড়ানুভূতির উপমাস্থল নহে। আর এক কথা। প্রেমে বিরহ অসম্ভব। অতএব, তৃষ্ণার ব্যাঘাতজনিত অপরিহার্য্য হৃদয়াবেগও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। যদি চাক্ষুষ দর্শনের অভাব মানসী অনুভূতির নামান্তর হয়, হায়, জানিনা তাহা হইলে মনুষ্য কতকাল পশুত্বের বিকৃত পূজায় আপনাকে সহস্ররূপে প্রতারিত করিবে! প্রেম ইন্দ্রিয়রাজ্যের দূরস্থ তত্ত্ব। তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়াবেগের অসংযত আর্ত্তনাদ। প্রেমের প্রধান ও পরম লক্ষণ প্রিয়জনের প্রাণসহযোগে নিয়ত ধ্যান। ধ্যানে বস্তুতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ সান্নিধ্য। তাহা না হইলে, ধ্যানের সার্থকতা থাকে কোথায়? আর, যে প্রেমাত্মক ধ্যান মনুষ্যজীবনের আশামৃত, তাহারই বা অস্তিত্ব রহে কৈ? তাই, বৈধব্যের উপাসনায় ধ্যান। ধ্যানে প্রিয়তমের দূরত্ব কল্পনা মূঢ়ত্বের দ্বিতীয়, উদাহরণ। তুমি যদি প্রেমের মহীয়ান্ অর্থ সত্য সত্যই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাক, তাহা হইলে দূরত্বকল্পনার বিফল প্রয়াসে তুমি এত উদ্‌ভ্রান্ত হও কেন? যে স্থানে প্রেম, সেই স্থানে ধ্যান; যে স্থানে ধ্যান, সেই স্থানে তন্ময়তা। অতএব. প্রেমের সুখশীতল পুণ্য-রাজ্যে কোন্ অবোধ কল্পনায় বিরহের অস্তিত্ব আদৌ সম্ভবপর? আর বিরহের বিভ্রান্ত কল্পনায় মনুষ্যপ্রেমের নামে আসুরী পূজার বিহ্বল প্রমোদে কেনইবা প্রমত্ত রহিবে?

রূপ-কল্পনা প্রেমের স্বতঃসিদ্ধ সহজ ধর্ম্ম। এইরূপ কল্পনার সার্থকতা আছে। কেননা, এইরূপ কল্পনা হৃদয়নিহিত এক অতি দুনিরীক্ষ্য মহাভাবের প্রাণাত্মিকা অভিব্যক্তি। এইরূপ কল্পনা ব্যতীত ধ্যানের সম্ভবপরতা যার পর নাই অলীক ও অস্বাভাবিক। রূপ প্রেমের অবলম্ব ও বিশ্রামস্থল। এই রূপে প্রাণ আছে পিপাসা নাই, শান্তি আছে আর্ত্তনাদ নাই; উচ্ছ্বাস আছে আবেগ নাই; আশা আছে ভয় নাই। এইরূপে উন্নতির প্রাণাভিরামা ঊর্দ্ধগতি; পতনের আশঙ্কায় উহা কদাপি দূষিত নহে। উহার স্মরণে প্রাণে আনন্দ, কল্পনায় অনন্ত আশা, দর্শনে মনোবুদ্ধির অতীত বিপুল শান্তি। স্বার্থবুদ্ধির বা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের অথবা ভোগ-পিপাসার অসংযত দুর্জ্জয় আকর্ষণে সাময়িক চিত্তবিক্ষোভ জনিত যে এক অতি অপবিত্র ও জঘন্য বিকৃত চিত্র মনোমধ্যে উপস্থিত হয়, তাহাকে রূপজ আনন্দ বলিলে সত্যের যার পর নাই দুর্গতি হইবে। রূপকল্পনাব্যতীত উপাসনা উন্মত্ত প্রলাপ। বৈধব্যে উপা-

সনার মনোমোহন চিত্র। রূপকল্পনা বৈধব্যের মূল সূত্র। হৃদয়ারাধ্য মহা-দেবতা বিধবার মানসনেত্রে সতত বিদ্যমান। তাঁহার অদর্শনের মহাভীতি নাই। কেননা, প্রেম অনন্ত অক্ষয় সুধাপ্রস্রবণ। প্রেমে মনুষ্যের অনন্ত জীবন। প্রেমের স্বাবাবিক ধর্ম্ম ও অনিবার্য্যফল প্রিয়জনের প্রত্যক্ষ দর্শন। বিধবার অনন্ত শান্তি প্রিয়তমের রূপকল্পনায় আত্মবিস্মৃতি। যদি উপাসনার সার্থকতা থাকে, যদি প্রেমের মঙ্গল-বাণী নিরর্থা না হয়, যদি সাধনায় সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে, বিধবার অনন্ত শান্তি; বৈধব্য মহাব্রত, এবং বৈধব্যের নামেও প্রেমাত্মিকা উপাসনার সুখদ সুচারু চিত্র সন্দর্শনে মনুষ্যের আশা ও আশ্বাস সহস্র পথে উচ্ছ্বসিত হইবে, সন্দেহ নাই।

তুমি মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পৎ কি, তাহা জাননা, অথবা জানিতে প্রস্তুত নহ। তুমি ভোগাসক্তিকে মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞান করিয়া সুখের নামে অধঃপাতের হৃদয়পূজায় দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিতেছ। তুমি মূঢ়; জ্ঞান কি জাননা; সৌন্দর্য্য বুঝনা, সত্য দেখনা।

নতুবা বৈধব্যের নাম স্মরণে তোমার নৈরাশ্যসঙ্কুল ভীষণ আতঙ্ক সঞ্চার হইত না। তুমি মোহবিহ্বল, কিরূপে সৌন্দর্য্যের সেই ভুবনবিমোহন মহা-চিত্রের সুখদ সন্দর্শনে আত্মার চরিতার্থতা উপলব্ধি করিবে? তুমি ইন্দ্রিয় ভোগবিমূঢ়; কিরূপে বৈধব্যের সেই অননুভবনীয় দুর্নিরীক্ষ্য মহাভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবে?

বৈধব্যে রূপের অনিত্যতা অসম্ভব। কেননা, প্রেম রূপের পাদপীঠ। প্রেম অনন্ত ও অবিনাশি। অতএব কেমন করিয়া রূপের অনিত্যতায় প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতার পাপ পরিচিন্তনে বিধবা আতঙ্কে অভিভূত হইতে পারেন? প্রেমে প্রাণদেবতার নিয়ত প্রত্যক্ষ সত্তা। মোহে অদর্শন। প্রেমে রূপের অনন্ত তাৎপর্য্য। অদর্শনে ভীতি। প্রেমে অদর্শনের সম্ভাবনা কোন্ নরাধম চিন্তা করিতে সমর্থ? জড়নেত্রে রূপের অনিত্যতা, কেননা, সেই সমতল ভূমিতে প্রেমের বিলাস একেবারেই অসম্ভব।

বিধবার অমল হৃদয়-সরসীসলিলে প্রেমের বিচিত্র-সুচারু-সুখ-বিলাস। রূপ সেই পুণ্য ক্ষেত্রে সতত প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত। বিরহ কেমন করিয়া সেই পুণ্য প্রশান্ত মহাভূমিতে ক্ষণতরেও অবস্থিতি করিতে পারে? উপাসনায় প্রাণের শান্তি; প্রেমের পরিতর্পণ; হৃদয়ের আনন্দ; মনুষ্যের সার্থকতা। যিনি উপাসনার পরম নিগূঢ় মহাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনি

বৈধব্যে দেবীসাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়াছেন। বৈধব্য তাঁহার নিকট নীরস নিষ্ঠুর হতাশ চিত্র নহে; বৈধব্যে তিনি অনন্ত উন্নতি ও অনন্ত সিদ্ধি সন্দর্শন করেন।

উপাসনার পরম লক্ষণ ও প্রধান স্বরূপ একত্বানুভূতি—অদ্বৈত জ্ঞান—অদ্বয় বোধ। কেননা, উহা প্রকৃত প্রেমের প্রকৃষ্ট ও গরিষ্ঠ চিহ্ন। একপ্রেতি-চিতায়—সর্ব্বাঙ্গীণ তন্ময়তায়—সর্ব্বতোমুখী-আত্মাহুতিতে প্রেমের পূর্ণ পরিণতি। যতক্ষণ দ্বিতীয় বোধ, ততক্ষণ প্রেম অসার ও অলীক মোহ-বিকৃতিরই অপবিত্র নাম। যে মূঢ় ও পাপ-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাবকেই অদর্শনের নীরস ও নিরর্থ নামে অভিহিত করে, সেই অজ্ঞান কেমন করিয়া জানিবে ও বুঝিবে, একসংস্থ ও একনিষ্ঠ প্রেমে দ্বিতীয় বস্তুর কল্পনা যার পর নাই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক? তুমি পশু বা ততোধিক অধম। সেই জন্যই, মোহ-বিহ্বল তুমি পৈশাচভাবাত্মক পদার্থান্তরকে রূপতৃষ্ণার চরিতার্থতার উপায় ও আধার মনে করিয়া তাহাতেই বৈধব্যের শান্তি কল্পনা কর। যে দুরাশয় ও মূঢ়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়মোহের উদ্‌ভ্রান্ত তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া, ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর মানস প্রত্যক্ষের সম্ভবপরতা বুঝিতে পারে না, সেই হতভাগা দেহ পরিবর্ত্তনে প্রেমের বিধ্বংসিতা স্মরণ করিয়া, আতঙ্কে ম্রিয়মাণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈধব্যে হৃদয়দেবতার মৃত্যু বা অদর্শন হয়না। সুতরাং, দ্বৈতবোধ তাহাকে কদাচ আকুল বা অধীর করিতে পারে না।

বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রেমানুশীলন। প্রেমে উহার সঞ্চার—প্রেমে উহার বিকাশ ও প্রেমে উহার পরিণতি। বিবাহের পবিত্রতা অনন্ত; বন্ধন নিত্যকালব্যাপি; উন্নতি অসীম। ইন্দ্রিয়পিপাসায় বিবাহের প্রয়োজনীয়তা পশুর অবোধ কল্পনা। প্রেমের নিত্যসিদ্ধতায় বিবাহ অনন্ত সিদ্ধি। বিবাহ পার্থিব উদ্দেশ্যের কলঙ্কস্পর্শশূন্য। প্রেম উহার পরম প্রস্রবণ; উপাসনা উহার একমাত্র ক্রিয়া। সুতরাং কেমন করিয়া ও কোন্ প্রাণে প্রেমের অনিত্যতায় বিবাহের পুণ্য ও অক্ষয় বন্ধনের ক্ষণ-বিধ্বংসিতার মূঢ় কল্পনা এই লোকধাত্রী অবনীর কলঙ্ক বর্দ্ধন করিবে? যদি প্রেমের পূর্ণানুশীলন বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ হয়, এবং প্রেম হইতেই যদি উহার প্রাণ-লীলা হয়, তাহা হইলে বিরহের অসার কল্পনায় পাপাক্রান্ত হইও না। স্মৃতির আরাধনা দেবত্ব। প্রেম হইতে স্মৃতির আনন্দ বিকাশ। ধ্যানময়ী স্মৃতির বিনাশ হয় না। প্রেম হইতে ধ্যান। স্মৃতি ও ধ্যানে কোন পার্থক্য আছে কি? ইন্দ্রিয়-

গ্রামে বিরহের পূর্ণ সম্ভাবনা। অখণ্ড প্রেমরাজ্যে বিচ্ছেদের বিভীষিকার ভ্রূভঙ্গী নাই। তাই, স্মৃতির ধ্যানময়ী উপাসনা বৈধব্যের মহাদীক্ষা। সেই জন্যই প্রেমের মহনীয়নামে বৈধব্যের অক্ষয় সার্থকতা। তাই বলি, বৈধব্য অনন্ত সিদ্ধি; অনন্ত শক্তি; অনন্ত আশা। প্রেমের স্বতঃসিদ্ধফল শক্তি। অথবা প্রেম ও শক্তি এই দুই ব্যবহারিক কথায় কোন মৌলিক বৈষম্য নাই।

প্রেমে কবির সুখ-সঙ্গীত। বৈধব্যে কবিতার অনন্ত আশ্বাস-বাণী। সৌন্দর্য্য-চিত্রণই কবির একমাত্র লক্ষ্য। প্রেমে কবি সৌন্দর্য্যের অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ-আলেখ্য সন্দর্শন করেন। সেই জন্যই, বৈধব্যে কবির আশা ভিন্ন আতঙ্ক হয় না। আর, সেই জন্যই লোকনিবাস মেদিনীতে কবির এত গৌরব। যাহারা উচ্ছৃঙ্খল সাময়িক-মোহবিহ্বলতায় প্রেমের নিষ্ফলতার পাপকাহিনীর উন্মত্ত পাপ-চিত্রে মনুষ্যকে ব্যাকুল ও ব্যথিত করে, তাহাদের ন্যায় ভীষণ শত্রু এই জগতীতলে আর দ্বিতীয় পরিকল্পিত হইতে পারে না। মনুষ্যত্বের অতি উর্দ্ধনামে তাহাদিগকে আহ্বান করিও না। অনেকে কবিতার পরম স্পৃহনীয় নামে এবম্বিধ নিষ্ফল প্রলাপে মনুষ্যকে যার পর নাই আকুল ও হতাশ করিয়াছে। তাহারা প্রেমের নামে মোহের উপাসনায় জীবনক্ষয় করিয়াছে; সুখের সঙ্গীত-শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া হতাশ আর্ত্তনাদে কালাতিপাত করিয়াছে, এবং সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে বিকৃতির তিমির গহ্বরে অতি শোচনীয় রূপে নিপতিত হইয়াছে। সেই জন্যই, বৈধব্যের সার্থক সুখদ চারু-চিত্রের অনন্ত সুষমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, একেবারেই ম্রিয়মাণ হইয়াছে। পৃথিবী আর তাহাদের পাপভার বহিতে পারে না। বৈধব্য তাহাদের নিকট অসার-দুঃখ-তমিস্রা, প্রেম নৈরাশ্য, আশা ভ্রান্তি।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম, বৈধব্য মহাযজ্ঞ; প্রেমে উহার সঞ্চার ও পরিণতি; উপাসনা উহার মহামন্ত্র, আত্মোৎসর্গ উহার মহাসাধনা; উন্নতি মহাসিদ্ধি। প্রেম অনাদিসিদ্ধ মহাতত্ত্ব। বৈধব্য অনন্ত উন্নতির পরম সাধনা, বৈধব্য অসার বা নিষ্ফল নহে। বৈধব্যে দুঃখ নাই। কেননা, প্রেমে অনন্ত সুখ। বৈধব্যে আত্মাহুতি, অথবা, আত্মাহুতির বিনিময়ে অনন্ত শান্তি। যে স্থানে আত্মাহুতি, সেই স্থানেই অনন্ত দেবত্ব। সুতরাং, বৈধব্যের উপাসনায় তাহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ শান্তি স্বরূপ সিদ্ধিলাভে বিধবা অনন্ত দেবত্বের একমাত্র নিত্যাধিকারিণী।

শ্রীশশিমোহন বসাক এম্ এ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২রা ফাল্গুন ইংরাজী ১৪ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার গঙ্গাতীরস্থ বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা ও তদুপলক্ষে ৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারি রবিবার মহোৎসব হইবে।

বিগত ২০ শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারি শালিখা রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতির সভ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করেন। তদুপলক্ষে পূজা, কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণ ও প্রায় দ্বিসহস্র দরিদ্রসেবা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

উক্ত সমিতির যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায়, সমিতির কার্য্যের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। সমিতি উহার নিয়মিত কার্য্য ব্যতীত প্রায় ৩০০ (তিন শত) টাকা তুলিয়া ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি প্রভৃতি নানাস্থানের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন। সমিতি সম্প্রতি একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—উহাতে শিল্পশিক্ষার উদ্দেশে আপাততঃ তাঁত এবং মোজা ও গেঞ্জিবোনাও শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমিতির সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শালিখা (হাওড়া) উক্ত অবৈতনিক বিদ্যালয় ও কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার জন্য আপাততোপযোগী স্থান দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যাঁহারা এই সমিতিকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত অতুল বাবুর নিকট অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় (হাওড়া) এই ঠিকানায় অর্থাদি সাহায্য পাঠাইতে পারেন।

শ্রীশশিমোহন বসাক এম এ লিখিত 'বৈধব্যে দেবী' নামক প্রবন্ধের প্রতি আমরা পাঠকপাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রবন্ধটী সুলিখিত। স্বার্থবিসর্জ্জনই যে প্রকৃত প্রেম ও উহাই যে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, ইহাই লেখকের প্রতিপাদ্য। তিনি অতি সুললিত ভাষায় নিজভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের মনোভাব আমরা যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, তবে বলি, তিনি বৈধব্যের স্বার্থত্যাগকে একটী উদাহরণ স্বরূপে মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখভোগকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতের সহিতই লেখকের মতানৈক্য। নতুবা স্বেচ্ছাচারী সমাজকর্তৃক নারীজাতির অনিচ্ছাসহকৃত বৈধব্য ব্রহ্মচর্য্যে নিশ্চিত তাঁহার সহানুভূতি নাই। বিবাহ যদি আত্মায় আত্মায় মিলনই হইল, তবে পুরুষজাতির 'বৈধব্য'ই বা কেন না বিহিত হইবে? আর ইহাও বুঝিতে হইবে, পারমার্থিক অর্থাৎ আত্মার দৃষ্টি হইতে দেখিলে 'বিবাহ' বলিয়া কোন পদার্থ নাই—কারণ, আত্মায় লিঙ্গভেদ নাই। বিবাহ প্রেমশিক্ষার সোপান অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে, পশুবৃত্তি হইতে দেবত্বে আরোহণ করিতে হইলে সাধারণতঃ সমাজকে বিবাহ রূপ আংশিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তবে বুঝিতে হইবে, হিন্দু শাস্ত্রে যে চতুরাশ্রমের বিধান আছে, তাহার সকলগুলিই ঐ চরম প্রেম বা একত্বানুভূতির বিভিন্ন সোপান স্বরূপ। ব্রহ্মচর্য্যে উহার আরম্ভ এবং সন্ন্যাসে উহার পরিণতি। আবার যিনি বিবাহরূপ সোপানের মধ্য দিয়া না গিয়া একেবারেই ঐ একত্বানুভূতি লাভের চেষ্টা করেন এবং ব্রহ্মচর্য্যব্রতকেই জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ অবলম্বন করেন, তিনিই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ। বিবাহ দুর্ব্বলের জন্য—তা তিনি পুরুষই হউন, নারীই হউন। আর বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখা অতীব কর্ত্তব্য। স্বামী স্ত্রীর সুখের জন্য নিজের সুখবাসনা, স্ত্রীও তদ্রূপ স্বামীর সুখের জন্য নিজ সুখবাসনা ছাড়িতে অভ্যাস করিলেই উভয়ের মধ্যে একতরের বিয়োগে জীবিত ব্যক্তি অপরের মানসীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে সক্ষম হন এবং যেমন লক্ষ্যবেধকারীরা ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে মনোনিবেশ করেন, তদ্রূপ নর বা নারী তখন সেই পরব্রহ্মকেই পতি বা পত্নী (অর্থাৎ পরম প্রিয় বস্তু) রূপে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কৃতকার্য্য হন। 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি ন বা অরে পত্ন্যাঃ কামায় পত্নী প্রিয়োভবতি আত্মনস্তু কামায় পত্নী প্রিয়ো ভবতি।'

আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারি, কাশী, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালোর—রামকৃষ্ণ মিশনের এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিতভাবে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হইবে,—

কাশী।

পরমহংসদেবের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা ৩টা হইতে ৪টা

ভজন ও সঙ্গীত ৪টা হইতে ৫টা

প্রসাদ ও ধর্ম্মপুস্তিকা বিতরণ ৫টা হইতে ৬টা।

মান্দ্রাজ।

ভজন প্রাতে ৬টা হইতে ৮টা

দরিদ্রসেবা ৮½টা হইতে ২টা।

হরিকথা (বিভীষণশরণাগতি)

(এম, কে, থাথাচারিয়ার কর্ত্তৃক) ২½ হইতে ৫টা।

'ভারতের অভ্যুত্থান ও রামকৃষ্ণ মিশন' সম্বন্ধে হাইস্কুলের হেডমাষ্টার পক্ষপকেশ আয়ার কর্ত্তৃক বক্তৃতা।

সভাপতি—শিবস্বামী আয়ার, ৫½টা হইতে ৭½।

বাঙ্গালোর।

ভজন ও নগরকীর্ত্তন—প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা

দরিদ্রসেবা (সওকার দোদানার স্কুলে) ১১টা হইতে ৩টা

মান্দ্রাজনিবাসী শ্রীমান্ পরমস্ব তিরুবেঙ্কট দাস কর্ত্তৃক হরিকথা

(রামনচরিত) ৩টা হইতে ৬টা

'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী ও উপদেশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা

৬টা হইতে ৭½টা।

(সভাপতি—কে, পি, পুত্তান্না চেট্টি, কাউন্সিলর)

রামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য।

শ্রীহট্ট জেলার কামারগাঁও গ্রামে যে দুর্ভিক্ষমোচনাশ্রম খোলা হইয়াছে, তথায় নিম্নলিখিত মত চাউল বিলি হইয়াছে :—

প্রথম বিলি।

গ্রাম সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	লোক সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
১০	৯২	২৭৯	১১/॥০৮০
	সমবেত ভিক্ষুকগণকে দান		/১৷০
		মোট	১২ মন

২য় বিলি (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭।)

গ্রাম সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	লোক সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
৩০	২৪২	৮৬৪	৩২৸৮৴৷৷০
	সমবেত ভিক্ষুকদিগকে দান		১৴১ ৷৷০
		মোট	৩৪ মন

উপস্থিত ৩০টী গ্রামে চাউল দেওয়া হইতেছে, কিন্তু আরো অধিকগ্রামে সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু অর্থাভাবে সেই সকল গ্রাম এখনও লইতে পারা যাইতেছে না। আবার ঐ গ্রাম সমূহে কলেরারও বেশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। লোকগুলির খাদ্য শুধু লাউ, এক প্রকার বন্য শাক ও শুঁট্‌কি মাছ। কয়েকদিন এই প্রকার খাইলেই হয় কলেরা নতুবা হাত পা ফুলিয়া জ্বর ও কাশি ইত্যাদি হয়। তার পর বিনা চিকিৎসাতে মৃত্যু। যিনি এক্ষণে ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি লিখিতেছেন, "আমরা কয়েকদিন হইল, আমাদের সাহায্যভুক্ত গ্রামসমূহের মধ্যেই দুইটী লোককে এই প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি—আমরা তাহাদের জীবনরক্ষার ভার লইয়াও ঔষধ বিনা কিছুই করিতে পারি নাই।" আমরা সম্প্রতি ডাঃ প্রিয়নাথ দাস, ডাঃ নিতাই হালদার ও ডাঃ এন কে মজুমদারের সহায়তায় কয়েকটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও একখানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ উক্ত স্থানে পাঠাইয়াছি। এখানে আবার বস্ত্রাভাবও ভয়ানক। "যে সকল গ্রামে আমরা এক্ষণে কার্য্য করিতেছি, সেই সকল গ্রাম পরিদর্শন কালে অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, যাহারা বস্ত্র বিনা গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না। ইহাদের গায়ে কাপড় থাকা ত দূরের কথা, পরণেও একখানা কাপড় নাই। হয় ত একখানা চেটাইখণ্ড দ্বারা কোন প্রকারে লজ্জানিবারণ করিয়া উপস্থিত হইল।"

ডায়মণ্ড হারবারে এখনও যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও অর্থাভাবে কার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীগুরুদাস বর্ম্মণ।

মথুরানাথ বিষয় কর্ম্মের জন্য মধ্যে মধ্যে জানবাজারে যাইয়া কিছু দিন থাকেন, আবার কিছু দিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে জানবাজারে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময় তাঁহারও ভাব হইতে লাগিল। তিনি আর বিষয় কর্ম্ম কিছুই করিতে পারেন না। কখন আপন মনে গান করেন, কখন আপনার ভাবে আপনি হাসেন, কখন বা উন্মত্ত হইয়া ধেই ধেই নৃত্য করেন। আবার কখন বা অতি করুণ স্বরে একেলা বসিয়া রোদন করেন। তাঁহার বাটীর সকলে তাঁহার হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইলেন। পুত্রেরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ডাক্তার আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও প্রতীকার ঘটিল না দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পিতার বায়ুরোগ হইয়াছে। মথুরানাথ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "না রে বাপু আমার মাথা খারাপ হয় নি, আমি পাগোলও হই নি। তোরা বাবাকে এখানে আনতে পারিস? ভাগিনি, বাবাকে এখানে নিয়ে আয়।" এই কথা শুনিয়া পুত্রেরা বুঝিলেন যে, তবে বায়ুরোগ হয় নাই, এবং ত্বরায় যাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে সম্বাদ দিলেন। তিনিও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ জানবাজারে উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিলে পর তিনি কহিলেন, "মথুর, তুমি ভাব কি রকম জান্‌তে চেয়েছিলে, তাই মা কালী তোমায় জানিয়ে দিলেন। এখন আর কেন? এর পর লোকে বল্‌বে আমি তোমাকে গুণ করেছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মথুরও স্থির হইয়া দম্ভ সহকারে কহিতে লাগিলেন, "আমি কারুর কথা মানিনি।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে পুনরায় কহিলেন, "তবে বাবা, এসব তোমাতেই সাজে আর তোমাতেই থাক্। আমি ওসব চাই নি। আমি বিষয় কর্ম্ম করব আর প্রাণভরে তোমার সেবা করব।"

রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন, "বেশ, তাই হবে।" তদবধি মথুরানাথের আর ভাব হইত না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তত্ত্বদর্শী হইতে লাগিলেন।

একদিবস রামকৃষ্ণদেব ভাগীরথীতীরস্থ উদ্যানে বসিয়া আছেন, নিকটে

হৃদয়। ইতিমধ্যে মালাপাড়ার জনৈক প্রাচীন গোস্বামী, "মহাপুরুষ কোথায়, মহাপুরুষ কোথায়" বলিয়া রামকৃষ্ণদেব যেখানে ছিলেন, সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে কহিলেন, "হৃদু, দৌড়ে যা ঐ দুর্গানন্দকে দেখিয়ে দিগে যা।" এই বলিয়া দ্রুতগমনে আপন প্রকোষ্ঠ হইতে একখানি মোটা বস্ত্র লইয়া আপনাকে আপাদ মস্তক আবরিয়া নাট মন্দিরের একটী স্তম্ভের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। দুর্গানন্দ নামে একজন ব্রহ্মচারী এই সময় পঞ্চবটীতে থাকিতেন। হৃদয়, গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সেই দুর্গানন্দের নিকট গেলেন। দুর্গানন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোস্বামী কহিলেন, "ইনি ত মহাপুরুষ নন, মহাপুরুষ কোথায়, মহাপুরুষ কোথায়?" এই বলিয়া পুনরায় অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কালী-মন্দিরে উঠিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া মা কালীকে প্রণাম করিয়া নাট মন্দিরে আসিলেন ও সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত কে একজন বসিয়া আছেন দেখিয়া দ্রুত তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক আবরণ মুক্ত করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, আর গোস্বামী তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণদেব আপনার ঘরের পশ্চিম দিকের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ভাগীরথী দর্শন করিতেছেন, দূরে দুইজন মাঝি পরস্পর কলহ করিতে করিতে গঙ্গার তীর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ঝগড়া করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে একজন আর একজনের কেশাকর্ষণ করিয়া পৃষ্ঠে সজোরে এমন চপেটাঘাত করিল যে, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। এখানে রামকৃষ্ণদেব আপনার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া সেই প্রকার রোদন করিতে বসিয়া পড়িলেন। হৃদয় শ্যামার মন্দির মধ্য হইতে তাঁহার রোদন শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠে পাঁচ অঙ্গুলির দাগ রক্তমুখী হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি মামা তোমায় কে মাল্লে মামা, কে মাল্লে মামা বল, আমি তার মাতাটা গুঁড়িয়ে ফেল্‌ব, কে মাল্লে বল।" কিয়ৎক্ষণ পরে একটু স্থির হইলে রামকৃষ্ণদেব প্রকৃত ঘটনা বলিলেন। মাঝি দুইজন বহুদূরে যায় নাই; হৃদয় দ্রুতপদে তাহাদের নিকট যাইয়া একজনের পৃষ্ঠে তদ্রূপ করাঘাতের দাগ দেখিয়া এবং তাহাদের মুখে তাহাদের ঝগড়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

রামকৃষ্ণদেব ভারতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম এবং ভারতেতর দেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সমূহের সাধনা শেষ করিয়াছেন ; প্রায় অষ্টাদশটী বিভিন্ন মতের সাধনা করিয়া দেখিয়াছেন যে সকল মতই ভগবৎসকাশে উপনীত হইবার এক এক পথ এবং তাহাদের বিরোধ কাল্পনিক মাত্র। এই অমানুষী সাধন সমূহের শেষাবস্থা হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য এক প্রকার ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। পেটের পীড়ায় তাঁহাকে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, নানাপ্রকার চিকিৎসায় রোগের কোনও উপশম হইতেছে না। তাৎকালিক কবিরাজশ্রেষ্ঠ গঙ্গাপ্রসাদ সেন বহু দিন ধরিয়া চিকিৎসা করিয়া অবশেষে সকল প্রকার আহার এবং জল পান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। হৃদয় তাঁহার পেটের পীড়ার প্রকোপ দেখিয়া মধ্যে মধ্যে কহিতেন, "বাবা! যেমন ভাবের বেগ তেমনি রোগেরও ধমক্!" যাহা হউক কবিরাজ মহাশয়ের বাটী হইতে নির্গত হইয়া রামকৃষ্ণদেব হাসিতে হাসিতে হৃদয়কে কহিলেন, "অ হৃদু, লোকটা বলে কি রে? আড়াই মাস জল বন্দ করে কেবল দুদ্ খেয়ে থাক্‌তে হবে?" তাঁহার এ চিকিৎসা মনঃপূত হইলনা। হৃদয পরামর্শ দিলেন, "মামা, দেশে যাবে? চলনা দেশে যাই। সেখানে গেলে দু চার দিনে পেটের ব্যায়রাম সব সেরে যাবে। চল দেশে যাই।" রামকৃষ্ণদেব তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং দেশে যাইয়া আরোগ্য লাভ করিবার পরে তথা হইতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ তাঁহাদের এই পরামর্শ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং নানাবিধ বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আনাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন।

কামারপুকুরে আগমন করিলে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তাঁহার পীড়ার বিশেষ উপশম হইল। হৃদয়ের বাটী সিহোড় গ্রামে, এবং কামারপুকুরের অতি নিকট। রামকৃষ্ণদেব কখন আপন বাটীতে কখন বা সিহোড়ে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে অবস্থিতি করেন, তথনি সেই খানে এক মহাজনতার আবির্ভাব হয়। অনেক দিন পরে স্বদেশে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া পরিচিত লোকের ত কথাই নাই, যাঁহারা তাঁহাকে কখনও দর্শন করেন নাই, কেবল তাঁহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি যখন সিহোড়ে অবস্থিতি করিতেন, হৃদয় মহা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক

সকলকে আহার করাইতেন এবং কীর্ত্তন করাইতেন। রামকৃষ্ণদেব উৎসব অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, ভক্তিমান্ ব্যক্তি ব্যতীত এক দণ্ড ভক্তিহীন সংসারী লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে পারিতেন না। সাধনাবস্থা হইতে অদ্যাবধি রজোগুণী লোক দেখিলে অমনি তথা হইতে দূরে পলায়ন করিতেন। হৃদয় আপনার জীবনের জীবন স্বরূপ কনিষ্ঠ মাতুলকে ভাল বাসিতেন, একদণ্ড তাঁহারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। রামকৃষ্ণদেবও সাধনান্তে এমন পূর্ণ মাত্রায় শিশু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, হৃদু যাহা বলেন তাহাই করেন, হৃদু যেমন রাখেন তেমনি থাকেন। রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের সঙ্গ ভালবাসেন, তাই হৃদু প্রত্যহ একটী মহোৎসবের আয়োজন করেন আর তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করেন। হৃদয়ের মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া অতি ভক্তি সহকারে প্রত্যহ তাঁহাকে আহার করাইতেন। এবং রামকৃষ্ণদেবকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন যে, রামকৃষ্ণদেবের সিহোড়ে অবস্থিতি কালে তিনি প্রত্যহ তাঁহার চরণ ধৌত, আপন মস্তকের কেশদ্বারা তাহা মোচন ও পুষ্প বিল্বাদি দিয়া সুচারুরূপে পূজা করিয়া তৎপরে জলগ্রহণ করিতেন। এক দিন চরণ পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন, যেন কাশীধামে সজ্ঞানে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে চরণ অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, "তাই হবে, কাশীতে তোমার সজ্ঞানে দেহত্যাগ হবে।" প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব এক দিন হৃদয়কে কহিলেন, "আমি বিলিতী কুমড় খাব।" হেমাঙ্গিনী দেবী তখন প্রায় সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়াছেন, আবার ঠিক সেই সময়ে তথায় কুমড়া দুষ্প্রাপ্য। যাহা হউক হৃদয় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি উহা পাইলেন না। রামকৃষ্ণদেব শিশুর ন্যায় আব্দার করিতে লাগিলেন, "কুমড় নইলে ভাত খাব না।" বিষম বিপদ্, হৃদয় পুনরায় কুমড়ার চেষ্টায় বহির্গত হইলেন। খানিক দূর যাইয়া একজনের ঘরের চালের উপর একটী মাত্র কুমড়া দেখিয়া গৃহস্বামীকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়াও তাহা লইবার মানস জানাইলেন। গৃহস্বামী কহিলেন, "ওটী ঠাকুরদের জন্যে রাখা আছে, কিছুতেই দিতে পারব না।" ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। তাঁহার প্রাণসম মাতুলের ঈপ্সিত বস্তু সম্মুখে দেখিয়াও ফেলিয়া যাইতে হইতেছে; হৃদয় তাঁহার প্রাণটা যেন সেই কুমড়ার সঙ্গে রাখিয়া গেলেন। অতি বিষণ্ণবদনে তাঁহার মাতুলকে যাইয়া কহিলেন, "কি করব মামা পেলুম না।"

রামকৃষ্ণদেব সেই পূর্ব্বমত কহিলেন, "আমি বিলিতী কুমড়া নইলে ভাত খাব না।" ইতিমধ্যে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম এবং তাঁহাদের আত্মীয় নফর চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় একটী কুমড়া লইয়া তথায় উপস্থিত। হৃদয় কুমড়া দেখিয়া কহিলেন, "দাদা তোমরা এ কুমড়া কোথা পেলে?" রাজারাম কহিলেন, তাঁহারা পথে আসিতেছেন এমন সময় অমুকের চাল হইতে এই কুমড়াটী একটা হনুমান ছিঁড়িয়া পথে তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া পলায়ন করিল, আর তাঁহারা উহা কুড়াইয়া আনিলেন। তখন হৃদয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার ভ্রাতাকে ও মাতাকে কহিলেন। সেই কুমড়া রন্ধন হইলে তৎপরে রামকৃষ্ণদেব মহা আনন্দের সহিত আহার করিলেন।

কামারপুকুরে আসিয়া একদিন হৃদয়কে কহিলেন যে, শ্বশুরালয় যাইবেন। হৃদয় আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে মথুরানাথ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বেশভুষা করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব শ্বশুরালয় যাইতেছেন সম্বাদ পাইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনিও হাসিতে হাসিতে হৃদয়ের সঙ্গে কিয়দ্দূর যাইয়া হঠাৎ মহাভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর নয়নের জলে সেখানে কর্দ্দম জন্মিয়া গেল। বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন ও সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত দেখিয়া হৃদয় ও ধনি কামারনি তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। হৃদয় অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সহজাবস্থায় আনিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ অতীত হইল কিছুতেই বাহ্যজ্ঞান হয় না, অবশেষে ধনি তাঁহার বাল্যভাব সকল স্মরণ করিয়া উপস্থিত সকলকে কহিল, "ওগো গদাইকে যার যা খাওয়াতে ইচ্ছে থাকে এনে খাওয়াও।" সকলে যাহার যে উৎকৃষ্ট বস্তু ছিল আনিয়া গদাইয়ের মুখে স্ব স্ব হস্তে তুলিয়া দিতে লাগিলেন, তিনি সেই বাহ্যশূন্যাবস্থায় সেই সমস্ত আহার করিতে লাগিলেন। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই ঐরূপে তাঁহাকে আহার করাইল, তথাপি তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আসিল না। ধনি পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে কতকগুলি ডোম তাঁহাকে আহার করাইবার মনস্থ করিয়াছে কিন্তু ভয়ে তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। তখনি ধনি তাহাদের সংকল্পিত দ্রব্যাদি আনিয়া তাঁহাকে আহার করাইতে কহিল। সাহস পাইয়া তাহারা আপনাদের বৃক্ষ হইতে একটী কাঁটাল আনিয়া তাঁহাকে আহার করাইল, তৎপরে তাঁহার সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান আসিল।

পরদিন শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে সে বাটীর

স্ত্রীলোকেরা কোন ব্রত উপলক্ষে নৈবেদ্যাদির আয়োজন করিয়া পূজা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বালকের মত কহিলেন, "আমার নৈবিদ্যি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।" তাঁহারা কহিলেন, "বেশ খাও।" অমনি ভাবাবিষ্ট হইয়া নৈবেদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা পাগল জামাই আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল যে, জামাতা যথার্থই পাগল। যাহা হউক, সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিহোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই চারি দিবস তথায় এইরূপ যাতায়াত করিলেও শ্বশুরালয়ের লোকেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়াই স্থির করিয়া রাখিল।

কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন কালে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া রামকৃষ্ণদেব কিয়দ্দূরে মাঠে শৌচে গমন করিলেন। যেখানে বসিলেন, তথায় অনেক কালাকর্পূর ছিল। কালাকর্পূর এক প্রকার ছোট গাছ, ইহার পত্রপুষ্পে মহাদেব বড়ই সন্তুষ্ট হন। সেই সমস্ত পত্র পুষ্প দেখিয়া তাঁহার শিব পূজা করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া সেই অশুচি অবস্থায় পত্র পুষ্প তুলিয়া আপন মস্তকে অর্পণ পূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে ট্রেন পাছে ছাড়িয়া দেয়, এই ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া হৃদয় তাঁহাকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আপন মস্তকে পূজা করিতেছেন। হৃদয় ইহা দেখিয়া ভাবিলেন, আজ আর কলিকাতায় যাওয়া হইল না। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেবের বাহ্যজ্ঞান আসিলে জিজ্ঞাসিলেন, "কি, যেতে হবে না কি?"

হৃদয় কহিলেন, "আর যেতে হবে না, এখন শৌচ করে লও।" তৎপরে তাঁহারা দ্রুতবেগে ষ্টেসনে আসিলেন এবং অতি কষ্টে টিকিট লইয়া একখানি গাড়ীতে বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে গাহিতেন, "শুচি অশুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। দুই সতীনে পীরিত হলে, তবে শ্যামামাকে পাবি।" বোধ হয় তদনুযায়িক আপনি অশুচি অবস্থায় পূজা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া রামকৃষ্ণদেব একদিন মথুরকে কহিলেন, "দেখ, সাধু ভোজন করাতে ইচ্ছে হচ্চে।"

মথুর বলিলেন, "বেশ কথা বাবা, কি রকম খাওয়াবে বল, আমি আজই সব উদ্যোগ করে ফেলি।" পরদিন তিন চারি শত সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার

জানবাজারস্থ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন এবং তদুপযুক্ত বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্যাদি প্রস্তুত করাইলেন। ভোজনে বসিবার সময় সাধুগণের মধ্যে দলাদলী লইয়া একটা মহা গোল পড়িয়া গেল। রামকৃষ্ণদেব তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য হইলেন। অনন্তর বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর সকলে ভোজনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পরিবেশনের ব্যস্ততায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার কটিদেশ হইতে পরিধেয় অপসৃত হইতে লাগিল, অমনি হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া কাপড় পরাইতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই বালকের মত দিগম্বর, পরিবেশনই করিতেছেন, কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, ভ্রূক্ষেপও নাই। হৃদয় আসিয়া পুনরায় কাপড় পরাইয়া দিলেন।

বাটীর মহিলাগণ বহু অলঙ্কার বিভূষিতা হইয়া রামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তে সাধু-সেবা দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুগণ অমনি আহারে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। রামকৃষ্ণদেব সাধুদিগের এই অসাধু আচরণ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে মৃদুভর্ৎসনার সহিত কহিলেন, "তোমলোক্ সাধু হ্যায়। কেয়া দেখতে হো? ভোজন করো। মায়ি লোক শর্ম্মাতি হ্যায়, ভোজন কর!" তাঁহার কথায় সাধুগণের চৈতন্য হইল, এবং তাঁহারা লজ্জাবনতমস্তকে পুনরায় ভোজন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে মথুরানাথ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন।

আদি-ব্রাহ্মসমাজে বহু লোক সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন শুনিয়া, তথায় কি প্রণালীতে উপাসনা হয় তাহা রামকৃষ্ণদেব দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। মথুরানাথ একদিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তথায় গেলেন। কেশব চন্দ্র সেন তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকলে যে সময় ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন, রামকৃষ্ণদেব কেশবকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ ছেলেটীর ফাত্নায় মাছ খেয়েছে আর কারুর কিছু হচ্চে না।" কেশবচন্দ্রকে এই তাঁহার প্রথম দেখা, এবং এই দেখাতেই বুঝিয়াছিলেন যে কেশব ধ্যানপরায়ণ আর তথায় যত লোক ছিলেন কাহারও ধ্যানাবস্থা হয় নাই।

মথুরানাথ এবং তাঁহার পত্নী প্রাণপণে প্রভুদেবের সেবা করিতেছেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিয়া ভগবচ্চর্চ্চা করেন। একদিন কথায় কথায় তীর্থ ভ্রমণের কথা উত্থাপিত হইলে মথুরানাথের পত্নী মথুরকে কহিলেন, "চল না আমরা তীর্থ করে আসি?"

মথুরানাথ কহিলেন, "তীর্থে গিয়ে কি হবে? যদি ঠাকুর দেবতা দেখ্‌তে যেতে হয়, ত বাবাকে দেখলেই হল। আমার ত ওসব ভাল লাগে না আমার মনে হয় ওতে কেবল কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ আর শরীরের কষ্ট। যাঁকে দেখলে সর্ব্ব তীর্থের ফল হয়, যাঁর কটাক্ষে ভক্তি-মুক্তি মেলে, সেই তিনি আমার ঘরে; তাঁকে ফেলে কোথায় যাব? আমি ত কোথাও যাচ্ছি নি। তোমার যেতে ইচ্ছে হয় নিজে যাও, আমি যাব না।"

মথুরের পত্নী কহিলেন, "তা কেন, বাবাকে ফেলে যাবে কেন; বাবাকেও নিয়ে চল।"

মথুর কহিলেন, "বাবা যান ত যাব।" তাঁহার পত্নী এই কথা শুনিয় আগ্রহ সহকারে রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন, "বাবা আপনি যেতে রাজি হোন আপনি না গেলে হবে না বাবা।" রামকৃষ্ণদেব ভক্তের কাতরতা দেখিয় তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। মথুরানাথের সকল আপত্তি অমনি উৎসাহে পরিণত হইল, এবং অচিরে তীর্থ যাত্রার সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত করা হইল। দিন স্থির হইলে একখানি দ্বিতীয় ও তিন খানি তৃতীয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ গাড়ী এরূপ বন্দোবস্তে লওয়া হইল যে আরোহিগণের যে ষ্টেসনে আবশ্যক হইবে সেই স্থানেই সমগ্র ট্রেন হইতে ঐ চারিখানি গাড়ী পৃথকীকৃত হইতে পারিবে। ফাল্গুন মাস নাতিশীতোষ্ণ, রামকৃষ্ণদেব মথুর ও হৃদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর এক অংশে, রামকৃষ্ণের মাতাঠাকুরাণী মথুরের পত্নী ও পুত্রবধূ অপর অংশে; পাচক-ব্রাহ্মণ, দ্বারবান্, দাস দাসী প্রভৃতি প্রায় একশত পঁচিশজন লোক তিন খানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া শুভদিনে তীর্থ যাত্রা করিলেন।

মোগলসরাএর এক ষ্টেসন পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেবের সহসা অতিশয় পেটের পীড়া আরম্ভ হইল। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে শৌচে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সুবিধা হয় না, এজন্য ষ্টেসনে নামিয়া শৌচে গেলেন, হৃদয়ও সঙ্গে গেলেন। বন্দোবস্ত মত গাড়ীগুলি পৃথক্ করিয়া লইতে যাইতেছেন এমন সময় ট্রেন ছাড়িয়া দিল, মথুর অগত্যা দৌড়িয়া গাড়ীতে বসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয় যেন শূন্য হইয়া গেল ও চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পরের ষ্টেসনে নামিয়া পূর্ব্ব ষ্টেসনের ষ্টেসন মাষ্টারকে তার করিয়া রামকৃষ্ণদেবকে পরবর্ত্তী গাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, এবং মোগলসরাই ষ্টেসনে তাঁহাদের জন্য যানাদির বন্দোবস্ত করিয়া অতি বিমর্ষচিত্তে কাশীধামে প্রবেশ করিলেন। ও প্রথম যাইয়া তথাকার প্রসিদ্ধ রাজা মিত্রদের বাটীতে

উঠিলেন! এদিকে ট্রেন ছাড়িয়া দিলে হৃদয় কি প্রকারে তাঁহার জীবনের জীবনকে লইয়া কাশীধামে পঁহুছিবেন, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে একখানি মালগাড়ী আসিয়া উপস্থিত। শ্যামবাজারের সুপরিচিত রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সেই ট্রেনে একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ছিলেন। তিনি গাড়ী হইতে তথায় রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং তাঁহাকে ও হৃদয়কে অতি সমাদর পূর্ব্বক আপনার গাড়িতে উঠাইয়া মোগলসরাই ষ্টেসনে নামাইয়া দিলেন।

ভাগীরথীর বক্ষে নৌকার উপর হইতে বারাণসী দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং প্রত্যক্ষ করিলেন কাশী স্বর্ণময়ী। হৃদয় তাঁহাকে মথুরের নিকট উপনীত করিলে মথুরানাথ যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন, এবং আনন্দে বারম্বার প্রভুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদিন প্রভাতে মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে একখানি পালকীতে লইয়া, পার্শ্বে স্বয়ং, অপর পার্শ্বে হৃদয়, অগ্র-পশ্চাৎ বহুসংখ্যক রৌপ্যমণ্ডিত ছত্রদণ্ডধারী দ্বারবান্ সমভিব্যাহারে দেবদেবী দর্শন করিতে যাইতেন। রামকৃষ্ণদেব পাল্‌কীতে উঠিয়াই ভাবাবিষ্ট হইতেন, এবং প্রতি দেবালয়ের নিকটস্থ হইলেই তাঁহার ভাব এত প্রগাঢ় হইত যে, হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া নামাইতেন এবং দর্শনাদি করাইয়া পুনরায় পাল্‌কীতে উঠাইয়া দিতেন। তিনি শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দিরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর সমাধিস্থ হইতেন।

মিত্র মহাশয়েরা বিষয়ী লোক, তাহার উপর সেই বৎসর তাঁহাদের জমিদারিতে কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের বৈঠকখানায় সেই সমস্ত বিষয়কর্ম্মের চর্চ্চাই হইত। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় কথা রামকৃষ্ণদেবের অঙ্গে যেন অগ্নি বর্ষণ করিত। একদিন তিনি সেই যন্ত্রণায় রোদন করিয়া কহিলেন, "আমায় তীর্থে এনে এ কোথায় রাখলি মা, আমি দক্ষিণেশ্বরে ত বেশ ছিলুম, সেখানে কেমন সৎচর্চ্চা হত, আর এখানে কি মা, কেবল রাতদিন সাংসারিক কথা, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে মা। তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল্ মা।" মথুরানাথ সেই দিন হইতে কেদার ঘাটে পাশাপাশী দুইটী বৃহৎবাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী এই সময় নগ্নশরীরে, মৌনী ভাবে মণিকর্ণিকার তীরে থাকিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদের কাহাকেও

কোন প্রকার সাদর সম্ভাষণের ইঙ্গিত মাত্রও করিতেন না। তবে কোন বিশেষ ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইঙ্গিতে প্রশ্নের উত্তর দিতেন মাত্র। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিলে, হৃদয় তাঁহাকে পাল্‌কীতে লইয়া মণিকর্ণিকার তীরে গেলেন। তথায় যাইয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব সহাস্যবদনে ও করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আপনার নস্যদানীটি অভ্যর্থনার্থ তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, যেন কত কালের পরিচিত ব্যক্তি। রামকৃষ্ণদেবও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন।

অনন্তর রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর এক না বহু ?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইঙ্গিতে উত্তর করিলেন, "ধ্যান করিতে গেলে এক, কিন্তু মুখে বলিতে হইলে বহু।" রামকৃষ্ণদেব এই উত্তর পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হৃদয়কে কহিলেন, "এই ঠিক্ পরমহংস অবস্থা। আর শরীরের সমস্ত লক্ষণগুলিও ঠিক্।" এই বলিয়া হৃদয়কে সমস্ত লক্ষণ গুলিও দেখাইয়া দিলেন।

ঐ সময়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী তথায় একটী ঘাট বাঁধাইতেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের সহিত আলাপের পর হৃদয়কে সেই ঘাটের জন্য দুই চারি কোদাল মাটী কাটিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। হৃদয় কিন্তু অসম্মত হইয়া কহিলেন, "আমি দর্শন কর্‌তে এসেছি, মাটী কাট্‌ব কেন ?"

রামকৃষ্ণদেব ইহা শুনিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "আহা, হৃদু, দে রে দে ! উনি মহাপুরুষ, বলছেন, দে।" হৃদয় রামকৃষ্ণদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া দুই চারি কোদাল মাটী কাটিয়া দিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মথুরানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি রকম দেখ্‌লে ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ !"

হৃদয় কহিলেন, "তোমাকে দেখাবার জন্যে তাঁকে এখানে আস্‌তে টের বলেছিলুম। তাঁর একজন চ্যালা বল্লে, মথুর বাবু যদি এঁর ১০১ খানি বই ১০১ টাকায় কিনে বিতরণ করেন, তাহলে ইনি যাবেন, নইলে যাবেন না।"

মথুরানাথ সগর্ব্বে হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমিও তাঁকে দেখতে চাই

নি। আরে, বাবাকে যখন পেয়েছি তখন আর কাউকে চাইনি।” যাহা হউক দক্ষিণেশ্বরের রাধাকান্তজীউর সেবক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে মথুরের নিকট আনিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃত দেহের সৎকার কি প্রকার হয় দেখিবার জন্য এক দিবস রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে যাত্রা করিলেন। নৌকা যাইয়া উক্ত শ্মশান ঘাটের সম্মুখে লাগিল, আর তিনি নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল, কিছুক্ষণ পরে ভাবে উন্মত্ত হইয়া জলে ঝম্প প্রদানের উপক্রম করিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহরক্ষক হৃদয় সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন, ধরিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ পরে হৃদয়কে কহিলেন, “দেখ হৃদু, আজ দেখলুম, পিঙ্গলবর্ণ একজন জটাধারী দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ মহাদেব দাঁড়িয়ে শবদাহ দেখ্‌ছেন! আগে শুনেছিলুম, বিশ্বনাথ তারক-ব্রহ্ম-মন্ত্র দেন। কি আশ্চর্য্য আজ তা প্রত্যক্ষ দেখলুম।”

কাশীধামে এক সপ্তাহ থাকিয়া তাঁহারা প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগতীর্থের প্রথানুযায়িক সকলে মস্তক মুণ্ডন করিলেন, রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “আমার ওসব দরকার নেই।” কিন্তু মহা আনন্দের সহিত ত্রিবেণীতে স্নান করিয়াছিলেন। এখানেও দেবদেবী দর্শনকালে পূর্ব্ববৎ ভাবাবিষ্ট হইতেন, হৃদয় তাঁহার হস্ত ধরিয়া সমস্তই দর্শন করাইতেন। প্রয়াগে তিন দিবস থাকিয়া পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

স্বামী স্বরূপানন্দ।*

কবি নদীর স্রোতের সহিত কালের গতির তুলনা করিয়াছেন। পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীকুলের প্রচণ্ড নির্ঘোষে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে উল্লম্ফন, এবং প্রস্তরভেদী অমিত প্রতাপ দেখিলে কথা কতক সত্য বলিয়া মনে হইলেও কাল-

* মাননীয় প্রবাসী সম্পাদকের অনুরোধক্রমে স্বামী সারদানন্দ উক্ত পত্রের জন্য এই প্রবন্ধ লিখেন। উহা উক্ত পত্রের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

স্রোতে যে অভাবনীয় অচিন্তনীয় আমূল পরিবর্ত্তনরাজি আমাদের ভিতর সহসা উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সকল নদীবেগে কোথায়? আবার মনুষ্য-মনের উপর কালের যে অদ্ভুত আধিপত্য, তাহার সাদৃশ্যও নদীবেগে কিঞ্চিন্মাত্র অনুভূত হয় না। মুহূর্ত্তমাত্র কখন কখন বৎসরেরও অধিক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। আবার কয়েক বর্ষ কাল যেন দুই চারি দিন মাত্র বলিয়া মনে হয়। দুঃখনিশার চিরস্থায়িত্ব এবং সুখের দিনের আস্বাদন পাইতে না পাইতে সহসা অবসান কে না জীবনে অনুভব করিয়াছে? অতএব হে কালশক্তি! তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্যকুলের সসীম পরিমাণ গণনার পারে অনন্ত অব্যয় স্বাত্মার সহিত অখণ্ড স্বরূপে নিত্য বিরাজিতা থাকিয়া এক্ষণে যোনিকাবর্ত্তিত বাহ্যিক নামরূপ-ক্রীড়াচ্ছলে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছ গড়িতেছ, আবার কখন বা নিজেকে আপাতঃ-স্থির রাখিয়া মনুষ্যকুলকে অনিত্যে নিত্য অনুভব করাইয়া অট্টহাস্যে দিঙ্-মণ্ডল নিনাদিত করিতেছ। আবার সর্ব্বার্থে শরণাগত বিরল কাহাকেও বা সর্ব্বপ্রকার নামরূপ ও পরিণামের অতীত নিত্যসুন্দর নিজ কমনীয় কান্তি প্রদর্শনে ধন্য করিয়া কালীনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছ! হে চণ্ডী! তোমার মোহিনী মায়ায় কতই না নামরূপের সহিত এ জীবনে সংযোগ হইল! সে সকল এখন কোথায়? বিচিত্র মুক্ত কেশপাশে আবরিত করিয়া সে 'পরাণ-পুতলি' সকল কেমনে কোথায় লুক্কায়িত রাখিয়াছ? আজ নয় বৎসর যাহার সহিত সম্বন্ধে উল্লাসিত রাখিয়াছিলে, সে বিচিত্র গুণরাজির বিচিত্র সমাবেশস্থল স্বরূপানন্দকেই বা আজ সহসা কোথায় লুক্কায়িত করিলে?

সে আজ নয় বৎসরের কথা। তখন পুণ্যপ্রতাপ স্বামী বিবেকানন্দ অদ্ভুত গুরুশক্তি বিস্তারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ চমকিত করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী বেলুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ভক্তপরিকুল এবং শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান মঠবাটীর নির্ম্মাণ তখনও আরম্ভ হয় নাই, জমীমাত্র ক্রীত হইয়াছিল, এবং ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে সমাগত স্বামীজীর কয়েকটি ভক্ত—'ধীরা মাতা' 'নিবেদিতা' এবং 'জয়া'—সেই জমীর ভগ্নবাটিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মপিপাসু কতই না মানব সে সময় স্বামীজির প্রভাবে নিত্য আকৃষ্ট এবং কৃপালাভে ধন্য হইয়া নবীন জীবন লাভ করিতেছিল। বৈশাখের—অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণ। স্বামীজি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া নিম্নতলস্থ গৃহ নিজপ্রভায় আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট। অনেকগুলি

লোক কলিকাতা হইতে সমাগত। তাহারা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা কূট প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছিল এবং সে সকলের সদুত্তর লাভে আপ্যায়িত এবং অবাক্ হইতেছিল এবং ভাবিতেছিল, "এরূপ অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা, ভাবের কথায় এরূপ অনন্ত অগ্নিময়ী অন্তঃস্থলস্পর্শী ভাষাপ্রয়োগ ইতি পূর্ব্বে অন্য কোথাও শুনি নাই! ভগবন্! এ সৎপুরুষের সঙ্গ যেন বহুকাল লাভে ধন্য হইতে পারি!" কয়েক ঘণ্টা ঐরূপ বাক্যালাপের পর অনেকে বাটীর বাহিরের উদ্যানে পরিভ্রমণ, শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকাদি দর্শন বা তামাকু সেবনাদি করিতে উঠিয়া গেল। কিন্তু শ্রোতৃবর্গমধ্যগত ষড়বিংশতিবর্ষবয়স্ক কৃশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ব্রাহ্মণযুবক অন্য সকলের সহিত বাহিরে না যাইয়া একান্তে অবস্থিত স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তাহার স্থির উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এবং আলাপে বিদ্যা, বিনয়, ধৈর্য্য, আন্তরিকতা এবং যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাইয়া স্বামীজি আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে মঠে অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। সদ্‌গুরু সচ্ছিষ্যলাভে উল্লসিত হইলেন।

পরে জানিলাম, ঐ যুবকের নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাটি ভবানীপুর, বিবাহিত এবং তত্রস্থ অনেক সদনুষ্ঠান তাঁহার এবং তৎসহযোগী আমাদের বন্ধু বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। শুনিলাম, ভবানীপুর চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইঁহাদের যত্নে নিযুক্ত হইয়া সমাগত জনগণকে ব্যাকরণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেছেন। ঐ চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য নিয়মিত কালে চাঁদা সংগ্রহ হয় এবং "ঊষা" (Dawn) নামক একখানি মাসিক পত্রও ইঁহার দ্বারা কয়েক বৎসর হইতে সম্পাদিত হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, এবং ঐ পত্র হইতে যাহা উপস্বত্ব হইতেছে তাহাও ঐ চতুষ্পাঠীর শিক্ষকের বেতন প্রদান, শাস্ত্রগ্রন্থাদি ক্রয় এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহে নিয়োজিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞানবিস্তার ব্যতীত তৎপ্রদেশস্থ ছাত্রজীবনের সংস্কারও ঐ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য এবং তদর্থ নিয়মিত কালে সভা আহূত হইয়া তদুপযোগী বক্তৃতা, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, কথোপকথন এবং সদালোচনাদিও নিয়মিত রূপে হইয়া আসিতেছে। আরও জানিলাম, অজয়হরির মানসিক তেজ, উদ্যম এবং অধ্যবসায় অদ্ভুত হইলেও শরীর বহুবর্ষব্যাপী অজীর্ণ-

রোগাক্রান্ত এবং তজ্জন্য কঠিন পরিশ্রমে অপটু। সময় সময় হৃদ্‌গতির আতিশয্য নিবন্ধন কষ্টও পাইয়া থাকেন, এ কথাও যেন শুনিয়াছিলাম।

* * * * * *

গুরু বলিলেন, "অজয়হরি, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবে তো? সাপের মুখে যাইতে বলিব, বাঘের মুখে যাইতে বলিব, অগ্ন্যুদ্‌গারী তোপের মুখে যাইতে বলিব—নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও বিচার মাত্র না করিয়া অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হইবে। সুখাভিলাষী হইলে হইবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধ মাত্র রাখিতে পাইবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে! 'অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা'—জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। 'গুরুদেবো' 'আত্মদেবো' হইয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' জীবন যাপন করিতে হইবে। পারিবে তো? জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হও—নতুবা এখনও নিবৃত্ত হইয়া সংসারে পরিবারবর্গ লইয়া যেরূপ সদ্ভাবে এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছ, সেই ভাবে আমৃত্যু থাক।" অজয় তাহাতে প্রস্তুত—কিছু মাত্র বিচলিত নহে!

অমাবস্যার নিশা অবসানপ্রায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত জগৎ অধিকার করিয়া ক্ষণেকের জন্য মানবের অস্থির মনকে স্বীয় প্রভাবে স্থির করিয়া ভগবৎপ্রেমের পবিত্র নীরে আপ্লুত করতঃ বর্ত্তমান। গুরু বিরজা হোম সমাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে দণ্ডায়মান হইলেন। শঙ্করাদি ভারতের যাবতীয় আচার্য্য এবং ঋষিকুল পবিত্রীকৃত জ্ঞানবৈরাগ্যে সমুজ্জ্বল গৈরিকবসনে শোভিতকায় মুণ্ডিতশির ভস্ম ও তিলকে শোভিতললাট শিষ্যও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। স্বামীজি সন্ন্যাসীকে সস্নেহে উঠাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরদিনের মত সমর্পণ করিলেন। জগতে অজয়হরির মৃত্যু হইল এবং স্বামী স্বরূপানন্দ নবীন জীবন লাভ করিয়া প্রফুল্লমুখে মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। দেখিলেন উষার রক্তিমচ্ছটায় পূর্ব্বগগন উদ্ভাসিত হইয়াছে, স্বামীজি তানপুরা মিলাইয়া অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ করিতেছেন এবং শ্রীমন্দিরে ঠাকুরের মঙ্গল আরতি আরম্ভ হইয়াছে।

অপরাহ্নে "ধীরা মাতা" প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া স্বামীজি বলিলেন, "We have made an acquisition today," অদ্য আমরা একটি রত্ন লাভ করিয়াছি। মঠাধ্যক্ষ গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন,

"স্বরূপের শরীর খারাপ। ডাল চচ্চড়ি সহিবে না। দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দিও।"

* * * * *

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল মাস। স্বামীজির অনুগত ভক্ত কাপ্তেন সেভিয়ার সহধর্ম্মিণীর সহিত আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতায় দারুণ গ্রীষ্ম—স্বামীজির শরীরও ভাল নয়। আলমোড়ায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল। স্বামীজি সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, "তুরীয়ানন্দ ও সদানন্দ আমার সঙ্গে চলুক। স্বরূপের শরীর খারাপ—সেও চলুক। ওখানে কিছুদিন থাকিয়া নিবেদিতা জয়া ও ধীরামাতার সহিত আমি কাশ্মীরে যাইব।" লালা বদ্রি সাহের "টম্‌সন হাউস" নামক বাঙ্গালায় সকলে ১৬ই মে তারিখে উপস্থিত হইলেন।

১০ই জুন তারিখে—অথবা কয়েক দিন পরে মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিল, "প্রবুদ্ধ ভারত" মাসিক পত্রের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক রাজম্ আয়ার সহসা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কাগজ চলা দায়, কারণ উপযুক্ত লোকাভাব। স্বামীজি উক্ত কাগজের ভার গ্রহণ করিবেন কি?

স্বামীজি কাপ্তেনকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেভিয়ার! তুমি ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত কার্য্য করিবে বলিয়াছিলে। বাঙ্গালার জলবায়ু এবং গ্রীষ্ম তোমার সহ্য হওয়া অসম্ভব। অতএব তুমি আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিয়া 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্র চালাইবার ভার গ্রহণ কর না কেন? কাগজ খানির তিন সহস্রেরও উপর গ্রাহক সংখ্যা হইয়াছে। এবং আমারই পরামর্শে উহা প্রথম মুদ্রিত হইয়া ক্রমে বেদান্ত-জ্ঞান-বিস্তারের বিশেষ যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার ইচ্ছা নয় যে উহা বন্ধ হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও আমি তোমাকে দিতেছি। স্বরূপানন্দ স্বামীর ও বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং তোমার সাহায্যে সে অনায়াসে উহা চালাইতে পারিবে"। সেভিয়ার সম্মত হইলেন এবং সেই দিন হইতে "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্র সম্পাদনের ভার স্বরূপানন্দ গ্রহণ করিলেন। স্বামীজিও উক্ত পত্রের বন্দোবস্ত করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

কাপ্তেন সেভিয়ার কাগজের ভার লইয়া অবধি একটী উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আলমোড়া সহর হইতে ৪৮ মাইল দূরে "মায়াপট অথবা মায়াবতী" নামক স্থান ক্রয় করিয়া তথায় নিজ ব্যয়ে স্বামীজির

থাকিবার নিমিত্ত মঠবাটী এবং "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রের ছাপাখানা এবং তৎসংক্রান্ত লোকসকলের থাকিবার বন্দোবস্ত নির্মাণ করিয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। কাপ্তেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বরূপকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এবং স্বরূপও সেই পিতৃস্নেহের কখন অবমাননা করেন নাই। হিমাচলের মঠের ভার স্বরূপের উপরেই অর্পিত হইল।

* * * * *

স্বরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, চতুষ্পার্শ্বস্থ জনগণ ভীষণ দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানে নিপতিত। হিমাচলের অতুল উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিয়াও উহাদের অন্নাভাবে শীর্ণ কায়, পরিধানে ছিন্ন চীর! উপনিষদের অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান তো দূরের কথা, সামান্য নীতি বা গৃহধর্ম্মের কথা তাহাদিগকে শুনায় অথবা কৃষি ও অর্থাগমের উপায় কহিয়া যাহাতে তাহাদের কথঞ্চিৎ দুঃখ দূর হয় সে ব্যবস্থা করে, রোগে প্রপীড়িত হইলে সহানুভূতি করিয়া ঔষধাদি প্রদান করে, অথবা তাহাদের অসহায় অপোগণ্ড বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়—এরূপ লোকেরও একপ্রকার সম্পূর্ণাভাব! সর্ব্বভূতজননী দয়া তাঁহার হৃদয়ে উপবেশন করিলেন। স্বরূপ পত্র সম্পাদন ব্যতীত বদ্ধপরিকর হইয়া লোকহিতকর নানা অনুষ্ঠানে অহর্নিশি ব্যাপৃত হইলেন। বিগত আট বৎসরে তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্যমে যে সকল সদনুষ্ঠানের প্রারম্ভ হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা সে সকলের সংক্ষিপ্ত আবৃত্তমাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিব।

১ম। মঠস্থ স্বদেশী ও বিদেশী (পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে সমাগত) ব্রহ্মচারী এবং তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে বিদ্যা এবং ধর্ম্মশিক্ষা দান এবং অদ্বৈত-জ্ঞান সাধনায় নিযুক্ত রাখা।

২য়। পাশ্চাত্য প্রদেশাগত ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়ে কৃষির উন্নতি ও তৎপ্রচারের চেষ্টা।

৩য়। হিমাচলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা।

৪র্থ। পাহাড়ী বালকদিগের ভিতর বিদ্যাবিস্তারের জন্য মায়াবতীতে এবং লোর নামক গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ।

৫ম। মায়াবতীতে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন।

৬ষ্ঠ। নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া পর্ব্বতবাসীদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা দান।

৭ম। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানায় কিষণগড় নামক স্থানে গমন করিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের সহায়তা করণ এবং অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য আশ্রম স্থাপন।

৮ম। ঐ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে নৈনিতাল গমন করিয়া ১৯শে জুন পর্য্যন্ত থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহকরণ এবং সংগৃহীত অর্থে কনখলে সাধু ও যাত্রিগণের জন্য দাতব্য ঔষধালয় এবং সেবাশ্রম সংস্থাপন।

৯ম। ১৯০২ ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এলাহাবাদে অবস্থান করিয়া বক্তৃতাদি দানে সাধারণের মধ্যে যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তার। ঐ সকল বক্তৃতা কালে সর্ব্বসাধারণের মন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যকলাপে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহারা স্বামীজিকে ঐ স্থানে মঠস্থাপন করিয়া নিয়মিতরূপে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন এবং তৎসংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন।

১০ম। কাঙ্গরা প্রদেশস্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসিগণকে সহায়তা দান করিতে চাঁদা সংগ্রহকরণ এবং স্বামী নির্ভয়ানন্দ এবং এক ব্রহ্মচারীকে আশ্রম হইতে তথায় বিপন্নগণের সেবা ও অর্থ সাহায্যের জন্য প্রেরণ।

১১শ। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ সংস্করণ বাহির করিবার উদ্যোগ এবং কিয়দংশ মুদ্রিত করণ।

কর্ম্মযোগাবলম্বনে নরনারীর সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিলেও স্বামী স্বরূপ ধ্যানাদি সাধনেও উদাসীন ছিলেন না। মায়াবতী আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী জঙ্গলমধ্যগত তাঁহার সাধনকুটীরই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসিগণের মুখাৎ অবগত আছি—চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে হিমাচলের নিবিড় বনরাজি যখন স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত এবং চিরনীহারমুকুটিত নন্দাদেবী এবং ত্রিশূলশৃঙ্গ যখন উমা-মহেশের কাঞ্চনজড়িত কর্পূরধবলাঙ্গের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া মানবমনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের অভিনব আনয়ন করিয়া চিত্তবৃত্তি স্তম্ভিত করিয়া তাহাকে সমাধি-সুখের নিকটবর্ত্তী করিত, তখন স্বরূপানন্দ স্বামীর হৃদয় অপূর্ব্বভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত এবং সেই নিবিড় রজনীতে যষ্টি মাত্র অবলম্বন করিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে গুরুভ্রাতাগণ সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইতেন এবং কখন বা কয়েক ঘণ্টা বিচরণ করিয়া প্রত্যাগত হইতেন, আবার কখন বা

সাধনকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। ব্রহ্মপ্রাণ স্বামীর হৃদয়ে তখন যে গভীর ভাবোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইত, তাহার নিরূপণ কে করিতে সক্ষম?

ভারতের কৃতবিদ্য ছাত্রকুল যাহাতে ধর্ম্মের জন্য লোকহিতের জন্য এবং পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষককুলে বিদ্যা বিস্তারের জন্য তাঁহার ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদেরই মঙ্গলে আত্মোৎসর্গ করেন, সে বিষয়ে স্বামীজির বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ লক্ষিত হইত। নৈনিতাল, আলমোড়া, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যখনই তিনি গমন করিতেন, তখনই ছাত্রদিগের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। আবার তাহাদিগকে যথার্থ স্বার্থত্যাগে সর্ব্বত্র পশ্চাৎপদ দেখিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতেন। কতবার কতলোকেই না তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে—"ছাত্রগণেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল আশা নিহিত রহিয়াছে। হায়! এখনও তাহারা যশ মান, রাজনীতি প্রভৃতির বৃথা হুজুগে কিছু কালের জন্য উন্মত্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং চিরকালের নিমিত্ত সংসারে মগ্ন হইতেছে। কবে তাহারা দেশের জন্য যথার্থ ত্যাগধর্ম্ম শিখিবে?" হিমাচলের কার্য্যভার গ্রহণের পর স্বামী স্বরূপ দুইবার মাত্র কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তদ্রস্থ বন্ধুবর্গ তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ভাবিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনেক কার্য্য এখনও তাঁহার দ্বারা সাধিত হইবে। প্রথম বার স্বামী বিবেকানন্দজীর সেবা ও তাঁহার পবিত্র সহবাসে কিছুকাল থাকিবেন বলিয়া সমাগত হন। স্বামী স্বরূপের গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটী ঘটনা আমাদের এখানে মনে আসিতেছে। কিষণগড়ে অবস্থানকালে তিনি তথাকার মাননীয় দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেওয়ান তাঁহার সদালাপে অতীব পরিতৃপ্ত হইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত স্বামীজির পরিচয় প্রদান কালে বলিলেন যে, এই মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। স্বরূপানন্দ তাঁহার ভ্রম তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া বলিলেন যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুগত সেবক ও নগণ্য শিষ্য মাত্র। দেওয়ান তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিতে যতদূর না মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এতাদৃশ বিনয় ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হন। তদবধি দেওয়ান তাঁহাকে তাহার বন্ধুমধ্যে পরিগণিত করিতেন। ১৯০১ সালের শীতকালে দিল্লিদরবারে উপস্থিত হইয়া দেওয়ান সাহেব স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন সমীপে লইয়া যান;

এবং ঐ সমারোহে সমাগত রাজপুতানা এবং গুজরাটের যাবতীয় রাজন্যবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। স্বামীজির সদালাপে বরদারাজ শ্রীরামকৃষ্ণমিশন এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুমহারাজকে নিজ রাজ্যে কিছুকালের জন্য আগমন ও অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিমন্ত্রণ প্রদান করেন। সেভিয়ার সহধর্ম্মিণী মায়াবতী আশ্রমভূমি প্রভৃতি দেবোত্তর করিয়া দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তাঁহার সহিত স্বামীজি দ্বিতীয়বার কলিকাতায় উপস্থিত হন। সেবারে আগমন করিয়া কিন্তু তিনি অন্ত্রের দুর্ব্বলতা জ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্তজ মহাশয়ের চিকিৎসায় তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে তিনি কার্য্যশেষে ঔষধ লইয়া পুনরায় মায়াবতী প্রত্যাগমন করিলেন।

* * * * *

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে স্বামী স্বরূপ মায়াবতী হইতে আলমোড়া এবং তথা হইতে নৈনিতাল গমনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। প্রয়োজন— ঐ উভয় স্থানের একটীতে "প্রবুদ্ধভারত" প্রেস উঠাইয়া লইয়া গেলে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত যথার্থ ত্যাগধর্ম্মপ্রচারের মায়াবতী অপেক্ষা সুবিধা হইতে পারে কি না তাহাই নির্দ্ধারণ করা। এ সময়ে তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল ; নৈনিতালে বায়ু পরিবর্ত্তন ও কিছুকাল বিশ্রামের দ্বারা আপন স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনই ঐ স্থানে গমনের উদ্দেশ্য ছিল। নৈনিতালে ঐ উদ্দেশ্যে একটী স্থান দর্শন করিয়া যখন তিনি লালা অমরসাহের ভবনে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভিজিতে হইয়াছিল এবং বাসায় আসিয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও সেই ঠাণ্ডা লাগিয়া পরদিন হইতেই তাঁহার সর্দ্দি ও জ্বর হইল। কর্ম্মবীর স্বামী স্বরূপ তখনও লোকহিতকর কার্য্যে বিরত নহেন। স্বীয় গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সমাগত জনগণকে সকল বিষয়ে সদুপদেশ দানে নিযুক্ত রহিলেন। লোকসমাগমের বিরাম নাই এবং স্বামীজিরও তাঁহাদের সহিত সদালাপে ক্লান্তি নাই। শুনিতে পাই, যখনই তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইতেন, তখনই তাঁহার যথার্থ প্রেম এবং সদালাপে আকৃষ্ট হইয়া ঐরূপ লোকসমাগম হইত। দুই চারিদিনেই জ্বর বৃদ্ধি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া দেখা দিল। তখনও বিরাম নাই, যতক্ষণ পারিতেন উপবিষ্ট

হইয়া সদালাপ করিতেন এবং চিঠিপত্রের উত্তরাদি অপরের দ্বারা লিখাইতেন। কানপুরের সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বাবু মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী তখন নৈনিতালে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজির সদালাপে ও নানা গুণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং রোগের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। স্থানীয় আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনও তাঁহার সহিত স্বামীজিকে প্রত্যহ দেখিয়া যাইতেন। ২৬শে জুন রোগ অতিমাত্র বৃদ্ধি হওয়ায় বাক্যালাপ অসম্ভব হইয়া উঠিল—ডাক্তারেরাও ভয় পাইলেন। লালা অমরনাথ ও তত্রস্থ বন্ধুগণ দিবারাত্র প্রেমের সহিত তাঁহাদের স্বামীজির সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। ২৭শে জুন বেলা দুই প্রহরের সময় স্বামী স্বরূপানন্দ নিদ্রিতের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। সে নিদ্রাই মহানিদ্রায় অবসান হইল। ফুল ফুটিয়াছিল—ভ্রমরবৎ মধুলোভে নিত্য সমাগত হইতেছিল—কিন্তু সহসা নীহারপাতে শুষ্ক হইয়া গেল। অয়ি দেবি জগন্মাতঃ! তুমি কি সে অপূর্ব্ব প্রসূনের মহিমা নরলোকে বুঝিবে না বলিয়া নিজ কেশে ধারণ করিয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিলে?

* * * * *

পুষ্প, ভস্মলেপ এবং নবীনগৈরিকে শোভিত হইয়া স্বরূপানন্দের শবদেহ নৈনিতালের নিকটবর্ত্তী ভাওয়ালি নামক স্থানে অগ্নিসাৎ হইল।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

হে অগ্নি! আমাদিগকে ধনের (অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগের) নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও; হে দেব! তুমি সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

হরি ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

স্বামী সারদানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

বিগত ২রা ফাল্গুন বেলুড়মঠে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা উপলক্ষে সর্ব্বদেবাদেবীর ও সর্ব্বদেবদেবীর সমষ্টিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা হোমাদি হইয়াছিল।

পরের রবিবার অর্থাৎ ৫ই ফাল্গুন তদুপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় বিশহাজার লোকের সমাগম হয়। বাবু শীতলপ্রসাদ ঘোষের যত্নে একটী কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মিত হইয়া তদুপরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ চিত্র নানাবিধ ফলফুল পত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া স্থাপিত করা হয়। চতুর্দ্দিকে শ্রীভগবানের অমৃতময় কতকগুলি উপদেশ সুবৃহৎ অক্ষরে সন্নিবেশিত হইয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে তাঁহার মনোহর যোগময় বপুঃ ও অপূর্ব্ব উপদেশাবলীর দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। তথায় বিশেষ পূজা আরাত্রিক স্তবপাঠাদির পর দলে দলে কীর্ত্তনসম্প্রদায়গণ আসিয়া ভগবানের নাম গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে মঠবাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে আন্দুলের অবৈতনিক কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় তাঁহাদের মধুর কালীকীর্ত্তনে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে সারাদিন ভাবে বিভোর করিয়া রাখিলেন। এদিকে মঠের ঠাকুরবাটীতেই বা ঠাকুরদর্শন করিতে লোকের জনতা কত! কোনদিকে বা বক্তৃতা লাঠিখেলা প্রভৃতি চলিতেছে! কোথাও বা ভিন্ন ভিন্ন দূরস্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ অনেকদিন পরে পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দ করিতেছেন, কোথাও বা নূতন অপরিচিত ভক্তগণের নূতন পরিচয় হইতেছে। এদিকে প্রাতঃকাল হইতেই খিচুড়ি, লুচি, মেঠাই প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ চলিতেছে। ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেই আগ্রহসহকারে সেই প্রসাদগ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। কতলোক হয়ত লঘুহৃদয়ে আমোদ করিতে আসিয়াছিল—তাহাদের হৃদয়ে হয়ত আজ নূতন ধর্ম্মবীজ পতিত হইল। মিসেস সেভিয়ার, সিষ্টার নিবেদিতা, ক্রিষ্টীনা প্রভৃতি স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্যাগণকে ইতস্ততঃ উৎসবভূমিতে বিচরণ করিতে দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেছিল আবার মঠনিবাসী মার্কিন ব্রহ্মচারীকে ঠাকুরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইতে দেখিয়া কেহ বা শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত শক্তিতে বিশ্বাসী হইতেছিল। আজ সমগ্র জগতের বড়ই আনন্দের দিন। আজ নবযুগের—সার্ব্বভৌমিকতা, উদারতা ও অপূর্ব্ব ত্যাগ ও ঈশ্বরোপলব্ধির নববিকাশের—স্মরণ দিন।

কাশী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ লিখিতেছেন,—শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব একরকম তাঁর কৃপায় হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন পূজা ভোগ ও হোম এবং প্রায় ২০জন ভক্ত অর্থাৎ অদ্বৈতও সেবাশ্রমের ভক্তগণ

এবং অন্যান্য কতিপয় বন্ধু প্রসাদ পান। জনৈক ভক্ত সঙ্গীতও করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ম্যাক্সমুলার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী হইতে কিছু কিছু পাঠ হয়। সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজের অনেকগুলি ছাত্র অধ্যাপক এবং কাশীর অনেক বিদ্বান্ হিন্দুস্থানী, গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রী সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দেড়শত ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের পর জনৈক ভক্ত কয়েকটী সুন্দর ভজনগান করিলে হারমোনিয়মের সহিত হরিনামসংকীর্ত্তন হয়। ঠাকুরের হিন্দী ভাষায় লিখিত জীবনী ও উপদেশ এবং স্বামীজির চিকাগো বক্তৃতার হিন্দী অনুবাদ বিতরিত হইয়া গেলে অবশেষে কিছু কিছু প্রসাদ বিতরিত হয়। সমাগত দরিদ্র ব্যক্তিগণকে একটি করিয়া প্রায় দুই টাকার পয়সা দেওয়া হয়।

মান্দ্রাজ মঠে ১লা ফাল্গুনে প্রকাশিত কার্য্যতালিকা অনুসারে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রায় ছয় হাজার দরিদ্রকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। তদ্ব্যতীত সহরের একশত গরুকে কেন ও ভূষি দ্বারা সেবা করা হয়। বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল এবং অনেক লোক আগ্রহসহকারে ঐ বক্তৃতা শুনিয়াছিল। সভাপতি মহাশয় অতিশয় সহানুভূতির সহিত রামকৃষ্ণ মিশন ও তাহার উচ্চলক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

বাঙ্গালোরে ও তের শত দরিদ্রভোজন এবং ১লা ফাল্গুনে প্রকাশিত কার্য্যতালিকানুসারে বক্তৃতাদি হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন, মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া সকল হিন্দুকে এক লক্ষ্যে মিলিত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সুতরাং তদীয় শিষ্যগণ সমগ্র জগতে তাঁহার মত প্রচার করিতেছেন। সকলেরই উচিত—তাঁহাদের এই কার্য্যে সহায়তা করা।

সারগাছি (মুরশিদাবাদ) অনাথাশ্রমেও ঐ উপলক্ষে কাঙ্গালীভোজনাদি হইয়াছিল।

মায়াবতী (হিমালয়) অদ্বৈত আশ্রমের সন্ন্যাসিগণ তিথিপূজার দিবস উপবাস ও ধ্যানাদি করেন এবং আশ্রমের চাকর বাকরকে উত্তমরূপে খাওয়ান হয়।

বেদান্তপ্রচার কার্য্য।

স্বামী বোধানন্দ যিনি এতদিন নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতিতে কার্য্য করিতেছিলেন, সম্প্রতি পিট্সবর্গ নামক স্থানে স্বামী অভেদানন্দ যে উক্ত সমিতির শাখাসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কার্য্য করিতে গিয়াছেন। স্বামী পরমানন্দ স্বামী অভেদানন্দের কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি সাধারণের সমক্ষে 'আত্মসংযম' বিষয়ে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক শ্রোতার সমাগম হয়—সকলেই বক্তৃতা শুনিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী প্রকাশানন্দ পৌষমাসে কয়েক সপ্তাহের জন্য শান্তি আশ্রমে সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্তসমিতির কয়েক জন সভ্যকে লইয়া ধ্যানধারণায় নিযুক্ত ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ জানুয়ারি মাসে ব্রুকলিন শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষালয়ে—জরথুষ্ট্র ও তাঁহার উপদেশ কৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশ, লাওট্জে ও তাঁহার উপদেশ, বুদ্ধদেব ও তাঁহার উপদেশ এই কয়েকটী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

শ্রীহট্ট জেলায় কানাইরঘাট গ্রামে যে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে বিগত ১৭ই ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নিম্নলিখিত মত বিলি হইয়াছে—

গ্রাম সংখ্যা।	পরিবার সংখ্যা।	লোকসংখ্যা।	চাউলের পরিমাণ
৩৩	৩১০	১১২৪	৪৪ মণ।
৩৪	৩২৭	১১৮৭	৪৮ মণ।

'আমাদের দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে নিযুক্ত স্বামী সত্যকাম ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিতেছেন,—

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে যে, এই ফাল্গুন ও চৈত্র দুইটী মাস এখানকার লোকের পক্ষে ভয়ানক দুঃসময়। কাযেই আমাদের লিষ্টভুক্ত গ্রামসমূহের মধ্যেও লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে ও বাড়িবে। এমন অনেক পরিবার আসিতেছে ও আসিবে, যাহাদের অবস্থা কিছুদিন পূর্ব্বে ভাল ছিল, এখন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে অথবা এখনও কোন প্রকারে জীবনধারণ করিতেছে, দুই চারিদিন পরে ভয়ানক হইবে। স্থানীয় দুর্ভিক্ষমোচন সম্প্রদায়ের

কার্য্য দুই সপ্তাহ ধরিয়া বন্ধ আছে—কারণ ঠিক জানিতে পারি নাই, বোধ হয় অর্থাভাব। ২৪শে ফেব্রুয়ারির বিলির দিন উক্ত সম্প্রদায়ের সাহায্য-তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে আমাদের নিকট আসিয়া সাহায্যের জন্য হাঙ্গাম করিয়াছিল—আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। এ অবস্থাতে আমাদেরও জীবন সংকটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর টাকা পাঠাইতে পারিবেন কিনা জানাইবেন। যদি টাকা পাঠাইতে না পারেন, তবে বাধ্য হইয়া শীঘ্রই আমাদিগকে কার্য্য বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে।'

গতবারের যে টাকার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইয়াছিল, তাহার পর নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে স্বীকৃত	৪৬১৮/১০
শ্রীগোপেশচন্দ্র ত্রিবেদী ২ দফায়	১০৲
মেথুমল বাও	২৫৲
শ্রীকেদারনাথ, সবরেজিষ্ট্রার	৫৲
মিঃ রূপাশঙ্কর তাঁহার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী কাঙ্গিণীর স্মরণার্থ	৫৲
জনৈক বন্ধু, মালদহ	২৲
আর, এল, চট্টোপাধ্যায়, মুন্সেফ, বাঁকা (ভাগলপুর)	২৲
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক জলপাইগুড়ি	২৲
শ্রীশশিকুমার মজুমদার, পুলিশ আফিস, লাহোর (৩য় দফা)	৩৩॥০
এ, সি, রায়, এসিষ্ট্যাণ্ট ওপিয়ম এজেণ্ট, গোঁসাইগঞ্জ (ফয়জাবাদ)	৩৷৵০
শ্রীশিবনারায়ণ হকসার, এঞ্জিনিয়র, সোনপত (দিল্লী)	২০৲
মোট	৪৭২৬৶১০

যাঁহারা এই দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া।) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ (কলিকাতা) ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

উদ্বোধনের প্রচলিত নিয়মানুসারে আগামী ১৫ই চৈত্রের উদ্বোধন বন্ধ রহিল। ১লা বৈশাখের সংখ্যা ৬ষ্ঠ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে।

মাধবীদর্শন।

বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পারে পারজোয়ার পরগণা। তদন্তর্গত নরণ্ডীনামধেয় একটী নগণ্য গ্রাম। নরণ্ডীর মাধবী ঠাকুরাণীর প্রভাব ঢাকা অঞ্চলে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, ত্রিলোকপাবন, মহানুভব শ্রীযুত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের প্রমুখাৎ আমি মাধবী ঠাকুরাণীর নাম ধাম প্রথম শুনি। মনে হয়, সেই মহাপুরুষের নিকটই জানিয়াছিলাম, মাধবী ঠাকুরাণী তাঁহার মাতামহী; তিনি অতিশয় প্রাচীনা, মহাতপস্বিনী এবং যোগসিদ্ধা জাতিস্মর। তদবধিই মাধবী দর্শনের সাধ মনে মনে জাগিয়াছিল। শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ মানসে সম্প্রতি আফিসের কার্য্য হইতে দীর্ঘকালের অবকাশ নিয়াছি। তাই, এতদিনে সেই সাধ পুরাইবার সুযোগ মিলিল। বিগত পূর্ণিমার রাত্রিতে, চন্দ্রগ্রহণের সময়, আমরা ৩ জন ধর্ম্মবন্ধু পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করিলাম, আগামী কল্য প্রত্যুষে দেবীদর্শনে যাত্রা করিব। পূর্ব্বেই অনুসন্ধানে জানিয়াছি তিনি এখনও জীবিতা আছেন।

১৬ই মাঘ, বুধবার, প্রাতে ৫টায় উঠিয়া, যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। শ্রীমান্ বাবু অন্নদাচরণ আসিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন; কাল গ্রহণান্তে রন্ধনাদির পর আহারাদি করিতে অধিক রাত্রি হইয়াছিল, যথাসময়ে ঘুম ভাঙ্গে নাই; তাই তাঁহার আসিতে ৭॥টা হইল। আমরা উভয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাসা হইতে রওনা হইলাম। ছোট কাটরাবাসী তৃতীয় বন্ধু উপেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইলাম। উপেন্ বাবু ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন; এখানে আর কালক্ষেপ হয় নাই।

সহরতলি হইতে নরণ্ডীগ্রাম ৪।৫ মাইল অন্তর হইবে। জনপ্রসিদ্ধ রণযন্ত্র ভীমকায় কামান শোভিত ঢাকার চকবাজার পার হইয়া আমরা চাঁদনীঘাটে পৌঁছিলাম। সহরের রাস্তাগুলি ধূলিপূর্ণ; তাই চাঁদনীঘাটের দক্ষিণস্থ, নদীগর্ভোত্থিত উষরভূমি অতিক্রম করিয়া যাওয়াই সঙ্গত বোধ হইল। আমরা

চড়ায় নামিলাম। অন্নদা বাবু বলিলেন, বিংশবর্ষ পূর্ব্বে এইস্থানে নদীস্রোত খরবেগে বহিত; সন্নিকটেই তাঁহাদের আবাস ছিল, তখন তাঁহারা এই ঘাটে নিত্যস্নান করিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, এখন তথায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী চর শোভা পাইতেছে, নদী তাহার দক্ষিণে অপসরণ করিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে বালুচরের মধ্যেই কারবারীদের গুদাম ঘর উঠিয়াছে। নব নব ভাববিলাসী কাল, জলস্থলময় দেশের উপর কতই পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে! একদিন যথায় নদী ছিল, আজ কিনা সে স্থান নগর হইতে চলিয়াছে!

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের গন্তব্য পথ কতকদুর এরূপ চলিয়া অনতিপ্রশস্ত একটী জলপ্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইল। খেয়ার নৌকা সম্মুখে ভাসমান; নৌকাখানির দুমাথায়ই রশি বান্ধা; রজ্জুদ্বয়ের অপরদিক্ উভয়তটসংবিদ্ধ বংশখণ্ডে সংবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা নৌকায় উঠিলাম রশি টানিয়া টানিয়া ওপার যাইতে লাগিলাম, আর "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা", তাঁহার মহিমা গাইলাম। হাল, দাঁড়, দাঁড়ী, মাঝি, কাহারও দরকার হইতেছেনা; যিনি যাইবেন, তিনিই রশি টানিয়া ওপারে যাইতে পারেন।

পারে পৌঁছিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। দক্ষিণে ও বামে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রবলয়; সম্মুখে সুন্দর ভজনালয়। কোনও পুণ্যবান্, মহামনা মুসলমান একটি মস্জিদ্ করিয়া দিয়াছেন, সহধর্ম্মী পথিকগণ যেন স্বচ্ছন্দে, যথাসময়ে, উপাসনা করিবার সুযোগ পান। ধন্য তাঁহার অর্থের সার্থকতা, ধন্য তাঁহার উদ্দেশ্যের সাধুতা। ভগবানের সাধনঘর শ্রীমন্দির, আমরাও সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলাম। পথ হাঁটিতে হাঁটিতে দেখিতে পাইলাম, প্রান্তবর্ত্তী ক্ষেত্রগুলি কঞ্চিবেষ্টনে সুরক্ষিত। গবাদি তৃণভোজী পশুগণ পাছে শস্য নষ্ট করে, তাই ক্ষেত্রস্বামী পরিশ্রম করিয়া বেড়া দিয়াছেন। অনবধান পথযাত্রীর পদদলনের আশঙ্কাও বা এবংবিধ ক্ষেত্ররক্ষণের কারণান্তর হইবে। উপস্থিত কুসুমফুল, বেগুন প্রভৃতির খুব চাষ হইতেছে, দেখিলাম। কুসুমফুল এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই; তাহা যখন ফুটিবে, উহার মনোহর হরিৎরঞ্জিত প্রকোষ্ঠগুলি তখন কেমন শোভন দৃষ্টিসুখ দান করিতে থাকিবে। বিদেশীয় বণিক্গণ এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গসুলভ এই কুসুমফুল ক্ল্যাট বোঝাই করিয়া স্বদেশে রপ্তানি করিত। রং প্রস্তুতের জন্য কুসুমফুলের প্রয়োজন

হইত ; বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমে এখন রাসায়নিক বিধানে রঙ প্রস্তুত হইতেছে ; বঙ্গদেশের কুসুমফুলের ব্যবসা বিলুপ্তপ্রায়।

উপেন্ বাবু বলিলেন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে কেবল পাট গাছ দেখা যাইবে। কৃষাণগণ এখন ধানচাষের বড় অনুরাগী নয় ; কারণ, পাটের মত ইহাতে ফসলেরও সুবিধা পায়না, টাকার আয়ও তেমন দেখা যায়না। টাকা হইলে অন্ন মিলে সত্য কিন্তু নগদ টাকা হাতে আসিলে যে আবার অন্য দিকে টানিয়া লয়, কৃষকভাইরা তাহা বুঝেন না। তাঁহাদের অনেকেই অন্নের সংস্থান না রাখিয়া, অর্থলভ্য ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হন অবশেষে বিলাসিতায় মজিয়া কালে নিরন্ন হন, পরিশেষে অন্নদায়ে ঋণ করিতে থাকেন। সহর বন্দরের সন্নিকটবাসী কৃষিজীবিগণই সাধারণতঃ এতাদৃশ দুদ্দশাগ্রস্ত হয়। ভগবান্ সুদিন করুন, ভারতের কৃষককুল শিক্ষিত হউক ; পরিণাম চিন্তা করিয়া সুখে জীবন যাপন করিবার শক্তিলাভ করুক ; আর দূরদেশে কোথায় কি উন্নতি হইতেছে, তাহা জানিয়া, বুঝিয়া, স্বদেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউক।

আমরা স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে প্রভূত আনন্দ পাইতে লাগিলাম। দিগন্তপ্রসারী শ্যামকায় ক্ষেত্রবিস্তার ; স্নিগ্ধতাময় প্রাতঃসূর্য্যের সঞ্জীবন কিরণজাল ; মাকরীসরিৎস্নাত সুমন্দপবনহিল্লোলের সুখস্পর্শ ও শীতল অভিঘাত ; তাহাতে, নগরাবাসের সংকীর্ণতায় পরিপুষ্ট, কেরাণীবৃত্তিজীবী আমার নীরস প্রাণ, অনেকদিন অবধি সৈকতপ্রদেশের এমন জীবনপ্রদ, প্রাকৃতিকরসমাধুরী সম্ভোগ করিতে পায় নাই ;—প্রাণের উচ্ছ্বাস, আনন্দ আর ধরেনা। প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কত কি কথা বলিতে বলিতে চলিলাম ; ক্রমশঃ আমরা গঙ্গাতীরে পঁহুছিলাম।

পবিত্রতোয়া গঙ্গা, যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র, ইহারাই উত্তরভারতের পূর্ব্ববাহিনী প্রধান প্রধান নদী। পদ্মা, মেঘনা ও ধলেশ্বরী প্রভৃতি তাহাদের শাখানদী, পূর্ব্ববঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। ঢাকা নগরীর দক্ষিণবাহিনী বুড়ীগঙ্গা নদীটী সম্ভবতঃ পতিতপাবনী ভাগীরথী মা গঙ্গার পুণ্যসলিলসম্পন্না অভিন্ন স্রোতধারা হইবে। নতুবা "গঙ্গা" নাম প্রয়োগের বিশেষ কোন তাৎপর্য্য লক্ষিত হয়না। বড়গঙ্গার পারে যেমন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, এই বুড়ীগঙ্গার পারে তেমন ঢাকার নবাবী আমলের লালবাগ কেল্লা বর্ত্তমান। কেল্লার ঘাটের সোপানশ্রেণী পূর্ব্বে নদীর স্রোতজলে বিধৌত

হইত, তরঙ্গসংঘট্টে নিত্য প্রতিঘাত করিত। বালুকান্তর এক্ষণে সোপান-রাজিকে জঠরসাৎ করিয়া বসিয়াছে। আদিদেব মহাকালের কি "খামখেয়ালী" প্রসূত্ব: ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক যুগে এই কালশক্তির অচিন্ত্য মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা জগজ্জননীর "কালী" নামকরণ হইয়া থাকিবে। উদ্দামশয়ন মহাকালের বিশাল বক্ষে মা কালীর প্রচণ্ড লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াই বুঝি জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্করও বলিয়াছেন ;——

"নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলালসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী * * *।" ইত্যাদি ॥

বিষ্ণুপাদাম্বুসম্ভবা মা গঙ্গার এখন বর্ষাগমসুলভ তরঙ্গবিভব নাই। জল বেশ স্বচ্ছ, শান্ত ও নির্ম্মল: বর্ষার আবিলতা ও বেগবতী চঞ্চলগতি কোথায় লুকাইয়াছে। দেবীর এখন সৌম্যদর্শন। মায়ের ঈদৃশী প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াই বোধ হয় কবিগুরু বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"গাঙ্গং বারি মনোহারি * * *" ইত্যাদি। আদিগঙ্গা মর্ত্ত্যে আসিতে বলিশ্রেষ্ঠ বারণরাজ ঐরাবতকে স্রোতবেগে ভাসাইয়া আনিয়াছিলেন। এই বুড়ীগঙ্গার প্রভাবও বর্ষাকালে কম নয়। অল্পদিনেই খাগাইল প্রভৃতি কয়েকটি বস্তিপূর্ণ গ্রাম প্রায়শঃ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। প্রতি বর্ষায় এদিকের দক্ষিণপার ভাঙ্গে, উত্তরপার ভরে। তীরবাসী গৃহস্থকুল ঘর দোর নিয়ে কোথায় পালাবে, ভেবে ভেবে আকুল হইতেছে।

পারের উপায় খেয়া নৌকা আছে। পাটমাঝি জনপ্রতি এক পয়সা নেয়। তথাপি সুবিধার জন্য উপেন্ বাবু উচ্চৈঃস্বরে "স্বর্ণ" "স্বর্ণ" বলে ডাকিতে লাগিলেন। ১০।১২ বৎসরের একটী বালক নৌকাসহ এপারে এসে আমাদিগকে নিয়ে চলিল। গঙ্গাদেবীর পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ মনে পড়িল। ভাগীরথী, জাহ্নবী ইত্যাদি নাম স্মরণে ভাবিলাম, আর কোন্ দেবী ভক্তের নামে এরূপ আত্মপরিচয় স্বীকার করিয়াছেন? দয়াময়ী গঙ্গা সদ্যপাতকসংহন্ত্রী; মৃত্যুকালে নির্ভীক হিন্দু অন্তর্জ্জলির জন্য গঙ্গাযাত্রা করেন; মায়ের ক্রোড়স্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া দেহত্যাগ করেন মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাজল বিন্দু গলাধঃ করিয়া মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। দৈব এবং মাঙ্গলিক, সকল কার্য্যের জন্যই ঘরে ঘরে গঙ্গাজল রাখা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গাজলকে "ব্রহ্মদ্রব বারি" বলিয়াছেন। আমরা সৌভাগ্যক্রমে এমন আদর্শ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি, যিনি "মা গঙ্গা, মা গঙ্গা" বলে সমাধিস্থ হইয়াছেন।

হিন্দুর সংস্কারে গঙ্গাজল শুদ্ধ ও অতিশয় পবিত্র। শাস্ত্র বলেন, "আপো নারায়ণঃ"। আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষায়ও গঙ্গাজলের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং "গঙ্গানারায়ণ হরি" বলিয়া আমরাও এক গণ্ডূষ জল শিরে দিলাম। নৌকা এসে ঘাটে লাগিল; আমরা তীরে উঠিলাম।

আমাদের উপেন্দ্রবাবু পরমহংসদেবের ভক্ত, সুন্দর গান করিতে পারেন। তিনি ভিখারীর বেশে হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া বহুদিন এতদঞ্চলে কার্য্য করেছেন। এখানে তিনি 'ভিখারী সাধু' নামে পরিচিত। তাঁহার সঙ্গগুণে জেলে, ছুতার, নমঃশূদ্র, গোয়ালা কামার প্রভৃতি এখানকার সাধারণ লোক এবং অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্। তাঁহারা রামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন, তত্ত্বমঞ্জরী প্রভৃতি রাখেন এবং ঠাকুরের উপদেশ অবলম্বনে ভগবৎতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন। শুনিলাম, অনেকে ঠাকুরের মূর্ত্তি ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিতেছেন। কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বহুপূর্ব্বে নাকি ভাগিনেয় হৃদয় মুখুয্যেকে বলেছিলেন, "আরে হৃদু, মা বল্লেন, ঘরে ঘরে আমার আসন হবে"। অদ্য সেই দৈববাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। কোথায় কলিকাতার নিকট দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, আর কোথায় খাগাইল ছুতার বাড়ী; উভয়ত্রই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পট পূজা হইতেছে।

ভক্ত স্বর্ণ মিস্ত্রির ছেলেই আমাদিগকে পার করে এনেছে। তাহাদের বাড়ীর পিছনে এখন নদী আসিয়াছে। অন্নদা বাবু একটু অগ্রসর হইয়া সেই বাড়ী উঠিলেন। হঠাৎ কি দেখিয়া তিনি আনন্দভরে আমাকে ডাকিলেন, অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া আমিও সাতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইলাম। পরিচ্ছন্ন, স্বতন্ত্র একখানা ছোটঘর; একদিকে কয়খানা আসন রয়েছে, অন্যদিকে একখানা তক্তাপোষ পাতা; বোধ হইল, অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্য এসকল বন্দোবস্ত। মধ্যস্থলে বেড়ায় সংলগ্ন উচ্চ আসনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বড় লিথো ছবি স্থাপিত; উভয় পার্শ্বে ভক্তবর ও সর্ব্বস্ব রামচন্দ্রের এবং ত্যাগি-চূড়ামণি স্বামী বিবেকানন্দের ছবিও আছে। ঠাকুরের সাম্নে একটী জলপানের চুমকি বাটী, অনুমান হইল কিছু খাবার দিয়া ঠাকুরের নিত্য সেবা করা হয়। স্বর্ণ মিস্ত্রি আসিল, তাহার আতিথ্যে বড় আপ্যায়িত হইলাম; কোন প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া গেলাম। অল্প সময় বসিয়া আমরা মাধব বাড়ী অভিমুখে চলিলাম। সেই বাড়ী এখান হইতে প্রায় এক মাইল হইবে।

পথ উপেন্দ্র বাবুর সুপরিচিত, ক্রমশঃ আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। পল্লীর মধ্যস্থলে একখানা ছোট বাড়ী। তিনটি ঘর আছে, একটী ঘর খালি, কোণেও বাসযোগ্য একটি ঘর আছে। পশ্চিমের দিকের ঘরটি কিছু বড় আকারের, কাঠের বেড়া ও চৌকাট কপাট আছে। আমরা দেখে বুঝিতে পারিলাম, এই ঘরের দ্বারদেশে আসীনা দেবীই মাধবী ঠাকুরাণী হইবেন। বারেন্দার একধারে অপর কয়জন লোক বসেছিলেন। আমরা উঠে একে একে দেবীকে প্রণাম করিলাম। দেবীর অনুজ্ঞামতে, বারেন্দার অন্যধারে আমাদের আসন পেতে দেওয়া হইল। আমরা দেবীর নিকটেই বসিলাম এবং ঘরের ভিতরের বিগ্রহাদি দেখিতে পাইলাম। পাশাপাশি দুইটি ঘট স্থাপিত, রঙ্গিন রুমাল দিয়ে ঢাকা; নিকটে ছোট একটি খাটের উপর নারায়ণ চক্র শালগ্রাম এবং বালগোপাল মূর্ত্তি আছেন। দেবী স্বয়ং ইঁহাদের নিত্যপূজা করেন। আমাদের তামাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেবী আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, "১০২ বৎসর বয়স হয়েছে, এতকাল কোন ব্যারামে পড়ি নাই; এখন দৃষ্টি গিয়াছে, চক্ষে কিছু দেখিনা; হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কায করিতে হয়।" তখন বেলা ১০টা হয়েছিল; দেবী আমাদের খাবারের জন্য নারিকেল ভাঙ্গিলেন, ঘরের ভিতরের হাঁড়ি মালসা হতে হাতড়াইয়া মিছরি, বাতাসা, তিলে, চিনি এবং খই সংগ্রহ করিলেন এবং ঘরেই ঘড়া ভরা কাঁচা দুগ্ধ ছিল, তাহা স্বয়ং জ্বাল দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। আমরা বলিলাম, আপনি কেন ব্যস্ত হইতেছেন? দুগ্ধ দিন, অন্যে জ্বাল দিবে। আমাদের এইকথায় এক ঘটি দুগ্ধ বাহিরে দিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে পূর্ব্বে শত শত লোককে কত রেন্ধে বেড়ে খাইয়েছি, এখন চক্ষু নাই, শক্তি সামর্থ্যও গিয়াছে; নিজেই অচল হয়েছি, লোকজন আসিলে কিছু করিতে পারিনা।" অতিথি সেবার জন্য তাঁহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইলাম।

আমাদের সাধারণ পরিচয়ের পর, অন্নদা বাবু দেবীকে জিজ্ঞাসিলেন;—আপনার কি কি সন্তান হয়েছে? উত্তর—এক মেয়ে—আদ্যাভগবতী; এক ছেলে—মাধব। অপর লোকে বলিল, তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। আমরা জানিতাম, মহাত্মা দুর্গাচরণ নাগ দেবীর দৌহিত্র; সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করা গেল। প্রশ্ন—নারায়ণগঞ্জ, দেবভোগ নিবাসী, দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় আপনার কি হতেন; তাঁহার সম্বন্ধে আপনি যাহা

যাহা জানেন, দয়া করে বলুন; আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম; তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি।

দেবী বলিতে লাগিলেন;—"দুর্গাচরণ আমার দেবর ৺নবকিশোর দত্তের কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর পুত্র। ত্রিপুরাকে আমি শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়াছি। সে বড় সাদাসিদা, লাজুক মেয়ে ছিল; এখনকার মেয়েদের মত ছিলনা। তিলার্দ্দির নাগবংশীয় দীনদয়ালের সহিত তার বিবাহ দেই, উহাদের জ্ঞাতি এখনও বেতকা, পঞ্চসার গ্রামে আছে। দীনদয়াল নাগ বড় ভাল মানুষ ছিল, লোককে দিয়া খাওয়াইয়া বড় সুখী হইত, লোককে খুব আদর যত্ন করিত। আমি তাহাদের দেবভোগে তিন চারিবার গিয়াছি। ২৭।২৮ বৎসর বয়সে ত্রিপুরার মৃত্যু হয়; দুর্গাচরণ তখন ৪।৫ বৎসরের বালক ছিল। দুর্গাচরণের একটী ভগিনীও জন্মিয়াছিল, নাম সারদা। মালঙ্গা নিবাসী অভয় ঘোষের সহিত তাহার বিবাহ হয়। সে দিন ঐ মেয়ে আমাকে দেখিয়া গিয়াছে; বড় দুঃখে কষ্টে আছে। জামাইটা মানুষ নয়, জায়গা জমি ছিল, সব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

"বৎসর বৎসরই দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাচরণ ও তাহার বাপ পূজা দেখিতে এখানে আসিত। ৭।৮ দিন থাকিয়া পরে ফিরিয়া বাড়ী যাইত। দীনদয়াল নাগ আর বিবাহ করে নাই; মা মরিলে পিতামহী এবং পিসী দুর্গাচরণকে পালিয়াছিল। ছোটকাল হতেই সে বড় শান্ত ও নম্র ছিল। শিশুকাল হতেই তার খাওয়া পরা ত্যাগ। যখন দুধের শিশু, তখনও ২।৪ ঝিনুক দুধ খাইয়া মুখ বুঝিয়া থাকিত; বেশী খাইতে চাইত না, ত্রিপুরা তজ্জন্য মুখ চাপিয়া কত তাড়া করিত আর বলিত, "এটা না খাইয়া খাইয়া মরিবে"। বড় হলেও স্নানাদি শুচি আচারে দুর্গাচরণের বড় হেলা ছিল। এজন্য তার বাপ আমার নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিত, "ছেলেটা কেমন রাজ্যি-ছাড়া হলো; অন্যান্যের মত চলে ফিরেনা, ভাল কাপড় চোপড় পরিতে চায়না, কি একপ্রকার ভাবে সর্ব্বদা বিভোর থাকে, খাওয়া দাওয়ারও খেয়াল-শূন্য"। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতাম আপনি দুঃখ করিবেন না; দুর্গাচরণ সামান্য মানুষের মত নয়; ওর ভিতর বস্তু আছে; ওর লেখা পড়ারও বেশি দরকার হবেনা; সে যাহা পাইবে, এই বিদ্যা তাহার কাছে কিছু নয়। দুর্গাচরণকে খাইতে দিলে, সে তাহা অন্যকে না দিয়া খাইতে চাহিতনা। ভক্তির ভাব তাহার এত ছিল যে, আমার পা ধরিয়া নিজের

বুকে মাথায় দিত এবং ধূলায় গড়াগড়ি দিত; কিছুতেই ছাড়িত না। কয়েক বৎসর বাড়ীতেই লেখা পড়া করিয়া, পরে পিতার সঙ্গে সে কলিকাতায় যায়। সেখানে ভাল ডাক্তার হইয়াছিল; যে রোগীকে ধরিত, তাহাকেই আরাম করিত; তাহার হাতে কোন রোগী মারা যায় নাই। প্রথম বিবাহের স্ত্রী অল্পদিনেই মরিয়াছিল, পরে বাপ দুর্গাচরণের আবার বিবাহ দেয়। সে বৌটীর ভাব ভালই দেখলাম, সেবার পূজার পর আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল। এদিকে কেউ রক্ষক নাই, ভালয় ভালয় দিন কাটাইতে পারে, তবেই ভাল। বধূর বাপের বাড়ী ঐ গ্রামেই; যারা কাছে আছে, তাহারাই দেখিবে; তোমরাও তাহার তত্ত্ব করিও; তোমরাই ত তাহার সন্তান।

"বৃদ্ধ বাপ যখন কলিকাতার কার্য্য ছাড়িয়া বাড়ী আসে, দুর্গাচরণও তখন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী আসিয়া বসিল; ইতিপূর্ব্বেই চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছিল। পূজার সময় বাপকে নিয়া সেইবার এখানে আসিয়াছিল। আমি তাহার ভাবগতিক দেখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই যে সব ছেড়ে ছুড়ে এমন হলি, দুর্গাচরণ, তুই কি কিছু পেয়েছিস?" সে বিনীতভাবে উত্তর করিল, "দিদিমা, আপনার কাছে কি আর গোপন করিব, কলিকাতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাকে কৃপা করিয়াছেন।"—বার বার পূজায় তাহার পিতা এখানে আসে যায়, একবার মনঃকষ্টে বলিল, "দুর্গাচরণ বিষয়চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কি হইল; ঠাকুরাণী, আপনার নিকট বলিতে কি, আমার বড় ইচ্ছা হয়, মা ভগবতীর পূজা করি; এজন্মে আর তা হওয়ার উপায় দেখিনা।" আমি বলিলাম, মার পূজা করিতে পারিবে, নিরাশ হইওনা। পর বৎসর আশ্বিন মাসে চিঠি পাইলাম দুর্গাচরণ ও তাহার স্ত্রী কি যোগাড় করিয়া দুর্গাপূজা আরম্ভ করিয়াছে; তাহার বাপ লিখিয়াছিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল।" তদবধি তাহাদের নিজ বাটিতে দুর্গাপূজা হয়; এখানে আর আসে নাই। কেবল বাড়ী হইতে রাগ করিয়া একবার দুর্গাচরণের বাপ এখানে আসিয়াছিল, দুর্গাচরণ পরে আসিয়া বাপকে নিয়ে গেল; এই শেষ সাক্ষাৎ। দুর্গাচরণ নিজ কার্য্য শেষ করে চলে গেছে, তার মত মানুষ কোথায়? তার কি মৃত্যু ছিল? সে ইচ্ছাপূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করিয়াছে।"

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে নাগমহাশয় সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

আমরা পরমভাগ্যবান, পুরুষোত্তম নাগমহাশয়ের শেষ জীবনের প্রায় ১০।১২ বৎসর তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়াই জীবসেবা, দেবপূজা, বর্ণাশ্রমাচার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবানে নির্ভর, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া ও প্রেম প্রভৃতি লোকপ্রচলিত এবং শাস্ত্রকথিত মহদ্বাক্য সকলের ভাবার্থ আমাদের কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদার্থময় এবং দিন রাত ব্রহ্মপ্রতিমার সংস্পর্শে না আসিলে কাহারও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, ভাগবতে প্রীতি, এবং ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি জাগাইতে পারেনা। আমাদের ধারণা, গৃহস্থাশ্রমে ভাগবতের পূর্ণ আদর্শ দেখাইবার মানসে, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহী হইবার উপদেশ করিয়াছেন; জনৈক ভক্তশিরোমণির মুখে শুনিয়াছি, 'ধরাধামে রামকৃষ্ণের ন্যায় ভগবৎ শক্তি অবতীর্ণ না হইলে, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষের মর্ত্ত্যে আগমন সম্ভবপর নহে; মায়ার প্রভাব তাঁহার নিকট পরাভূত হয়েছে; তাঁহার দীনহীন ভাব দেখেছি বটে, কিন্তু সে দীনতায় দুর্ব্বলতা দেখি নাই, ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার জীবনের যে সমস্ত ঘটনা আমরা জানি আর ৫০ বৎসর পর সে সকল ব্যাপার কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। তাঁহার জীবনটা যিনি বুঝতে পেরেছেন, তার কি দিব্য চৈতন্যলাভ হয়েছে। ধর্ম্মবীর, পরিব্রাজকরাজ, মহাত্মা, স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গে নিয়া দেবভোগে শ্রীযুক্ত নাগমহাশয়ের আবাস ভবন দর্শনে যান; এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বে নাগমহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমায় বলিয়াছিলেন "আমি দুনিয়াটা ঘুরে এসেছি, কত ভাল লোক দেখেছি কিন্তু নাগমহাশয়ের মত দুইটী মহাপুরুষ আমার চোখে পড়ে নাই। যারা তাঁর সেবা করেছে, তাদের ব্রহ্মলাভ হয়েছে; তাদের আর কোনও সাধন ভজনের প্রয়োজন হবেনা। কি অদ্ভুত বিশ্বাস, কি ব্যাকুলতা! যেই শুনিলেন ঠাকুর বলেছেন, ডাক্তারদের ভগবান্ লাভ হয়না, অমনি বাসায় গিয়ে ঔষধের বাক্স গঙ্গায় ফেলে দিলেন; একমাত্র জীবনোপায় ডাক্তারী ব্যবসা ছেড়ে ছুড়ে বসলেন; কি ত্যাগ কি নির্ভর! আরে বল কি, এভাব কি মানুষে সম্ভবে? আমি ২৫ বৎসর তাঁকে দেখেছি, তাঁর জীবনে একটু জোয়ার ভাঁটা দেখলুম না; স্থির, ধীর, এক অবিকারী ভাব।" স্বামীজির ঢাকা আগমনের কথা পূর্ব্বেও একবার উঠিয়াছিল, তখন নাগ

মহাশয় লীলা সম্বরণ করেন নাই; তৎসময় তাঁহার শ্রীমুখে "জয় বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ মহারাজকি জয়" ইত্যাকার আনন্দসূচকধ্বনি অনেকবার শুনিয়াছি। তিনি আরো বলিয়াছেন, "যেখানে যান সন্ন্যাসী তথায় চারি ক্রোশ হয় কাশী।" তৎসময়ে তিনি গিরিশবাবুর বিষয়ও বিশেষ প্রীতি ও সম্ভ্রম সহকারে আলোচনা করিতেন। স্বামীজির সঙ্গে গিরিশবাবুও নাকি ঢাকায় আসিবেন, তখন এরূপ প্রস্তাব হয়েছিল। পরম ভাগবত, প্রিয়দর্শন, মহাত্মা দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার একবার আমাদের সমক্ষে তাঁহার স্বভাবসুলভ উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণলীলায়, আমি দেখিতে পাই, মহাত্মা নাগমহাশয় এবং স্বামী বিবেকানন্দ একবার যেন চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিলেন। একের আলো স্নিগ্ধ, অপরের তীব্র; উভয়ই উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "জীবনী ও উপদেশ" প্রণেতা, ধীরমতি, সাধুবর, সুরেশ চন্দ্র দত্ত অনেকদিন পূর্ব্বে আমার নিকট প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "পূজনীয় নাগ মহাশয় পরমহংসদেবের উপদেশগুলি স্বীয় জীবনে যেমন ফলাইয়াছেন, আমার বিশ্বাস, আর কোন ভক্তই তেমন পারেন নাই; তাঁহার মন্ত্রদীক্ষাও অমানুষী ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।" এই সুরেশ বাবু নাগমহাশয়ের যুবা বয়সের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সুরেশ বাবু এবং তিনি একত্র মিলিয়া পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর যান। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি পরমহংসদেবের যেসকল উক্তি পুস্তিকাকারে প্রথম প্রচারিত হয়, সে সকল তৎকৃত প্রশ্নের উত্তর মাত্র; সুরেশ বাবু নোট রাখিয়াছিলেন, পরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন।

সদানন্দময়, সেই নিরঞ্জনরূপ দেখিয়া কাহার প্রাণ না নাচিয়া স্থির থাকিবে? কে সেই পুরুষপুঙ্গবের প্রীতিপূর্ণ সদাচার ও ভক্তিমাখা শিষ্টালাপে মুগ্ধ না হইয়াছিলেন? দেশ বিদেশের কত সাধক, ত্যাগী, সাধু ও সজ্জন তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন, তাঁহার দেবভাবে সকলেই অভিভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন, তিনি "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের জ্বলন্ত প্রকাশ, জীবন্ত ব্যাখ্যান। শাক্তগণ বলিয়াছেন, তিনি তন্ত্রোক্ত কৌলাচারসিদ্ধ, পাশনির্ম্মুক্ত শিব; শিবভাবে গৃহস্থাশ্রম পবিত্র করিতেছেন। উদ্বোধন ও তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় সেই মহাত্মার মহিমা ব্যঞ্জক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তত্ত্বান্বেষী পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখিবেন। সেই বিজ্ঞানমূর্ত্তির সান্নিধ্যে আসিলে তত্ত্বদৃষ্টি আপনাআপনিই

ফুটিত। গীতাকথিত, নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো "নির্যোগক্ষেম আত্মবান্"। "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥" "নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ" "যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥" ইত্যাদি মহাবাক্যে দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নরাবতার অর্জ্জুনকে মানবজীবনের আদর্শলক্ষণগুলি বলিয়াছিলেন। এই ঘোর কলিযুগে, কামকাঞ্চনের রঙ্গভূমি সংসার ক্ষেত্রে, শ্রীগুরুপ্রসাদাৎ আমরা তাদৃশ তত্ত্বময় জীবনের স্বাভাবিক অভিনয় দর্শন করিয়াছি। নারায়ণোপম নাগমহাশয়ের কীর্ত্তিকলাপ আমি নরাধম কি বলিব? তাঁহার মহিমার কি অনুমাত্রও বুঝিতে পারিয়াছি? তিনি উজ্জ্বভাবে লোকলীলা করিয়াছেন, দীনতায় ঈশ্বরের খেলা খেলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, ও জগদ্ধাত্রী পূজা এবং বিশেষ বিশেষ দিনে মা কালীর পূজা হইতে আমরা দেখিয়াছি; অতিথি অভ্যাগত সেবার কোন প্রকার ত্রুটি হইতে পারে নাই; অথচ সমস্ত বাড়ীতে একখানা বাসোপযোগী ঘর ছিলনা, সেখানে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা থাকিতেন। খড়ের ঘর, বাঁশের খুটী, ঘরগুলি যেন কোনমতে রক্ষা করিয়া রাখা হইত; বর্ষায় সকল ঘরেই জল পড়িত। উত্তরের দিকে মণ্ডপ ঘর, সেখানেই বসিবার স্থান ছিল, কেবল দেবপূজাদির কালে দক্ষিণের ছোট ঘরটীতে বাদ্যকর এবং অন্যান্য আগন্তুকদের স্থান দেওয়া হইত। পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র একখানা রন্ধনশালা, তথায় তিনি প্রায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের মা এক্ষণেও ঐসকল নিত্য নৈমিত্তিক দায়কার্য্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। যেমন দেব তেমন দেবী না হলে কি একালের সংসারে এ হেন মহাপুরুষ তিষ্ঠিতে পারিতেন? নাগমহাশয় প্রণীত "বালকদিগের প্রতি উপদেশ" নাম্নী একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক আছে। তদ্ব্যতীত তাঁহার স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত অনেকগুলি সাধনসঙ্গীত আছে, তাহা আমাদের মাতৃদেবী সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

তিনি বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি ইতরপ্রাণীকেও আহারার্থ ভুক্তাবশিষ্ট দিতে পারেন নাই; পিপীলিকাটীর প্রাণের ব্যথা তাঁহার প্রাণে লাগিয়াছে; তিনি কোন গাছের পাতাটী ছিঁড়িতে পারিতেন না; ঘাস মাড়াইয়া পথ চলিতে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহাকে এক কল্কে তামাক সাজিয়া

কেহ দিতে পারেন নাই; কাহারও সেবার উদ্যম দেখিলে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন, বাড়ীর কুলি মজুরকেও তিনি স্বয়ং সময়োচিত সেবা করিয়াছেন, এমন কি, নিজ হাতে তামাক সেজে তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছেন। এই জগৎ তাঁহার দৃষ্টিতে বাসুদেবময় ছিল। ঘরের ভিতর, আঙ্গিনার উপর, বৃক্ষশাখা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারও কাটিবার সাধ্য ছিলনা; বলিতেন, "তমোগুণে ইহাদের জন্ম, ইহাদেরও সুখ দুঃখ আছে, প্রকাশ করিতে পারে না।" দুইটী পাখী তাঁহার হস্ত হইতে শস্য নিয়া খাইত, কোন ভয় করে নাই। বাজার হতে গুঁড়া মৎস্য কিনিয়া আনিতেন, তৎসঙ্গে দুইএকটি জীবন্ত মাছ দেখিলে তৎক্ষণাৎ পুকুরে তাহা ছাড়িয়া দিতেন। বাড়ীর চতুর্দ্দিকের জলাশয়ে তিনি কাহাকেও মৎস্য মারিতে দেন নাই; নিকটস্থ উপবনে কাহারও পাখী শিকার করার সাধ্য হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" আমার ন্যায় দুরাচারকেও তিনি নিজগুণে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এতদপেক্ষা তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যের অধিক পরিচয় আমি আর কি দিতে পারি? স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যুবা বৃদ্ধ, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, হিন্দু মুসলমান, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ সম্মান করিয়াছেন। প্রতিবেশী লোকদের বিশ্বাস ছিল, তিনি বাড়ী থাকিতে গ্রামের কোন অমঙ্গল হইতে পারেনা। আশৈশব তাঁহার জীবনের স্বভাবসুলভ কোনও দুর্ব্বলতার মলিন বার্ত্তা কেহ বলিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনকাহিনী পবিত্রতার খনি; সে দেবদুর্লভ চরিত্র ভক্তিময়। সেই পরশমণির কৃপায় কত লোহা সোনা হয়ে গিয়েছে। যিনি আজন্মকাল প্রতিবেশীদিগেরও সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাজন ছিলেন; যাঁহাকে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে দেবভাবে দর্শন করিয়াছে; যাঁহার সাধুতার বিরুদ্ধবাদী একটি লোকও পাই নাই, সেই মহাত্মা কোন্ জাতীয় মহাপুরুষ, সুবিজ্ঞ পাঠক বিচার করিয়া বুঝিবেন; তাঁহার হৃদয় কোন্ উপাদানে গঠিত এবং তাহা কত বড় একবার তাহা তুলনা করিয়া দেখিবেন।

ঠাকুর ঘরেই স্নান করিয়া, দেবী নির্ব্বন্ধসহকারে জলপানের জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা বলিলাম, আপনার মাধবের পূজা হলে আমরা প্রসাদ পাইব। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যাহা দিয়েছি, সবই মাধবের প্রসাদ; হাটবাজার করে আমার কোন

সামগ্রী আনিতে হয়না, ও যখন যা আনায়, তাই দশজনকে দিই, আর তা দিয়েই ওর পূজা হয়। এই মাধব 'ভাতে মরা শুক্‌না ঠাকুর' যতদিন শক্তি ছিল, মাসে তিনদিন নিজেই রেন্ধে বেড়ে ওর ভোগ দিতাম; প্রায় শতেক লোক হইত, সকলকে প্রসাদ বেঁটে দিয়ে নিজে রাত্রে খাইতাম। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ তা আর পারিনা; ফল, মূল, শাক, পাতা, যখন যেমন আসে, মাধবকে দেই, নিজেও তাই খাইয়া থাকি। মশা, মাছি, সাপ, বাঘ, মানুষ কি দেবতা, সকলই ত সেই একজন, তাঁহাকে সেরূপে ধরিতে পারিলাম কই? আকাশের এক চন্দ্র জগত আলো করে, তাঁর পদনখে কত চন্দ্র বিরাজ করে; যে দেখেছে, সেই মজেছে! কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, সকলই ত সেই আদ্যাভগবতী; আমি দুর্গোৎসব করি বলে, লোকে বলে, বৈষ্ণব হয়ে শক্তিপূজা করে; সে ছাড়া কি কিছু আছে, না হতে পারে? সে যাকে যেমন রাখে, সে তেমনই থাকে; রোগ, ভোগ, ভাল মন্দ, সব তাঁর ইচ্ছায়। আমি চোখে দেখিনা, বেশ আছি; বাহিরের বস্তুর ছায়া ভিতরে আসিতে পায়না; এই এক রকম থাকি। তোমরা এসে এখন খাও, তোমাদের খাওয়ার পর ঘর খালি হলে পূজার আয়োজন করিব।" অগত্যা আমরা খাবার খেয়ে আসিলাম।

আহারান্তে পুনরায় দেবীকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনার বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে সব খুলে বলুন। দেবী বলিতে লাগিলেন, "বেশ, ১২ বছর বয়সে আমি এই বাড়ী আসি। বিবাহের পর মাত্র ৭ দিন স্বামীর ঘরে রয়েছি; পরে কোনরকমে সংসারের কায কর্ম্ম করেছিলাম। নীল পূজার ঢাকের বাদ্য শুনে আমার কেমন কেমন ভাব আসিয়াছিল। আদেশ হল, ১৪ বৎসর শুধু ফলজল খেয়ে দিন রাত কাটিয়েছি। তদবধি মাধব বাড়ী বলে এ বাড়ীর নাম হলো। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্র এক একবার ঘুরে এসে, তারপর হতে এখানেই আছি। দোল, দুর্গোৎসব, চৈত্রপূজা প্রভৃতি বারমাসে তের পার্ব্বণ করিতে হয়। কি ভাবে কি হইতেছে, মাধবই জানে। পরে কি জানি আর কি হইবে।

প্রশ্ন।—আপনার পিত্রালয় কোথায় ছিল? সে সকল আদি বিবরণ আমরা জানিতে চাই।

উত্তর।—খাবরায়ের পার্শ্ববর্ত্তী সাবাজপুরগ্রামে আমার বাপের বাড়ী ছিল। সে গ্রামে ১০০।১৫০ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিত। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত

বিয়ে হয় নাই, লোকে পিতাঠাকুরকে চেপে ধরিল; তিনি কোথা হতে এক সন্ন্যাসীকে আনিলেন। গোঁসাই, আমাকে দেখে শুনে বলিলেন, "এ মেয়ের বিবাহ দিয়ে কি হবে? এ সংসার করিতে পারিবেনা। বিবাহ দিতে চাও, দেও; এ পাগলের মত থাকিবে, কিন্তু কাযের পাগল হবে।" এই বলে, আমার হাতে, গলায়, কোমরে কতগুলি কবচ বাঁধিয়া দিলেন। আমার পিতা জলের উপর মড়ার মত ভাসিয়া থাকিতে পারিতেন। একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়া নদীর ঘাটে স্নান করিতে গেলেন, জলে নামিলেন, কোথায় গেলেন, আমি আর খুঁজিয়া পাইনা। একখানা নৌকা নদী দিয়ে বেয়ে যাইতেছিল, মাঝিরা বলিল, ও দিকে কে মড়ার মত ভেসে যায়। আমি অস্থির হইলাম, বাবা জল হতে এসে আমায় নিয়া বাড়ী ফিরিলেন। আমার জন্ম দিন হতে বাড়ীতে মা ভগবতীর পূজা প্রথম আরম্ভ হয়। আমার নাম আনন্দময়ী রাখিয়াছিল। ছোট বেলা হতেই আমার ভাবগতি সৃষ্টিছাড়ার মত ছিল।

প্রশ্ন।—কিছু উপদেশ দিন, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হতে পারে।

উত্তর।—দুধের কড়া আর ছাইয়ের মালসা রয়েছে। এখন ছেলে যদি দুধ ফেলে ছাই খায়, তাহলে দুধের স্বাদও পাবে না, তার শরীরও খারাপ হবে। দুধ না খেলে দুধের গুণ কি দিয়ে তাকে দেখাবেন? লোকে ৮৪ লক্ষ নরক বলে জানে; সে সব আর কি? জননীর জঠর। গর্ভস্থ থাকিতে জীব উর্দ্ধপদে, হেঁটমুণ্ড প্রার্থনা করে, "প্রভু ত্রাণ কর, আর যেন এ যন্ত্রণা ভোগ না হয়। এবার তোমার সাধন ভজনে জীবন নষ্ট করিব।" যেই মাটিতে মাথা পড়ে, অমনি ফিরিয়া বলে "ও না, ও না" অর্থাৎ যাহা বলিয়াছি তাহা করিবনা। সংসারের চমকে পড়িয়া জীব যেন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সেই জগদ্গুরুকে ভুলিয়া থাকিতে চায়। ঠাকুরের জন্য একগুণ করিলে শতগুণ ফল পায়। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায়। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কে কি করে? সংসারে গুরুর শ্রীপাদপদ্ম শক্ত করে ধরে থাকতে হয়। ও পদে দৃঢ়মন থাকলে কোন বিপদ্ ভয় নাই, সেখান হতে সব পাওয়া যায়। তোমরা যাকে ধরেছ, তাতেই লেগে থাক; তবেই সব হয়ে যাবে। কীর্ত্তনে একটু আনন্দ হয়, কিন্তু তারপর আরো আছে। স্ত্রীলোকের পতির পূজায় পরমগতি হয়, অন্য সাধন ভজন, ব্রত তপস্যা অনাবশ্যক। পুরুষেরও ভগবান্‌কে তেমনি জানিতে হয়। তিনিই ত জগৎপতি, তাঁহার সম্বন্ধে

স্ত্রীভাবই শ্রেষ্ঠ সাধন। মেয়ে না হয়ে মুক্তি নাই। গোপীদিগের ন্যায় ভজনে স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই অধিকার আছে। দেহে রিপু ছয়টা, ওরা বশে না আনিলে কিছুই করিবার উপায় নাই।"

ইতিমধ্যে ঠাকুরঘর পরিষ্কার হইল দেবী হাতড়াইয়া দীপ, ধুনচি আনিলেন, অঙ্গুলির সাহায্যে তৈল বোতল হতে বাটিতেও প্রদীপে ঢালিয়া লইলেন। সেদিন কে কমলালেবু কীবাই পেয়ারা দিয়েছিল, ছোট একখানা বঁটী লইয়া সেই ফলগুলি ছাড়াইলেন। ধুনচিতে ধু া ও দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইল। নৈবেদ্যাদি ঠাকুরের কাছে সাজাইয়া লইয়া শঙ্খ কাঁসর ঘরের বাহিরে রাখিয়া কপাট দিলেন। ঘরে যখন ঘণ্টাধ্বনি হইল, বাহিরে কাঁসর শঙ্খ বাজিতে লাগিল। পূজা আরম্ভ হইল।

আঙ্গিনায় এক দল অশিক্ষিত চণ্ডালবংশীয় ভক্ত সংকীর্ত্তন করিতে বসে ছিল। দেবী পূজায় বসিবার আগে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা এখন যাবে? প্রসাদ নেও। নতুবা কীর্ত্তন কর; পূজা হউক প্রসাদ নিয়া যাইবে তাহারা এক্ষণে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। আমাদের উপেন্দ্র বাবু তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া ৩।৪টি গান করিলেন। গানের ভাব, দিনের পর দিন চলিয়া যায় জীব, ভবপারের সম্বল হরিনাম ভুলিও না, ইত্যাদি। একটী গানের শেষপদ স্মরণ হয়—"হলে প্রেম ভিখারী, প্রেমের হরি প্রেম করেন বিতরণ।" অন্য ভক্ত একটী রূপক গান করিলেন, "জীব, মীন; ভোগ, জাল; কাল, ধীবর। কেবল ভক্তিবলে জীব ভোগের বেড়াজাল ছিঁড়ে মুক্ত হতে পারে।" গানের পর গায়ক সমাজে আলোচনা হইল,—যমকে সকলে ভয় করে সত্য, কিন্তু হরিনামের জোরে যমের সঙ্গেও লড়াই করে জয়ী হওয়া যায়; তবে তেমনি করে তাঁর নাম নিতে হয়। মাধবের জীবন্ত প্রভাবে স্থানীয় সাধারণ লোকদের চিত্ত কেমন সরস, ভক্তি-বিশ্বাসপূর্ণ!

পূজা শেষ হইলে কপাট খোলা হল। দেবী ঘরে বসিয়াই সকলকে প্রসাদ দিলেন; গায়ক দল বাড়ী চলিয়া গেল। আমরা আবার দেবীকে প্রশ্ন করিলাম, আপনি যে ঠাকুর পূজা করেন, মন্ত্রাদি জানিলেন কি করে? তিনি বলিলেন, পূজায় মন্ত্র উহারা যেমন লওয়াইয়াছে, তেমনই করি, কাহারও নিকট শিখিতে হয় নাই। অদ্বৈতবংশীয় জনৈক গোস্বামী ঠাকুর আমার দীক্ষাগুরু। পাড়ায় একটী ছেলে ঢাকা গিয়াছিল, সেখানে খেয়া-

ঘাটে কোন্ গোঁসাই নাকি তাহার হাতে এই শালগ্রামটিকে দিয়ে বলেছিল, তোমাদের মাধবী ঠাকুরাণীকে এই নারায়ণচক্রটি দিও। বাড়ী আসিয়া সে আমাকে চক্রটি দিলে, আমি পুরোহিত ঠাকুরদিগকে দেখাইলাম, তাঁহারা বলিলেন—চক্রটির সুলক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু পূজার জন্য কেহ নিতে চাহিলেন না। পরে তাঁর পূজা সে যেমন জানাইয়াছে, তেমনই করিতেছি। একটি ব্রাহ্মণ ঐ বালগোপাল মূর্ত্তি সঙ্গে সঙ্গে রেখে সেবা পূজা করিত; তিনি দৈবাৎ এখানে এসে কি ভাবিয়া মূর্ত্তিটি আমার নিকট রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তদবধি ওঁরও সেবা যেমন পারি করিতেছি।

আমাদের অন্নদাবাবু পূর্ব্বপরিচিত লালমোহনবাবুর অনুরোধে নিকটেই তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া পাক করিয়াছেন। লালমোহন বাবু আমাকে খাওয়ার জন্য নিতে আসিলেন। ব্রাহ্মণ সঙ্গে ছিল, দেবী সে বিষয় পূর্ব্বে বিশেষ খেয়াল করেন নাই, এখন শুনিয়া বলিলেন, ঠাকুর এখানে দুটি পাক করে নিলেই ভাল হইত, এক রকম যোগাড় করে দেওয়া যাইত। নিজে কিছু করিতে পারি না বলে পাকের বন্দোবস্ত করি নাই। আমাকে বলিলেন, লালমোহনদের বাড়ীতে পাক হয়েছে, তুমি খেতে যাও। আমি বলিলাম, ক্ষুধা পায় নাই, এইত খাবার খেলাম, ভাত খেতে ইচ্ছা হয় না, ঢাকার বাসায় গিয়ে খাইব। দেবী পুনরায় বলিলেন, "কলিতে অন্নগতপ্রাণ, তোমরা নিয়মিত আহার করিবে, নতুবা শরীর মানিবে না; ভাত না খাইলে চলিবে কেন? যাও, পাক হয়েছে, খাও গিয়ে।" অবশেষে লালমোহনবাবুর আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল। দেখিলাম, তাঁহাদের বাড়ীতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পটপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি, এমনকালে নিষ্কামমূর্ত্তি, বঙ্গের বৈধব্য-শ্রী, পরমভক্তিমতী, কয়েকটি যোগিনী মায়ের দর্শন পাইলাম। তাঁহাদের স্নেহসিঞ্চিতভাবে অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছি, তাঁহারা অনেকেই পরমহংসদেবের নিত্যসেবা করেন এবং তাঁহার উপদেশাবলী পাঠ করিয়া পবিত্র আলোচনায় দিন যাপন করিতেছেন। ঠাকুরের মহিমা চিন্তা করিয়া স্বতঃই শ্রীরামকৃষ্ণ নামের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল। মাতৃগণের আনীত মিষ্টান্ন দ্বারা ঠাকুরের উৎসবাভিনয় হইল; প্রসাদগ্রহণান্তর আমরা মাতৃগণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মাধববাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেখানে কয়েকজন শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন,

তাঁহাদের সহিত সামান্য কথোপকথন হইল। দেবী বাসার জন্য শ্রীমাধবের প্রসাদ দিলেন, আমরাও মহাযোগিনী মাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করতঃ গোধূলি বেলায় ঢাকা অভিমুখে রওনা হইয়া আসিলাম।

এখন দেবীর দর্শন, তাঁহার কঠোর তপস্যাপূর্ণ জীবন এবং এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়সংকুলনাদি সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মাধবীদেবীর বয়স এক্ষণে শতাধিক দুই বর্ষ; আকৃতি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, শরীর নাতিক্ষীণ, নাতিস্থূল; দেহযষ্টি বয়োভারে বাঁকিয়া পড়িয়াছে। তিনি এখন দাঁড়াইতে অশক্ত; বক্রভাবেই শরীর চালাইয়া অন্যত্র যা'ন। কেশগুচ্ছ অর্দ্ধপক, অগ্রভাগে চিক্কণ জটাভার, প্রায় সার্দ্ধ দ্বিহস্ত প্রমাণ কুণ্ডলাকারে শিরে শোভা পায়; আমরা মুক্তাবস্থাও লক্ষ্য করিয়াছি। চর্ম্ম বলিপলিতমুক্ত, বর্ণ শ্যামগৌর, কান্তি তপঃপ্রভাসম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ যোগকর্ষিত। এই দীর্ঘ জীবনের অতি অল্পদিনই তিনি অন্নাহার করিয়াছেন: সম্ভবতঃ তাঁহার কলেবর কলিসুলভ উপাদানে গঠিত হয় নাই। দেবী আজন্ম ব্রহ্মচারিণী, জরাব্যাধি তাঁহার নিকট পরাস্ত হয়েছে। শুনিলাম, একদা একটী সর্প তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল, তিনি রোজাও ডাকান নাই, ঔষধও খান নাই; কেহ আসিলে "আমি যতক্ষণ না কপাট খুলি, আমায় ডাকিও না," কেবল এইমাত্র বলিয়া অবিচলিতচিত্তে দ্বাররুদ্ধ করিয়া একদিন একরাত্রি ঘরে বসিয়া রহিলেন। পরদিন বাহির হইয়া পূর্ব্ববৎ সুস্থভাবে কায কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সর্পবিষ দেবীর তপঃপ্রভাবে নিষ্ক্রিয় হইল। একজন শ্রদ্ধাবান্ প্রতিবাসী তাঁহার ফটো তুলিয়া রাখিয়াছেন। এমন মহাতপস্বিনী এবং কৃচ্ছ্রব্রতচারিণীর দৃষ্টান্ত একালে বিরল। অনুমান হয়, দেবী যেন পৌরাণিক কালের কৃচ্ছ্রপরায়ণ কোন যোগী হইবেন; বিশেষ সাধন সম্পন্ন করিতে স্ত্রীদেহে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সারা জীবন কেবল কঠোর ব্রত সাধন করিয়াছেন। অনেক বৎসর প্রতিদিন ৩ বার স্নান করিয়া একবার মাত্র দুএকটী ফল ভক্ষণে জীবন ধারণ করিতেন। ঠাকুরদের সেবাপূজার কার্য্য অদ্যাপিও কাহাকে করিতে দেন না; যেমন পারেন স্বয়ং করেন। সম্প্রতি স্নানাদি বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যখন শ্রীক্ষেত্র যান, তখন অন্নাহার করিতেন না, কেবল দুটিমাত্র আম্র ফল মাধবকে দিয়া নিজে প্রসাদ নিতেন। জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ অন্নপ্রসাদ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তখন রেল, জাহাজ

হয় নাই, পদব্রজে পুরী যাইতে হইত। তথাপি পথগমনে তিনি সহযাত্রিগণের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নাই। তাঁহার কাশী গয়া ভ্রমণ অভাবনীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়। পাণ্ডাগণ দুই নৌকা যাত্রীসহ দস্যুর হাতে পড়িলেন। মাধবের প্রভাব তখন জাগ্রত। এক পাণ্ডাঠাকুর কোন রকমে পালিয়ে এসে মাধবের দ্বারে পড়িলেন এবং দেবীকে বলিলেন, যদি নিরাপদে যাত্রীসহ নিষ্কৃতি পাই, তবে আপনাকে বিনাব্যয়ে তীর্থদর্শন করাইয়া আনিব। তাহাদের বাসনা সিদ্ধ হইল; দেবীকে সঙ্গের যাত্রীসহ কাশী, গয়া, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করাইয়া পাণ্ডারা বাড়ী পঁহুছিয়া দিলেন; দেবীর তাহাতে কোন অর্থের আবশ্যক হয় নাই।

দেবীর বিবাহের পরেই তাঁহার অলৌকিক ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সুতরাং স্বামিগৃহে তাঁহার শয়নাদি করিতে হয় নাই। হরিসংকীর্ত্তন কি ঢাকের বাদ্য শুনিলে তিনি উন্মত্তবৎ ছুটিয়া যাইতেন, নৃত্য করিতেন, পরিশেষে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িতেন, স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ভয় কিম্বা লোকনিন্দার গঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। প্রথম প্রথম প্রতীকার চেষ্টার পর, দেবী পাগলিনী বলিয়া উপেক্ষিতা হইয়াছিলেন। দেবী তাঁহার স্বামীর দ্বিতীয় পরিণয়ের স্ত্রী, বিবাহের ২৮ বৎসর পরে বিধবা হইয়াছিলেন। দেবীর স্বামী ও পরোপকারী এবং ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা সুদে ধার দিতেন কি মহাজনী কারবারে লাগাইতেন। তদ্ব্যতীত কয়েকখানা খামার জমি ছিল, তাহার উৎপন্ন দেবী এখনও পাইতেছেন। স্বামীর আমলের টাকা কড়ি কিছুই তাঁহার হাতে পড়ে নাই, দেবর ও তৎপরিবারবর্গের ভরণপোষণ এবং বিবাহাদি কার্য্যেই তাহা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। সংসারের হাঁড়ি কলসী যাহা ছিল, দেবী তাহা পর্য্যন্ত মাধবের আদেশানুসারে ভেঙ্গেচুরে ফেলে দিয়েছিলেন।

বালিকা অবস্থায়ই দেবীর অলৌকিক ভাবসমূহ দেখা গিয়াছিল, তাহাতেই তখনকার উপযুক্ত বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তিনি বাতুলের ন্যায় কি বকিতেন এবং উন্মত্তের ন্যায় চলা ফিরা করিতেন, সুতরাং যথাসময়ে সম্বন্ধ জুটিয়া উঠে নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধিবলে তাঁহার বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল। সময় সময় তিনি অচেতন হইতেন এবং তাঁহার "ভাব" হইত। এগারটী সন্তানের জনক ৺ কৃষ্ণচন্দ্র

দত্ত মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে দেবীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। বিবাহকালে পূর্ব্বপত্নীজাত দুইটি মাত্র পুত্র বর্ত্তমান ছিল, দত্তজ মহাশয় সন্তান দুটিকে নিয়ে একঘরে থাকিতেন, দেবী আপনভাবে ভিন্ন ঘরে রাত্রি যাপন করিতেন। দুবেলাই দেবী স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া পরিবারের সকলকে খাওয়াইতেন, নিজে রাত্রিকালে কখন কখন ভাতে, সিদ্ধ বান্ধিয়া খাইয়াছেন। স্বামী বর্ত্তমানেই একটি পুত্র মারা গিয়াছিল, দ্বিতীয়টীও পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরই কালগ্রাসে পতিত হয়। দেবী ইহাদের কিম্বা পরিবারের কাহারও নিমিত্ত কখন শোকসন্তপ্ত হন নাই, অথবা তাহাদের প্রেতাশৌচ গ্রহণ করেন নাই, পতিবিয়োগে শাঁখা সিন্দুর ত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু, তাহাদের জীবিতাবস্থায় কাহারও সমুচিত যত্নের ত্রুটি করেন নাই, দেবী সপত্নীপুত্রদিগকে গর্ভধারিণী অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়াছেন। নিজ পরিবারভুক্ত পরিজনবর্গ যমদণ্ডে একে একে নির্ম্মূল হইলে, কয়েক বৎসর তিনি জ্ঞাতি পরিবারের দুটী নিরাশ্রয় ছেলেকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন, একটির বিবাহ হইয়াছে। ইহারা কেহ কোন কাজ কর্ম্ম কি লেখা পড়া করে না।

বিধবা হওয়ার অব্যবহিত পরে, দেবী তাঁহার আপাদবিলম্বিত কেশগুচ্ছ ধামরাই অবস্থিত, লোকপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ, শ্রীমাধবকে অর্পণ করিতে যান। সেখান হইতে আসিবার পর হতেই তাঁহার প্রতি নানাবিধ আদেশ হয়। আদেশকালে দেবী মৃতবৎ ভূতলে পতিত থাকিতেন; কোন অপরিচিত সুমিষ্ট স্বরে "ইহা কর, উহা কর" ইত্যাকার দৈববাণী শুনা যাইত, কেহ কোনও লোক দেখিতে পাইত না। অবশেষে সমবেত প্রতিবেশীমণ্ডলি এবং দেবীর সপত্নীপুত্র গোরাচাঁদ, এতদ্বিধ আদেশ অবলম্বনে পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পূজায় বসিতে বার বার অনুরোধ করেন। ঘরে ঘট স্থাপনা করিয়া দেবী পূজায় বসিলেন, কপাট আপনাআপনি রুদ্ধ হইল, দেবী একাসনে সপ্ত অহোরাত্র নিরবচ্ছিন্ন জপ ও ধ্যান করিলেন, ধূপ, দীপ অবিরত জ্বলিতে লাগিল, সপ্তাহান্তে ঘরের কপাট আপনাআপনি খুলিয়া গেল, দেবী ভূতগ্রস্তের ন্যায় কোথায় ছুটিলেন, পুত্র গোরাচাঁদ দৌড়িয়া তাঁহাকে ধরিল, তিনি বিচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ হইল। দেবী উঠিয়া ঘট বিসর্জ্জনার্থ ঘরে গেলেন, যাই ঘট ধরিলেন, অমনি কোন অজ্ঞাত শক্তি যেন তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। দেবী আর বিসর্জ্জনের চেষ্টা পান নাই। সেই ঘট দুটি তদবস্থায়ই আছে,

দেবী তাহাদের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, একটি ঘট আদ্যা ভগবতীর, অন্যটি রাধামাধবের। দেবী এখন হইতে মাধবী ঠাকুরাণী নামে পরিচিতা হইলেন এবং তদবধি মাধবের জিনিষে মাধবের সংসার চালাইয়া আসিতেছেন।

প্রথম প্রথম অনেকে দেবীকে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যাইয়া পূজার মন্ত্রতন্ত্রাদি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন। যাঁহারা যাঁহারা অবজ্ঞার ভাবে যাইতেন, তাঁহারা হঠাৎ কোনও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, পরে দেবীর শরণাগত হইলে তাঁহারই উপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। রোগ প্রতীকার মানসেই এখন নানাস্থানের ভূরিভূরি লোক মাধবী দেবীর শরণাপন্ন হয়। দেবী কাহাকে একটু আদা, কাহাকেও একটু মাটি, কাহাকে বা পূজার নির্ম্মাল্য, কাহাকেও বা মাধবের প্রসাদ ব্যবহার করিতে দেন। কাহাকে কাহাকে প্রচলিত মুষ্টিযোগের বিশেষ বিশেষ ঔষধাদি ব্যবহারেরও আদেশ করেন। তদনুসারে অনেকেই নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য ও দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংসারের নানাবিধ বিপদে পড়িয়া, কিম্বা কামনাসিদ্ধির মানস করিয়াও অনেক লোক মাধববাড়ী আসে যায়।

পূর্ব্বে এ বাড়ীতে বৃহৎ কোন দেবার্চ্চনার প্রচলন ছিল না। মাধবী ঠাকুরাণী ক্রমে শারদীয় দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, শ্যামাপূজা, দোল এবং ঝুলন প্রভৃতি দেবকার্য্যানুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছেন, চৈত্র সংক্রান্তিতে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে মহাসমারোহে বুড়া বুড়ীর (বনদুর্গার) পূজা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে পূর্ব্বে ১৫০।২০০ লোক মাস ভরিয়াই দেবীর বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়াছে। দেবী স্বয়ং পাক করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। এখন কার্য্যকর্ম্মোপলক্ষে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণ আসিয়া রন্ধনাদি করেন এবং যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, প্রসাদ লইয়া চলিয়া যান। এই সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই, নিকটস্থ লোকেরাও কেহ বলিতে পারেন না যে কিরূপে কি হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী ৪।৫টী গৃহস্থ পরিবার, শুনিলাম, প্রধানতঃ মাধববাড়ীর উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে, মাধবের জন্য যে দ্রব্যসম্ভার আসে, যখন সুবিধা পায় নিয়া চলিয়া যায়। মাধবের ভোগের জন্য মিষ্টান্নাদি আসিলে, দেবী তখন তখনই তাহা লুটাইয়া উপস্থিত জনগণকে প্রসাদ দেন।

সকল বর্ণের লোকই দেবীর নিকট আসে যায়। বর্ণাশ্রমাচার রক্ষার প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি। সেদিন আমাদের সমক্ষে স্থানীয় একটী চণ্ডাল জাতীয় লোক কায়স্থদের হুঁকায় তামাক খাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল, দেবী জানিয়া বলিলেন, তুই কেন এ হুঁকায় খাইবি? পরক্ষণেই সুমিষ্ট ভাষায় তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "মনে কোনও কষ্ট নিওনা, যদিও ভিতরে আমি তুমি একই বস্তু, তথাপি বাহিরে যে বিভেদ আছে তাহা ত ঠাকুরই করেছেন; সে সব না মানিলে দোষ হয়। আশ্রমাচার মানিয়া চলিও।' দেবীর নিরভিমান ও স্নেহময় ব্যবহার, তাঁহার সহিষ্ণুতা, আলস্যহীনতা এবং ঈশ্বরনির্ভর, অতিশয় বিস্ময়কর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন সোজা কথায় তত্ত্বোপদেশ করিতেন, দেবীরও অনেকটা তদ্রূপই দেখিলাম। দুঃখের বিষয়, জ্ঞানালোচনার জন্য অতি অল্প লোকই তাঁহার নিকট যাইয়া থাকে। সেকেলে, অশিক্ষিতা, এতাদৃশী বৃদ্ধার নিকট কে আজকাল ধর্ম্ম শিখিতে চায়? কিন্তু ভগবান্ কোন্ ঘটে কি ভাবে বিরাজ করিতেছেন, অন্ধ, অজ্ঞান আমরা তাহা কি বুঝিব? কথার ভাবে বুঝিলাম, দেবী যেন পূর্ব্বে শান্তিপুরের ওদিকে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ামোহের ভাব আদৌ দেখিলাম না। সকল সময়েই তিনি শান্ত এবং ধীর। দেবীর যেন সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহরপ্রসন্ন মজুমদার।

সংবাদ ও মন্তব্য।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বানিয়ামবাড়ী নামক স্থানে গত ১১ই মার্চ্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পূজা, ভজন, নগরকীর্ত্তন, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্র আলোচনা, দরিদ্রসেবা, প্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ অঞ্চলের ভিজাগাপত্তনে সম্প্রতি "বিবেকানন্দ হোম" নামে এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। উত্তম উত্তম শাস্ত্রীয় সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা

আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা এবং মধ্যে মধ্যে দরিদ্র-সেবা এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির প্রতিষ্ঠার দিন ৮০০ শত দরিদ্র ব্যক্তিকে সেবা করা হয়।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের কথা মধ্যে মধ্যে উদ্বোধন পাঠকবর্গকে জানান হইয়াছে। ইহা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখা আশ্রম। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য কয়েকজন যুবককে ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষিত করা এবং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও উপদেশানুযায়ী যথাসাধ্য বেদান্তজ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা। উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে পাঠ, বক্তৃতা ও পুস্তকপ্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বারাণসীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের তত্ত্বাবধানও আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আশ্রমে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দরিদ্র বালকগণকে চলনসইগোছ হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা দান। উপস্থিত ছাত্র ৩৪ জন। শিক্ষাদানের জন্য দুইজন পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। কাশীতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের শিক্ষার বিশেষ কিছুই বন্দোবস্ত না থাকায় এরূপ ধরণের বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণের সাহায্য পাইলে ইহার প্রসার বৃদ্ধি করিবার এবং ইহার একটি শিল্প বিভাগ খুলিবারও সংকল্প আছে। এতদিন ভাড়াটে বাটিতে আশ্রমের কায চলিতেছিল। অল্পদিন হইল, জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে আশ্রম বাটীটি ক্রীত হইয়া স্থায়ী কার্য্যের সূচনা হইয়াছে। এই আশ্রম সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইলে স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, লাক্সা, বেনারস সিটী ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

বিগত ৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মতলায় ইউনিয়ান চাপেল হলে বহুবাজার রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডারের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ৩৫০ জন ভদ্র-মহোদয়ের সমাগম হয়। শ্রীযুক্ত এন্, ঘোষ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। মিঃ এস্. পি, রায় ব্যারিষ্টার, বাবু বিপিনচন্দ্র মল্লিক, মিঃ এইচ্ ডব্লিউ বি, মোরেনো এবং সভাপতি মহাশয় সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তৃতা করেন। সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ যে,বিগত বর্ষ উহা ৮ জন অনাথ বালককে প্রতিপালন এবং তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১৫

জন হিন্দু বিধবা ও তিনটী দরিদ্র পরিবারকে মাসিক সাহায্য করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের জন্য সমিতির সেবকগণ স্বতন্ত্ররূপে প্রায় ৯০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতগণকে সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারা এই ভাণ্ডার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে চান, তাঁহারা সমিতির আফিস ১২নং সারপেন্টাইন লেনে সমিতির অন্যতম সম্পাদক বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

বিগত ১০ই মার্চ বেহালা হিতকরী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া সমিতির কার্য্যে স্থানীয় লোকের সহানুভূতি বর্দ্ধনের জন্য সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিষ্টার ব্রান্‌ফিল্ড সভাপতি ছিলেন।

বিগত ১৪ই জানুয়ারি নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে ধ্যানের পর স্বামী পরমানন্দ স্বামীজির জীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বামীজির চরিত্রই তাঁহার উপদেশের যাথার্থ্যের প্রকৃত প্রমাণ। পরে স্বামী বোধানন্দ স্বামীজির কয়েকটী প্রিয় উপনিষদ্‌বাক্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার পর স্বামী অভেদানন্দ সমিতির কয়েকজন সভ্য এবং সর্ব্বশেষে স্বামী বোধানন্দ স্বামীজির উপদেশ ও জীবনী সম্বন্ধে [illegible] ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে ফুল ও ফল প্রসাদ স্বরূপ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

স্বামী অভেদানন্দ বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি, ব্রুক্‌লিন শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষালয়ে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ১২ই মহম্মদ ও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত কার্ণেগি লিসিয়মে ১০ই ফেব্রুয়ারি হইতে চারিটি রবিবার বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম, কার্য্যই উপাসনা, প্রাণায়াম ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং অবতার ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে তাঁহার চারিটি বক্তৃতা হয়।

স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বোধানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিগত ২৩শে জানুয়ারি পিটসবর্গে গমন করেন। ২৫শে জানুয়ারি তথায় চারিশত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে তাঁহার বেদান্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতা হয়। আর এক দিবস তিনি স্থানীয় New Thought সমিতিতে একটি বক্তৃতা করেন। পিটসবর্গে রীতিমত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভগবদ্গীতা ও রাজযোগ নিয়মিতরূপে পাঠ হইতেছে।

রামকৃষ্ণ-মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

শ্রীহট্ট জেলার কামারখালে বিগত ৭ই মার্চ্চ তারিখে নিম্নলিখিত মত চাউল বিলি হইয়া গিয়াছে।—

গ্রাম—৩৪।

পরিবার সংখ্যা—৩৩০।

লোকসংখ্যা—১১৯৭।

চাউল—৪৮ মণ।

—

রামকৃষ্ণ-মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তিস্বীকার।

পূর্ব্বে স্বীকৃত	৪৭১৬৶১০
শ্রীগিরিজাভূষণ হালদার, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,	২৲
শ্রীমতী নীহারবালা রায় চৌধুরী, বারাকপুর,	১৲
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা	১৲
প্রবুদ্ধ ভারত অফিস হইতে প্রাপ্ত	১৩৸৶
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা, জঙ্গমবাড়ী, বেনারস	২৲
বন্দে মাতরম্ সন্তানসমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত, হাজারিবাগ	৪৲
শ্রীললিতমোহন চৌধুরী, বদরা	৫৲
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর,	৫৲
ডাঃ পি, এম, মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রায় ভগবান্ দাস বগলাবাহাদুরের মাড়োয়ারি হাঁসপাতাল হইতে সংগৃহীত (৩য় দফা)	১৩৩৲
শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ, পূর্ণিয়া	১০৲
জনৈক বন্ধু	১৲
	৪৯০৪৷১০

"আগত বৈশাখ মাস হইতে উদ্বোধন ১লা ও ১৫ইয়ের পরিবর্ত্তে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া বাহির হইবে।"

উদ্বোধনের নিয়মানুসারে ১৫ই চৈত্রের সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই সুতরাং বৈশাখের প্রথম পক্ষের উদ্বোধন ৬ষ্ঠ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।) (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যোগেশ্বরী নাম্নী ব্রাহ্মণী যাঁহাকে রামকৃষ্ণদেব যোগমায়া বলিতেন, দক্ষিণেশ্বরে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া অবশেষে কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি একদিন রামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি এখানে এসেছ, আমি শুনিনি। যা আমি যেখানে থাকি, সেখানে একবার পায় ধূলা দেবে? সেখানে একটী আমারি মত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আছে। সে বড় ভক্তিমতী, তাকে যদি বাবা দয়া করে কৃপা কর।" রামকৃষ্ণদেব সম্মত হইলেন এবং হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া পরদিন ব্রাহ্মণীর আবাসস্থলে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণীর বয়ঃক্রম এখন ন্যূনাধিক ষষ্টি বর্ষ হইবে তথাপি তাঁহাকে দেখিলে এত অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গিনীকে ডাকিয়া প্রভুদেবকে প্রণিপাত করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি প্রণাম করিবার অগ্রেই রামকৃষ্ণদেব করযোড়ে মা আনন্দময়ী বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং তৎসঙ্গেই এত গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন যে, হৃদয় দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। তৎপরে গুটিকতক শ্যামাবিষয়ক গান গাহিয়া ও তত্ত্বকথা কহিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন। তাহার পর আরও দুই দিবস এইস্থানে ব্রাহ্মণীর অনুরোধে আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু সেপ্রকার সমাধিস্থ আর হন নাই।

একদিন রজনীযোগে জনকয়েক তান্ত্রিক সাধক তাঁহাকে আপনাদের চক্রে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। তন্ত্রসাধকগণ তাঁহাকে ভাগীরথীর তীরে এক একান্ত স্থানে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন, প্রত্যেক পুরুষের সহিত এক একটী ভৈরবী বসিয়া আছেন। ইঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে

সকলে তাঁহাকে কারণ দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তদ্দর্শনে কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মা, আমি যে কারণ ছুঁতে পারিনি মা, খাব কেমন করে।" তান্ত্রিকগণ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া আপনারা পান করিতে লাগিলেন এবং অচিরে পানোন্মত্ত হইয়া সকলে একত্রে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও জপধ্যানাদি করিবার কোনও রূপ চেষ্টা লক্ষিত হইল না।

প্রকৃত সাধন না করিয়া তাঁহাদের এই সমস্ত ঘৃণিত আচরণ দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কাশীধামে এক পক্ষ কাল কাটাইয়া তৎপরে তিনি বৃন্দাবনধামে যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

মথুরানাথ কহিলেন, "বাবা, সেখানে যাবে কেন? সেখানে ত কেবল ন্যাড়া নেড়ীর কাণ্ড, আর সব বদমায়েসের দল।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার স্থান দেখ্‌তে যাব। রাধাকৃষ্ণের লীলার স্থান পবিত্র স্থান, আমি সেখানে যাব।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় আব্দার করিতে লাগিলেন। মথুরানাথ অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

বৃন্দাবনে পঁহুছিয়া তাঁহারা নিধুবনের সন্নিকটে একটী বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব এখানে উপস্থিত হইয়াই বন পরিক্রম করিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মথুরানাথ বালককে যেমন নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া কোন কার্য্য হইতে নিবারণ করে, তদ্রূপ বন-পরিক্রমের নানারূপ কষ্টের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। রামকৃষ্ণদেব অবশেষে কহিলেন, "তবে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন দেখ্‌তে যাব।"

মথুরানাথ কহিলেন, "তা বেশ কথা। তুমি আর হৃদয় দুজনে দুখানি পাল্‌কীতে যাও। আমি আর যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তা হবে না, হৃদুর পাল্‌কীতে যাওয়া হবে না।" এই কথা বলিয়া হৃদয়ের মুখের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, হৃদয়ের পালকীতে যাইবার অতি প্রবল বাসনা, সুতরাং তাঁহাকে বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন, "অ—হৃদু, তুই কেন পাল্‌কী চেপে যাবি? মথুরের কি, ও ত তীর্থস্থানে তোকে পালকী টাল্‌কী চাপিয়ে পুণ্যি করতে চায়। তুই তাই বলে তীর্থ

স্থানে এসে সখ করে পালকী চেপে ঠাকুর দেবতা দেখতে যাবি কেন? তবে আমি যে যাই, সে আমি একেবারে অচল হয়ে পড়েছি, দু পা হাঁটতে পারিনি তায় অতটা পথ, নইলে আমার কি ইচ্ছে যে পালকী চেপে বেড়াই?" হৃদয় বুঝিলেন, তীর্থ স্থানে আসিয়া অনর্থক কোন যানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবালয়াদি দর্শন করা অবিধি। অতএব তিনি রামকৃষ্ণদেবের পালকীর সঙ্গে পদব্রজে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব পালকীতে গমন করিতেছেন, হৃদয় তাঁহার এক পার্শ্বে পালকী ধরিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে পদব্রজে গমন করিতেছেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া কতকগুলি ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব আনন্দে পুলকিত ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের নিকটে যাইবার জন্য বালকবৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া পালকী হইতে লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। হৃদয়ের দৃষ্টি সতত তাঁহার প্রতিই থাকিত, এজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। কমললোচন মুরলীধরের কৈশোর লীলাভূমে পদার্পণ করিয়াই রামকৃষ্ণদেবের ভাবান্তর উপস্থিত, যেন পঞ্চম বর্ষের বালক। তদুপরি শাস্ত্রকথিত বিভিন্ন স্থান সকল যতই দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বালগোপালের ভাবসমূহ জাগরিত হইতে লাগিল। কতকদূর যাইয়াই আবার দেখিলেন, একটী কুরঙ্গদল ক্রীড়াবশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, অমনি কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গাভিলাষে লম্ফ দিয়া পালকী হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলেন। এবারও হৃদয়ের সতর্কতায় তাঁহার সে উদ্যম বিফল হইল। এইরূপ মনোরম দৃশ্য তাঁহাকে ঐরূপ উন্মত্ত করিতে লাগিল। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দর্শন করিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন, হৃদয় অতি যত্নে তাঁহার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য আসিলে তথা হইতে গোবর্দ্ধন যাত্রা করিলেন। গিরি গোবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হইলে হৃদয়ের আর কোন প্রকার বল কৌশল খাটিল না। কুসুমকোমলাঙ্গ রামকৃষ্ণদেব পালকী হইতে পিঞ্জরবিমুক্ত কেশরীর ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া বেগে গোবর্দ্ধনের উপর উঠিয়াই সমাধিস্থ ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে পর তাঁহারা তাঁহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া আনিলেন। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছিল সুতরাং সে দিবস এক নন্দ-

বাসীর আবাসে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন প্রত্যূষে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

বৃন্দাবনধামে আসিয়া রামকৃষ্ণদেব ভেক গ্রহণ করেন। যে কয় দিবস এই স্থানে ছিলেন, তিনি হস্তে সর্বদা একখণ্ড কাঁচা কঞ্চি রাখিতেন। হৃদয় যদি কখন তাঁহার হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইতেন, তাহা হইলে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তাঁহার শরীর যেন লুপ্তশক্তি ও অসহায় হইয়া পড়িত, এবং সেই কঞ্চিটী যতক্ষণ না তাঁহার হস্তে পুনরায় দেওয়া হইত ততক্ষণ তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। এমন কি, স্নান করিবার পূর্ব্বে উহা কাড়িয়া লইলে তিনি পাল্‌কী হইতে নামিতে পারিতেন না, পাল্‌কী যমুনায় নিমজ্জিত করিলে তাহার মধ্যে বসিয়া স্নান করিতেন।

এই সময়ে বিখ্যাত গঙ্গামাতা নিধুবনে একটী নিভৃত পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম আশীতিবর্ষ বা ততোধিক, কিন্তু মুখ দেখিলে মনে হইত, যেন অষ্টবর্ষীয়া বালিকা। শ্রীমতীর জন্মস্থান বর্ষানা গ্রামেই। এই সাধ্বী বর্ষীয়সী রমণী প্রায় সমস্ত জীবন এ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া কিছুদিন নিধুবনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট বৃদ্ধা গঙ্গামাতা সুপরিচিতা। তাহারা তাঁহাকে শ্রীমতীর জনৈক সখি—একাকী লীলা করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা—বলিয়া জ্ঞান করিত। এতদিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছেন কিন্তু কখন কাহারও বাটী গমন করেন নাই। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রভূত সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইলেন। গঙ্গামাতা রামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শনে চমকিত ভাবে কিছুক্ষণ অনিমেষনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিলেন। এদিকে রামকৃষ্ণদেব গঙ্গামাতাকে দেখিবামাত্র শ্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট হইলেন। বহুকালেপ্সিত প্রিয়দর্শন সংঘটিত হইলে মানুষের যেরূপ হৃদয়কেন্দ্রস্থ মধুরভাব সমূহ উদ্ভাসিত হয়, রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে শ্রীমতীর রূপ দর্শন করিয়া বর্ষীয়সীর হৃদয়ে সেইরূপ ভক্তিরশ্মি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গঙ্গামাতা সম্পূর্ণ পরিচিতার ন্যায় রামকৃষ্ণদেবকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। "মেরি ব্রজদুলালী, ও মেরি লাড্‌লী, আজ মেরা বড়া ভাগ্‌ হায় যো তোমারা দর্শন মিলা। মেরা বড়া ভাগ্‌ হায় যো তোমারা দর্শন মিলা।" রামকৃষ্ণদেবও

ভাবে বিভোর হইলেন। অতঃপর গঙ্গামাতা পরম সুযোগ পাইয়া শ্রীরাধিকা জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানারূপ মিষ্টান্ন আহার করাইলেন ও আপনি সেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। রামকৃষ্ণ-দেবও পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় গঙ্গামাতার সহিত উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব কথা সকল কহিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া আসিলে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া হৃদয় আবাস হইতে অন্নব্যঞ্জনাদি আনিয়া তাঁহাকে আহার করাইলেন। রামকৃষ্ণদেব প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া হৃদয়ের সহিত গঙ্গামাতার নিকট গমন করিতেন। আহারের সময় হৃদয় আবাস হইতে অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া তাঁহাকে আহার করাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় পালকি করিয়া তাঁহাকে আবাসে আনয়ন করিতেন। রামকৃষ্ণদেব ও গঙ্গামাতা ঈশ্বরপ্রসঙ্গে সমস্ত দিন একেবারে মগ্ন থাকিতেন। তিনি গঙ্গামাতার নিকট এইরূপ পাঁচ সাত দিন যাতায়াতের পর একদিন তিনি গঙ্গামাতার সমস্ত লক্ষণাদি হৃদয়কে দেখাইয়া কহিলেন, "এঁর অতি উচ্চ অবস্থা; বড় ঠিক অবস্থা।" গঙ্গামাতা অমনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তৎপরে একদিন মথুরানাথকে কহিলেন, "দুজন লোক দেখলুম, খুব উচ্চ অবস্থা। কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর এখানে গঙ্গামাতা। এখানে গঙ্গামাতার মত আর কেউ নেই, উনি ঠিক সখীভাবে সিদ্ধ হয়েছেন।"

গঙ্গামাতার শ্রদ্ধা ও যত্নে বশীভূত হইয়া পাছে রামকৃষ্ণদেব বৃন্দাবনেই থাকিয়া যান, এই আশঙ্কায় একদিন মথুরানাথ হৃদয়কে কহিলেন, "ভাই হৃদু, বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ভার তোমার উপর।"

হৃদয় কহিলেন, "তুমি ভেবোনা, আমি মামাকে ঠিক নিয়ে যাব দেখ।" গঙ্গামাতারও বিশেষ চেষ্টা যাহাতে তাঁহার 'লাড্‌লী' বৃন্দাবনেই থাকিয়া যান; এবং তিনি সেই জন্য রামকৃষ্ণদেবকে অনুরোধও করিলেন। ইহা দেখিয়া হৃদয় কহিলেন, "মামা, গঙ্গামা এখন তোমায় খুব যত্ন করছেন বটে, কিন্তু তোমার যখন পেটের অসুখ করবে, তখন তোমার কেইবা মলমূত্র পরিষ্কার করবে আর কেইবা যত্ন করবে?"

গঙ্গামাতা অমনি বলিলেন, "কেন, আমি করব। দুলালী, তোমার মল-মূত্র পরিষ্কার করা কি বেশী কথা?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তা বটে, কিন্তু আমি ত আতপ চালের ভাত খেতে পারব না।"

গঙ্গামাতা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "তার আর কি, না হয় সিদ্ধ চালের ভাত খাবে। ব্রজদুলালী, তুমি এই খানেই থাক, এ তোমারি স্থান।"

গঙ্গামাতা হিন্দিতে কথা কহিতেছেন, রামকৃষ্ণদেবও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিতেছেন, "হাম মছলি খাতা।"

গঙ্গামাতা কহিলেন, "নেহি, মছলি নেহি হোগা, আওর সব হোগা।"

চৈত্র মাস প্রায় শেষ, আগামী বৈশাখে এইবার দ্বাদশ বৎসর পরে বিশ্বনাথের শৃঙ্গার বেশ হইবে। রামকৃষ্ণদেব উহা দেখিবার জন্য বৃন্দাবনে এক পক্ষ থাকিয়া মথুরানাথের সহিত কাশীধামে পুনরাগমন করিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিতেন এবং ইহা দেখিবার জন্যই কাশীধামে একমাস অবস্থিতি করিলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালেই তাঁহার বীণ শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, মথুরানাথ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বীণ শুনাইতে পারেন নাই, কারণ সে সময়ে বৃন্দাবনে কোন বীণ বাদক উপস্থিত ছিলেন না। এখানে উপস্থিত হইয়াই মথুরানাথ বীণ বাদকের সন্ধান করিতে করিতে শুনিলেন যে, মহেশ চন্দ্র সরকার ব্যতীত আর কোন ভাল বীণ বাদক তখন কাশীধামে নাই। মহেশচন্দ্র একজন সঙ্গতিপন্ন লোক, তাঁহার কোন অভাব নাই, সুতরাং কাহারও বাটী যাইয়া সঙ্গীত শুনাইতে অসম্মত। রামকৃষ্ণদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন, "তার আর কি? না হয় তাঁর বাড়ী গিয়ে শুনে আস্‌ব।" তাহাই স্থির হইলে, অপরাহ্ন পাঁচটার সময় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মদনপুরায় মহেশের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাটী ত্রিতল, মহেশচন্দ্র উপরে বৈঠকখানায় ছিলেন। হৃদয় যাইয়া সম্বাদ দিলেন, "একজন মহাপুরুষ আপনার বীণ শুনতে এসেছেন।"

মহেশ জিজ্ঞাসিলেন, "তিনি কোথায়?"

হৃদয়—"নীচে আছেন।"

মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নীচে আসিয়া করজোড়ে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম রিয়া কহিলেন, "উপরে আসতে আজ্ঞা হয়।"

রামকৃষ্ণদেব ভাবের ঘোরে ছিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না; য় তাঁহাকে ধরিয়া তিন তলার উপরে বৈঠকখানায় আনিলেন। রামকৃষ্ণদেব উপবিষ্ট হইয়া মহেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

মহেশ বলিলেন—"আমার নাম শ্রীমহেশ চন্দ্র সরকার।"

রামকৃষ্ণদেব—"তুমি নাকি বীণ বাজাতে জান? আমি শুনতে এসেছি, বাজাবে?"

"আজ্ঞে বাজাব বই কি। আপনি শুন্‌লে আমার বীণ বাজান সার্থক হবে। বাজাব বই কি।" মহেশচন্দ্র করজোড়ে এই কথা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বীণটী লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বীণের বাদ্য আরম্ভ মাত্রেই রামকৃষ্ণদেবের ভাব হইতে লাগিল, আর তিনি বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় হুঁস্ দেও মা, আমি ভাল করে বীণ শুনি।" এইরূপ বার কয়েক বলিতে বলিতে তাঁহার সহজাবস্থা আসিলে মনোনিবেশপূর্ব্বক বীণের আলাপ শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ শুনিয়া বীণে যাহা বাদিত হইতেছিল, তাহা ঐ বীণের সুরে গাহিতে আরম্ভ করিলেন। মহেশচন্দ্র ইহাতে আশ্চর্য্য ও উৎসাহিত হইয়া, গুটিকতক আলাপের পর গত বাজাইলেন, রামকৃষ্ণদেবও পূর্ব্ববৎ বীণের সহিত একতানে গাহিতে লাগিলেন। অবশেষে রামকৃষ্ণদেব নিজের ইচ্ছানুযায়ী গান গাহিতে লাগিলেন, এবং মহেশকে বীণে সেই গান বাজাইতে অনুমতি করিলেন। এইরূপ গীতবাদ্যে এক মহা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি আটটা বাজিলে মহেশচন্দ্র জলযোগের আয়োজন করিলেন, জলযোগের পর রামকৃষ্ণদেব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। মহেশচন্দ্র সেই আনন্দ ভুলিতে না পারিয়া প্রায় প্রত্যহই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

একদিন মথুরানাথ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে কিছু দান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, রামকৃষ্ণদেব যাহাকে যে প্রকার দান করা আবশ্যক তাহা সমস্ত বলিয়া দিলেন, এবং মথুরানাথও তদনুযায়িক তথায় বহু অর্থ দান করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক, তাঁহার কুলগুরুপুত্রও তাঁহার সঙ্গে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

কাশী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে মথুরানাথ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি কাশীতে ক্রয় করিলেন। তিনি যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাঁহার গুরুপুত্র তাহা দেখিয়া অমনি কহিতেন, "দাদা, আমারও ঐরকম চাই। এনে দিও।" মথুর অগত্যা তাহাই আনাইয়া দিতেন, কিন্তু অন্তরে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। একদিন তিনি রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন, "বাবা এত জিনিষ পত্র কিন্‌লুম, তোমার জন্যে ত কৈ কিছু কেনা হল না, তোমার কি চাই বল? তুমি কিছু না নিলে এত জিনিষ কেনা বৃথা হয়।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমার আবার কি চাই ?"

মথুর পুনরায় কহিলেন, "তা হবে না বাবা, একটা কিছু নিতেই হবে, কি নেবে বল ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তবে একটা কাঠের রাঙা কমণ্ডলু এন।"

মথুরানাথ কাশী হইতে গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে রামকৃষ্ণদেব মথুরকে কহিলেন, "না, আমার সেখানে যাওয়া হবে না। সেখান থেকে এসেছি, সেখানে গেলে শরীরটা থাকবে না।" মথুরানাথের আর গয়াধামে যাওয়া হইল না, সুতরাং সকলে একেবারে কলিকাতায় আগমন করিলেন।

গ্রীষ্মকাল, মথুরানাথের ইচ্ছা ভাগীরথীবক্ষে নৌকাযোগে বিচরণ করেন। কিন্তু তাঁহার ইষ্টদেবতা রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে দূরে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ইচ্ছা, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু তিনি পুনরায় পেটের পীড়াগ্রস্ত, মথুর ভাবিলেন, "বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাই, গঙ্গার হাওয়া খেলে পেটের অসুখ ভাল হতে পারে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার নিকট নদীবক্ষে ভ্রমণের প্রস্তাব করিলেন; রামকৃষ্ণদেবও সম্মত হইলেন। মথুরানাথ পরমানন্দে তাঁহাকে ও হৃদয়কে সঙ্গে লইযা নৌযাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিন পরে চুর্ণি নদীর মধ্য দিয়া রাণাঘাটের নিকট কলাইঘাটা নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের লোকগুলি অতীব শীর্ণ, জীর্ণ, কঙ্কালসার, রুক্ষকেশ, যেন বহুকালাবধি কখন অর্দ্ধাশন কখন বা অনশনে দিনযাপন করিতেছে। পরিধানে কাহারও একখণ্ড অতি মলিন শতচ্ছিদ্র বস্ত্র, কাহারও বা তাহাও নাই, কেবল মাত্র একখণ্ড জীর্ণ মলিন বস্ত্রের কৌপীন। রামকৃষ্ণদেব লোকগুলির এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মা তোর এ কি বিচার মা। কারুর ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই, আবার কেউ বা অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। মা, তোর রাজ্যে এমন অবিচার কেন মা ?" মথুরানাথ তাঁহার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, কাঁদছ কেন, কি হয়েছে বাবা ?" রামকৃষ্ণদেব সেই দারিদ্র্য-নিপীড়িত লোকদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, "দেখ মথুর, এদের দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি আর এ কষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিনি। তুমি এদের তেল দেও, কাপড় দেও, আর ভাল খাবার দেও। এরা তেল-

মেখে স্নান করে সবাই এক একখানি নূতন কাপড় পোরে ভাল খাবার খাক্। আর তুমি যতদূর পার, এদের দুঃখ দূর কর, আমি দেখি। এদের মত দুঃখী কখন দেখিনি।" মথুরানাথের জমিদারী এই স্থানে, সুতরাং তথায় যে অসংখ্য দরিদ্র বাস করিত, তাহা তিনি বিদিত ছিলেন। অন্যান্য সময়ে মথুরানাথ কোন বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার ইষ্টদেবতার ইঙ্গিত-মাত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা অবাধে ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু কি জানি, এ সময়ে তিনি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "বাবা, তোমার দয়ার শরীর, দুঃখ দেখিলেই তোমার কষ্ট হয়। কিন্তু এই সমস্ত লোককে খাওয়াতে যে গাদা গাদা টাকা খরচ হবে, তা ত জাননা। আমি এত টাকা কোথায় পাব ?"

যাহা হউক রামকৃষ্ণদেব মথুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি রুক্ষভাবে কহিলেন, "কি, তুমি মনে কর এই ঐশ্বর্য্য তোমার ? আজ মোরে গেলে কাল তোমার থাক্‌বে ? এ দুনিয়ায় এক পয়সা কারুর নয়, সব মার। তোমরা বড়মানুষরা মার ভাণ্ডারী, তাঁর কাজে খরচ করবে, তাঁর সেবায় খরচ করবে, জকের মত কেবল আগলে রাখবার জন্য, কি কেবল তোমাদের আত্মতৃপ্তি করবার জন্য ভাণ্ডারী হওনি। মা কি আলাদা ? মা এই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। মার আজ্ঞা—এই দুঃখী দরিদ্রদের সেবা করলে তাঁরই সেবা করা হবে। তাঁরই আজ্ঞা জেনে এই সমস্ত দুঃখী লোকের সেবা কর, যত টাকা লাগে খরচ কর। তাঁর ধন তিনি সঞ্চয় করে তোমাদের কাছে রেখেছেন, কেবল তোমাদের নিজের সুখের তরে খরচ করবার জন্যে নয়। যতদূর পার এদের দুঃখ দূর কর, তাঁর আজ্ঞা।" রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যেক বাক্য বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার শিরায় শিরায় লাগিতে লাগিল, প্রত্যেক বাক্য যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত মথুর একেবারে দীনভাবাপন্ন হইয়া বারম্বার তাঁহার ইষ্টদেবতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তারযোগে কলিকাতায় বস্তা বস্তা কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করিবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। তৎপরে লোক পাঠাইয়া স্থানীয় যাবতীয় দরিদ্র লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে বস্ত্রাদি আসিলে এবং আহারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে তৈল ও বস্ত্র দিয়া তাহাদিগকে স্নান করিতে কহিলেন। তাহারা সেই দিন আহারের বিপুল আয়োজন দর্শনে এবং রামকৃষ্ণদেবের দয়ালমূর্ত্তি ও স্নেহময় বাক্য শ্রবণে মোহিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,

"এ কে ভাই ? নিশ্চয় কোন দেবতা হবে, নইলে আমাদের উপর এত দয়া কেন করবে ?" কেহ বলিল, "শুনছি, না কি কল্‌কেতা থেকে গাঁট গাঁট কাপড় আনিয়েছে, সব এই রকম বিলোবে।" অপর একজন কহিল, "বটে ? তাই হবে ভাই, কাল ঐ লোকটি আমাদের দুঃখ দেখিয়ে বাবুকে বলেছে, আমাদের পেট্‌টা ভরে খাওয়াতে আর হাপুশ নয়নে কাঁদছেল। ভাই, আমাদের দুঃখ দেখে কাঁদে, এমন ত লোক দেখিনি !" আবার একজন কহিল, "হাঁরে, দেবতাই হবে, নইলে মানুষ কি আর গরিবকে দয়া করে, দেবতা না ত কি ?" এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সকলে স্নান করিয়া আসিলে, মথুরানাথ সকলকে আহার করিতে বসাইলেন। প্রায় সাত শত লোককে একত্রে ভোজন করিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিলেন, আর তাঁহার সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাদের বিশ্বাসও বদ্ধমূল হইয়া গেল। আহারান্তে মথুরানাথ প্রত্যেক ব্যক্তিকে চারি আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন, অনেকে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইয়া গেল। এইরূপ এক সপ্তাহ কাল দরিদ্রসেবা করিয়া মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

উত্তরাখণ্ডে ভদ্রকালী।

হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ সচরাচর উত্তরাখণ্ড নামে পরিচিত। উহা সমতল-ভূমি হইতে স্তরে স্তরে উঠিয়া নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন নামও আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হিমালয়ের কুমায়ুন বিভাগের ভদ্রকালীনামক একটী তীর্থস্থানের কথা কিছু বলিব। (শাস্ত্রীয় নাম কূর্ম্মাচল।) ইহার রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলের শেষ ষ্টেসন কাঠগুদম হইতে ভদ্রকালী আসিবার রাস্তা আছে। কাঠগুদাম হইতে আলমোড়া ৩৭ মাইল; আলমোড়া হইতে বাগেশ্বর ২৬ মাইল, বাগেশ্বর হইতে ভদ্রকালী ১৭ মাইল। সুতরাং রেল ষ্টেশন হইতে ইহা সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ মাইল। ভদ্রকালী যাইবার রাস্তা হইতে নন্দকোট, পঞ্চচুলি, কেদারনাথ, বদরিনাথ প্রভৃতি অনেক উচ্চ উচ্চ তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ নয়নগোচর হয়।

বাগেশ্বর জায়গাটী দেখিলে ঠিক হরিদ্বার বলিয়া মনে হয়। ঐস্থানে সরযু নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহার উভয় প্রান্তে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমতল। এই সরযু নদীর ২০।২২ মাইল উত্তর হইতে আসিতেছে। যে স্থান হইতে ইহার আরম্ভ, তাহাকে সহস্রধারা বলে। সহস্রধারা নাম হইবার কারণ—ঐ স্থানে অনেক গুলি ঝরণা ও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী মিলিয়া এই সরযু নদীর সৃষ্টি করিয়াছে। সরযু নদীতে অনেক লোক বিশেষ বিশেষ পার্ব্বণ উপলক্ষে স্নান করিতে আসিয়া থাকে। শীতকালে বাগেশ্বরে মেলা হয়, তদুপলক্ষে অনেক ভুটিয়া (তিব্বত দেশীয় লোক) তিব্বত হইতে চামর, সোহাগা, গরম শীত বস্ত্র, মৃগনাভি, লবণ, ব্যাঘ্র ভল্লুক ও হরিণের চর্ম্ম, পশম ইত্যাদি দ্রব্য লইয়া বাণিজ্যার্থ আসিয়া থাকে এবং যাইবার সময় চাউল, গম, গুড় এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বাগেশ্বর হইতে সাত আট মাইল দূরে এক বড় গুহা আছে। তাহার নাম গৌরী-ওডিয়ার (গৌরী-গুহা)। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, মহাদেবের গিরিরাজ ভবনে বিবাহ করিতে যাইবার সময় তদীয় অনুচরেরা ঐ স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন,—এবং তদবধি ঐ গুহার উক্ত নামকরণ হইয়াছে।

আমি বাগেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া ছোট ছোট নদী নালা পার হইয়া, চড়াই করিয়া উক্ত গুহাভিমুখে চলিলাম। সরকারী রাস্তা বরাবর ভাল। এখানকার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক এক গ্রাম্য দেবতার মন্দির এবং প্রায় প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতশিখরেই এক একটী দেবস্থান আছে। বাগেশ্বর হইতে বার মাইল চলিয়া ওড়া বিজয়পুর গ্রামে এক বাগানে আশ্রয় লইলাম। বাগানটীতে চা, আপেল, ও অন্যান্য নানাবিধ ফল ফুল জন্মে। এখান হইতে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার (Glacier) দুই তিন দিনের রাস্তা, অন্যান্য বরফান পাহাড়ও এখান হইতে ঐরূপ দূরবর্ত্তী। বাগানের মালিককে বলিলাম, ভদ্রকালী দেবীর মন্দির এখান হইতে দর্শন করিতে যাইব। তিনি বলিলেন, আনন্দের বিষয়, তবে এক সঙ্গে আমরাও যাইব। বাগানে দুই চারিদিন বিশ্রাম করিয়া পাহাড় থেকে ওতরাই করিয়া নামিলাম। তিন মাইল পরে আঁসিয়া দেখি, পাহাড়ে আর এক গুহা,—নাম শাণ্ডিওডিয়ার (শাণ্ডিল্য গুহা অর্থাৎ শাণ্ডিল্য মুনির তপস্যার স্থান)। ইচ্ছা হইয়াছিল, একবার ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসি। কিন্তু যাইবার রাস্তা বন্ধ। বাগান-

ওয়ালা বলিলেন, সরকারী রাস্তার ধারে বলিয়া সরকারই উহা বন্ধ করিয়াছে। সুতরাং দেখা হইল না। ক্রমশঃ চলিতে চলিতে এইবার ভাল রাস্তা ছাড়িয়া খারাপ রাস্তায় আসিলাম। পথ পিচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে পাতা পড়িয়া আরও খারাপ হইয়াছে। ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী একগ্রামে পৌঁছিলাম,—গ্রামের নাম ভাহুই গাঁও। গ্রামের কিছু নীচে ভদ্রাবতী নদী।

নদীর ধারে গাছতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় ভদ্রকালী দেবীর পূজারী এবং গ্রামের কোন কোন লোক আমাদের কাছে আসিল। যে নদীর ধারে বসিয়াছিলাম, সেখানে মন্দিরের কোন চিহ্ন নাই, নিকটে অনেক রকমের জঙ্গলীবৃক্ষ। জিজ্ঞাসা করিলাম, দেবীর মন্দির কোথায়। তাঁহারা বলিলেন, যেখানে আপনারা বসিয়া আছেন, এর নীচেই ভদ্রকালী দেবীর গুড়িয়ার। পাণ্ডা বলিল, স্নান করিয়া সেই ভিজে কাপড় পরিয়াই মন্দিরে যাইতে হইবে। কারণ, গুহার উপর দিয়া একটি ছোট নদী চলিতেছে, সেই নদীর জল মন্দিরের ভিতর যায়গায় যায়গায় ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। যাহা হউক, আমরা খানিকটা ওজরাই করিয়া অন্য একটী নদীতে স্নান করিতে গেলাম। যেখানে স্নান করিলাম, সে নদী গুহার ভিতর হইতে আসিতেছে। জল কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক বুক, খুব ঠাণ্ডা। নদীর ধারে এক এক জায়গায় Fossilized পাথর দেখিলাম; গাছের পাতা, ছোট ছোট ডাল, কোন কোন জানোয়ারের হাড় জমিয়া পাথর। সেই পাথর ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, ভিতরে শুকনো গাছের পাতা, তার নীচে উপরে চতুর্দ্দিকে পাথরের একটা পর্দ্দা পড়িয়াছে।

স্নান করিয়া চিড়কাঠের মশাল জ্বালিয়া ভিতরে ৭।৮ জন যাই-লাম; গুহার ভিতর খুব অন্ধকার, আলো না লইয়া গেলে কিছুই দেখিবার যো নাই। আমাদের আলো দেখিয়া ভিতর হইতে হাজার হাজার চামচিকা উড়িয়া পলাইতে লাগিল। গুহার ভিতর যাইবার রাস্তাটা তিনহাতের বেশী উচ্চ হইবে না, কিন্তু যখন ভিতরে পৌঁছিলাম, দেখিলাম, প্রকাণ্ড মন্দির। তিনটি মন্দির পরে পরে, মন্দিরের উচ্চতা ৬০।৭০ হাত; লম্বা প্রায় ২০০ হাত, চওড়া ৩০।৩৫ হাত, বাঙ্গলাদেশে যেরূপ শিবমন্দির করে, আকৃতি অনেকটা সেই রকম। কিন্তু এ মন্দিরের খিলান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, লক্ষ লক্ষ পাথরের সাপের ফণা এই খিলানটিকে ধারণ করিয়া আছে, একটি ফণার উপর আর একটী, তার উপর, তার উপর এই রকম বরাবর নীচে

হইতে উপরে উঠিয়াছে। এক একটি ফণা লম্বায় দুই হাত আড়াই হাতের কম নহে। ভিতরে চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ, অন্য কোন মূর্ত্তি নাই। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, এইটি ভদ্রকালীর মন্দির নহে; কিন্তু পাণ্ডা বুঝাইয়া বলিল, ইহাই ভদ্রকালীর মন্দির; মূর্ত্তি মন্দিরের বাহিরে উপরের দিকে রাখা আছে। কারণ বর্ষাকালে কিম্বা অন্য কোন সময় যখন নদীর জল বাড়ে, সেই সময় পূজার জন্য ভিতরে আসা যায় না; রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। তারপরে পাণ্ডা বাহিরে আসিয়া মূর্ত্তি দেখাইল, মূর্ত্তিটি ছোট, অন্যান্য ছোট ছোট দেবদেবীমূর্ত্তিও রহিয়াছে, আমরা সকলেই পূজা করিলাম। পরে পূর্ব্বোক্ত গাছতলাতেই আমাদের রান্না হইল, কারণ, এখানে কোন ধর্ম্মশালা বা দোকান নাই। দোকান অভাবে আহারীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া আনিতে হয়। ভদ্রকালীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, ফিরিয়া সেই বাগানে আসিয়া রহিলাম।

ভ্রমণকারী—

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে দুএকটী কথা।

অনেকেরই নিকট আজকাল এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাতে লোকের ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মের উপর একটা শ্রদ্ধা দিন দিন লোপ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু উহার প্রতীকার কল্পে কি চেষ্টা হইতেছে? আমাদের গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিক ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে ভরসা করেন না। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা ও উদাসীন ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু আমরা সমবেত চেষ্টাদ্বারা কি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারি না? আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষার যতই দোষ দেখাই না কেন, আমাদিগকে এখন নানা কারণে বাধ্য হইয়াই আমাদের সন্তানগণকে ঐশিক্ষা দেওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। কিন্তু আমরা কি উহার কুফলপ্রতিষেধক কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি না?

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার প্রস্তাব হইলেই কতকগুলি আপত্তি উত্থিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মশিক্ষা কোন পুস্তকবিশেষ পড়াইলে হইতে পারে না। উপদেশ অপেক্ষা উদহরণ অধিক কার্য্যকর;

সুতরাং শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ ধার্ম্মিক হইলে ছাত্রদেরও যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ তাহারা ধার্ম্মিক হইতে পারে, নতুবা তাহারা ধর্ম্মের কতকগুলা কথামাত্র শিখিয়া ধর্ম্মজেঠা হইয়া যাইবে। অপর কেহ কেহ বলেন, বিদ্যালয় অপেক্ষা গৃহই যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষার স্থল। ধর্ম্মশিক্ষা কেবল পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন দ্বারাই প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে। কেহ কেহ আবার বলেন, ধর্ম্মশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে সুফল অপেক্ষা অধিক কুফল ফলিবে, কারণ, ধর্ম্মচর্চ্চা আরম্ভ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিবে; সুতরাং লৌকিক শিক্ষা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়া এক বিশাল ভারতীয় জাতিগঠনরূপ যে মহান্ কার্য্য সাধিত হইতেছিল, তাহাতে বিষম বাধা পড়িবে এবং আমরা যরূপ ছিন্নবিচ্ছিন্ন আছি, তদপেক্ষা অধিক বিভক্ত ও হীনবীর্য্য হইয়া ক্রমশঃ অবনতি লাভ করিব। প্রথমতঃ ধর হিন্দুধর্ম্ম। ইহার মধ্যে এক সহরেই বৈদান্তিক, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্নমতাবলম্বী লোক দেখিতে পাইবে। বৈদান্তিকের মধ্যে আবার কেহ ঘোর অদ্বৈতবাদী, কেহবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। বৈষ্ণবেরা শ্রীমদ্ভাগবতকে অতিশয় সম্মান করেন; শাক্তেরা তন্ত্রকে এবং বৈদান্তিকগণ আচার্য্য শঙ্কর বা রামানুজ প্রণীত নানাগ্রন্থকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তারপর আর এক বিঘ্ন আছে। যদি বল, উপনিষদ্—সকল হিন্দুরই মান্য; সুতরাং উপনিষদ্ পড়াইব। কিন্তু উপনিষদ্ বেদ। আর গোঁড়া হিন্দুদের বিশ্বাস —ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বেদপাঠে অধিকার নাই। এখন তুমি কি তোমার বিদ্যালয়ে উপনিষদ্ পড়াইতে গিয়া শুধু ব্রাহ্মণ ছাত্র লইবে? ইহাতে ত কল্যাণ না হইয়া আরও অকল্যাণ হইবে!

তারপর আর এক কথা। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইবে, অথবা ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি কেবল বুঝাইয়া দেওয়া হইবে? এ সম্বন্ধেও বিভিন্ন বাদীর বিভিন্ন মত। কেহ কেহ অনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম্মের জীবন নাই, এই ধারণায় অনুষ্ঠানের উপদেশশূন্য ধর্ম্মমত শিক্ষার বিরোধী। অপরে আবার ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি শিখাইয়া অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনাপন বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে চলা কর্ত্তব্য, এই মত পোষণ করিয়া থাকেন।

এ ত হল শুধু হিন্দুর কথা। কিন্তু হিন্দুদের স্কুলে আজকাল অনেক মুসলমানও পড়িয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্ম ও অন্যান্য নূতনমতাবলম্বী অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। তাহাদের কি হইবে?

সমস্যা গুরুতর এবং আপত্তিগুলিও সামান্য নহে। এখন দেখা যাউক, এই আপাতবিশৃঙ্খলতার ভিতর কোন সামঞ্জস্যের আশা করা যায় কি না, কোন কার্য্যকর উপায় বাহির হয় কি না।

বাস্তবিকই এই ঘোর মতমতান্তরের কোলাহলের ভিতর আমরা একটী আশাবাণী শুনিতে পাইয়াছি। বাঙ্গালীর মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী ও উপদেশ জানেন না, বোধ হয় এমন লোক খুব কমই আছেন। তাঁহার শিষ্যের ভিতর কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। আমরা এ অবতারবাদ মানি না মানি অথবা বুঝি না বুঝি, যতই আমরা সমাজের আলোচনা করিতেছি এবং যতই উক্ত মহাত্মার জীবনী ও উপদেশ অধ্যয়ন করিতেছি, ততই আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ় হইতেছে যে, অন্যান্য সাধুর ন্যায় রামকৃষ্ণ কেবল নিজে সাধন ভজন করিয়া মুক্ত হইবার জন্য এ ধরাধামে আসেন নাই। তাঁহার জীবনের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় জীবনের বিশেষ নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই ঘোরতর ধর্ম্মবিরোধরূপ কোলাহলের ভিতর তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসাধনার ইতিহাস পাঠ করিলে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইতে হয়। যে সকল ভাব আপাতদৃষ্টিতে এত বিরোধী যে, তাহাদের কেহই কোনরূপ সামঞ্জস্য সাধন করিতে অগ্রসর পর্য্যন্ত হইতে ভীত হন, সেই সকল মত অবলম্বন করিয়া তিনি সেই সেই অনুষ্ঠান নিঃসঙ্কোচে, শুধু তাহাই নহে, পরম শ্রদ্ধার সহিত সাধন করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, হিন্দু প্রতিভার বিশেষত্ব সামঞ্জস্য সাধন। এতদিন যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই উহা অতি বিরোধী মত সকলকে পর্য্যন্ত আপনার করিয়া লইয়াছে। এক এক বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের দ্বারা এই সামঞ্জস্য কার্য্য বিশেষভাবে সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কথিত ভগবদ্গীতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সময়ে সময়ে এই প্রতিভা যেন মলিন হইয়া পড়িয়াছে এবং আজকাল এত মলিন ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, হিন্দু প্রতিভা যে কখনও ঐরূপ সামঞ্জস্যকরী ছিল, তাহা সকলে একেবারে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। এই ঘোর দুর্দ্দিনে রামকৃষ্ণ পরমহংস এই হিন্দু প্রতিভার পূর্ণ অবতার রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া যেন এই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ভারতীয় জাতির একত্ব বিধান করিতেই আসিয়াছিলেন।

এই মহাত্মার জীবনের আলোকে আমরা কি আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য-পথ স্থির করিয়া লইতে পারিব না? আমরা স্বীকার করি যে, পুস্তকপাঠ অপেক্ষা

জীবনের দ্বারাই বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে; আমরা স্বীকার করি যে, ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা আসিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; আমরা স্বীকার করি যে, ধর্ম্মজীবনগঠনে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের উপদেশই অধিক কার্য্যকর; কিন্তু এ সকল স্বীকার করিয়াও আমরা বিদ্যালয়ে লৌকিক বিদ্যার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি।

আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মকে জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বুঝিয়াছেন; অনেকেই বুঝিয়াছেন, ধর্ম্ম কেবল মতমতান্তরের বাদ-বিবাদ নহে, উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তু। বাহ্য জড়বিজ্ঞান যেরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মবিজ্ঞানও তদ্রূপ। যাঁহারা যথার্থ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, তাঁহাদের উপদিষ্ট সত্যে কোন বিবাদ থাকিতে পারে না; বিবাদ কেবল কথায়, বিবাদ কেবল নামে, বিবাদ কেবল বাহিরের ছোবড়া লইয়া। যাঁহারা ধর্ম্মের মর্ম্ম এইরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় কি আমাদের বিদ্যালয়সমূহের ধর্ম্মসম্পর্কহীন শিক্ষায় ব্যথিত হয় না? তাঁহারা কি অন্তরে অন্তরে কামনা করেন না যে, এরূপ একেবারে ধর্ম্ম-ভাববর্জ্জিত শিক্ষা অপেক্ষা বরং সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব শিক্ষাও শ্রেয়ঃ?

কিন্তু আমরা উদার ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তনে কি একেবারে অক্ষম? আমাদের গীতায় সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশমাত্র নাই। উহা এখন সকলেই আদর করিতেছেন। এখনই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গীতার ক্লাস খুলিয়া দিতে কি আপত্তি হইতে পারে? মুসলমানদের জন্য তাঁহাদের কোরাণশিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত যেখানে যেখানে সম্ভব হইবে, সেখানে তুলনায় ধর্ম্ম আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র একটি ক্লাস খুলিয়া তাহাতে ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী যোগদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মালোচনার পক্ষপাতী, তাঁহাদের সম্প্রদায় যদি প্রতিষ্ঠাবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তবে তাঁহারা মিলিয়া তাঁহাদের বালকগণের জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় (Denominational Schools) খুলিয়া তাহাতে সেই সেই বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সহায় না হইয়া আমাদের বিশ্বাস—অসাম্প্রদায়িক ভাবেরই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে; কারণ, সাম্প্রদায়িকতা অজ্ঞানজনিত। শাস্ত্রপাঠ আমরা যত করিব, ততই আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে।

আমাদের বড়াই সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে শাস্ত্রচর্চ্চার অতিশয় অভাব। শাস্ত্রচর্চ্চা না থাকাতেই আমরা আমাদের শ্রুত বা কল্পিত নানা মতকে শাস্ত্রসঙ্গত মনে করিয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু একবার শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ কর দেখি; দেখিবে, তোমার পূর্ব্বের ধারণা যাহা কিছু ছিল, অধিকাংশই ভ্রান্ত। আমাদের দেশে কথকগণ রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির কথা দ্বারা যেমন সাধারণ লোকের হিতসাধন করিতেছেন, তেমনি তাঁহারা কতকগুলি অনিষ্টও করিতেছেন। অনেক সময় লোকের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদের দ্বারা অনেক অশাস্ত্রীয় কথাও প্রচারিত হইতেছে। ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতপাঠী পণ্ডিতগণের মধ্যে কতকটা পাশ্চাত্য আলোক প্রবেশ করে, তবে দেশের কি মঙ্গল সাধন হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না।

যদি ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যুবকগণকে ধৰ্ম্মশিক্ষা দিবার প্রতি আমাদের একবার দৃষ্টি পড়ে, তবে উহার উপায় ক্রমশঃ বাহির হইয়া যাইবে। কোন আদর্শ ধার্ম্মিক ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ধৰ্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। তিনি এমন শিক্ষক সকল বাছিয়া বাছিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন, যাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে ছাত্রগণের জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমরা জানি, এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে এবং উহা কতকটা সফলতাও লাভ করিয়াছে। আরও ঐরূপ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ধৰ্ম্মাত্মা ব্যক্তি মিলিয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া তন্মধ্য হইতে সর্ব্বসাধারণের সম্মত হইতে পারে, এমন কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করুন। হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট আদর্শ চরিত্র আছে, সেই সকল আদর্শ চরিত্র লইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচিত হউক। হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র লইয়া কতকগুলি বালকোপযোগী পুস্তক রচিত হউক। এখন খুব ভাল লোক না পাওয়া যায়, চেষ্টা করিতে করিতে আমরা ভাল লোক পাইব।

কেহ কেহ বলেন, ছাত্রগণের পক্ষে নীতিশিক্ষাই পর্য্যাপ্ত। আমরা এ নীতির অর্থ বুঝিতে পারি না। সদা সত্য কথা কহিবে, আমরা এ নীতি শিখিতেছি; কিন্তু কেন সদা সত্য কহিব, মিথ্যা কহিব না, নীতি আমাদিগকে তাহার বিষয় বড় কিছু বলে না। ধৰ্ম্মানুগত হইলেই নীতির কার্য্যকারী শক্তি প্রকাশ পায় এবং ধৰ্ম্মই সকল নীতির মূলভিত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান ধর্ম্মসম্প্রদায সমূহের এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইঁহাদের সকলের মত ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যদি তাঁহারা হিন্দু বলিযা পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে বেদবেদান্তের দোহাই দিতেই হইবে। ধর্ম্মমত গোপনে না রাখিয়া তাঁহারা ছাত্রগণকে তাঁহাদেরই মতানুযায়ী ধর্ম্মমত সকল বেদবেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া শিখান দেখি। তাহা হইলেই সকল মত পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইবে। ঘরে বন্ধ করিয়া গোপন রাখিলে কোন মতেরই সত্যাসত্য পরীক্ষিত হইবে না। অতএব আসুন সকলে—ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মমতসমূহের সত্যতা ও কর্ম্মজীবনে উহাদের উপযোগিতা প্রমাণ করুন।

এ প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বেদবেদান্তের চর্চ্চা না থাকাতেই আমাদের মধ্যে নানাবিধ বিকট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে পারিয়াছে। সুতরাং বেদবেদান্ত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের বিশেষ উদ্যোগ করা আবশ্যক। বঙ্গদেশে অন্ততঃ একটী বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং রামায়ণ মহাভারত গীতা ভাগবতের ন্যায় বেদ উপনিষদ্ বেদান্তাদির পাঠ হইতে থাকুক। আমরা নিজের ধর্ম্মের কিছু জানি না, অথচ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, এ স্পর্দ্ধা কি আর শোভা পায়? হায়, হায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকে আমাদের বড় বড় পণ্ডিত হইতেও হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন, আর আমরা তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করিয়াও তাঁহাদের ন্যায় এক কণাও জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছি না! কি ঘোর পরিতাপের বিষয়!

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি ছাত্রাবাসসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ছাত্রগণকে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মশিক্ষাদানের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে কিন্তু ইহার জন্য যথার্থ উদার সাধকমণ্ডলীর সাহায্যের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে বুঝাইয়া যাহাতে ছাত্রগণের মনে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনে রুচি হয়, তাহা করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন হইতেই উপলব্ধি করিতেছি। তাই এই প্রসঙ্গের একটু সূত্রপাত হওয়াতেই অসংলগ্ন হইলেও দুই চারিটি মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শীঘ্রই কোন না কোন আকারে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবেশ করিবে। এখন

আমাদের স্বদেশস্থ মনীষিগণের প্রতি বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাদের নিজ নিজ হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত করিয়া প্রকাশ্যে আলোচনা করুন। বর্ত্তমান সমুদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসমূহের মত গৃহীত হউক। সকলে মিলিয়া এই গুরুতর বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করুন।

আমাদের মধ্যে অনেকের ধর্ম্মে প্রবল উদাসীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা খ্রীষ্টমিশনারি বিদ্যালয়গুলি হিন্দু ছাত্রে পূর্ণ দেখা যাইত না অথবা খ্রীষ্টীয় ছাত্রাবাসে হিন্দুছাত্র যাইয়া ক্রমশঃ হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয় সমাজবৃদ্ধির সহায়তা করিত না। পাড়ায় পাড়ায় এখনও খ্রীষ্টিয় মিশনারি প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ও দেখিতে পাইতাম না। ভাই স্বদেশবাসী, আর কতদিন এরূপ ঘুমাইবে? স্বধর্ম্মের আলোচনা শীঘ্র আরম্ভ কর আর ধর্ম্মে উদারতার ভানে এরূপ জড়ভাবকে প্রশ্রয় দিও না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কস্যচিৎ সেবকস্য।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে স্বামী প্রকাশানন্দ গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিতেছেন,—'অক্‌টোবরের শেষে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও আমি ৭টী ছাত্র-ছাত্রী (২টী পুরুষ ও ৫টী স্ত্রীলোক) সঙ্গে লইয়া শান্তি আশ্রমে গিয়াছিলাম। এক্ষণে Lackore নামে একটী এতদ্দেশীয় যুবক ব্রহ্মচারী হইয়া আশ্রমে আছে। সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধান করে।

সানফ্রান্‌সিস্কো হইতে স্যান্‌জোস পর্য্যন্ত রেলওয়ে ট্রেনে এবং তথা হইতে ষ্টেজ কোচে প্রায় ২৭ মাইল পাহাড় চড়াই করিয়া হ্যামিল্টন পর্ব্বতে পৌছান যায়। এখানে বিখ্যাত লিক মানমন্দির অবস্থিত। তথায় দুইটী খুব বড় দূর-বীক্ষণযন্ত্র আছে—একটী ৩৬ ইঞ্চ ও অপরটি ১২ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত। আমি বড়টীর ভিতর দিয়া শনিগ্রহ, উহার বলয় ও উপগ্রহগুলি এবং ছোটটির ভিতর দিয়া চন্দ্র দেখিয়াছিলাম। শনিবারে উহা সাধারণের জন্য খোলা হয় ও জনৈক অধ্যাপক কিম্বা একজন ছাত্র সাধারণকে সব বুঝাইয়া দেন। ইহা ছাড়া এখানে ভূকম্পমান (Seismometer) প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রাদি আছে। হ্যামিল্টন্ পর্ব্বত হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আশ্রমে যাইতে

হয়—প্রায় ২৫ মাইল হইবে। আশ্রমে আমরা এক মাস ছিলাম। প্রত্যহ তিন বার ধ্যান হইত। আশ্রমে ২।৩টী Cabin (তাঁবুর মতন কাষ্ঠের ঘর) ও কতকগুলি তাঁবু আছে। ধ্যানগৃহে, ধ্যান ও পাঠ হইত। প্রাতে ৬টা হইতে ৬॥০টা পর্য্যন্ত ধ্যান ও আধঘণ্টা বিবেকচূড়ামণি ও স্তোত্রাদি পাঠ। আবার ১টা হইতে ১॥০ পর্য্যন্ত ধ্যান এবং আধঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৭॥০ পর্য্যন্ত ধ্যান এবং শ্রীশ্রীকথামৃত (শ্রী ম—কথিত) ব্যাখ্যা হইত। এ তিনটি ধ্যান ও পাঠ (Class) আমিই করিতাম। খুব বাধাবাধি নিয়মে কাজ হইত। কেহ কাহারও ক্যাবিনে বিনা আহ্বানে যাইতে পারিবে না। আহারের সময় ব্যতীত কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতে পারিবে না। সকলকে ঠিক নিয়মিত সময়ে ধ্যান করিতে যাইতে হইবে ইত্যাদি। স্ত্রীলোকেরা দুই জন করিয়া যথাক্রমে রাঁধিবার ভার লইযাছিল, পুরুষগণ জল আনা, কাষ্ঠাহরণ ইত্যাদি বাহিরের কার্য্য করিত। একদিন আশ্রমের সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ের উপর (হ্যামিল্টন পর্ব্বত হইতে উৎরাই করিয়া স্যান এণ্টোন উপত্যকাতে আশ্রম) সমস্ত রাত্রি ধুনি করিয়া জপ, ধ্যান, পাঠ, ভজনাদি হইয়াছিল। আমি কৈবল্যোপনিষদ্, গুরুস্তোত্র, ঠাকুরের স্তোত্র, 'নিবিড় আঁধারে মা তোর, 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা.' 'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি' ইত্যাদি ভজন করিয়াছিলাম। ত্রিগুণাতীত স্বামী মন্ত্র পড়াইয়া ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইলেন। বিল্বপত্রাভাবে কচি চীড় গাছের ছোট ছোট পাতার গুচ্ছ ঘৃত সহযোগে হবিঃরূপে ব্যবহৃত হইল। আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ যে বসিয়া ধ্যানাদি করিবে ও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জপ ধ্যান হোম করিবে, কে জানিত ? সবই ঠাকুর ও স্বামীজীর মহিমা।'

'ডিসেম্বর মাসে বেদান্তসমিতিতে কেবল রবিবাসরীয় বক্তৃতা হয়। ত্রিগুণাতীত স্বামী সান্‌ফ্রান্সিস্কোয় একটী এবং ওকলাণ্ডে একটী প্রতি রবিবার দুটী বক্তৃতা দেন। আমি আশ্রম হইতে আসিয়া লসএঞ্জেলিসে স্বামী সচ্চিদানন্দের নিকট গিয়াছিলাম ও তথায় প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলাম। তিনি সোমবার পাতঞ্জল দর্শন ব্যাখ্যা, বৃহস্পতিবার কেবল ধ্যান এবং ধ্যানের পূর্ব্বে ও পরে ঠাকুরের দুএকটী উক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ও প্রতি রবিবার সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দেন। তিনি বেশ কায করিতেছেন ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছেন।

'জানুয়ারী হইতে এখানে আবার নিয়মিত ক্লাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমি এক্ষণে সোমবার গীতা, বৃহস্পতিবার ধ্যান ও উপনিষদ্ পাঠ এবং রবিবার প্রাতে সর্ব্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা দিতেছি এবং রবিবার ছাড়া প্রত্যহ প্রাতে আধ ঘণ্টা ধ্যান করিতে হয়, ইহাতে সমিতির সভ্যেরা আসিয়া যোগ দান করেন। এই পত্রের সহিত বক্তৃতার একটী তালিকা পাঠাইলাম।'

স্বামী পরমানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে ১০ই ফেব্রুয়ারি জ্ঞানলাভ (Attainment of Wisdon) সম্বন্ধে এবং ১৭ই মুক্তিসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রতি সোমবার তিনি সমিতিতে প্রশ্নোত্তর করিয়া থাকেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীত সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর নিকটস্থ বার্কলি নামক স্থানে একটী হল ভাড়া লইয়া তথায় মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতেই মাসে দুই দিন করিয়া কার্য্য করিতেছেন। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরটী নানাবিধ পুষ্পলতাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। তথাকার জনৈক ছাত্রীর দ্বারা অঙ্কিত একটি সুবৃহৎ তৈলচিত্র মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাতে স্বামী প্রকাশানন্দ ও সায়াহ্নে স্বামী ত্রিগুণাতীত স্তোত্রপাঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করেন।

কলম্বো বিবেকানন্দ সমিতিতে বিগত ১৩ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমিতিগৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। বেদপাঠের পর স্বামীজির জীবনের কয়েকটী বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পঠিত হয়, পরে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও শাস্ত্রপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় সম্প্রতি আমাদের কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ৪৩, টাকা মূল্যের ঔষধদান করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি প্রতিবৎসর উক্ত সেবাশ্রমের জন্য ৮০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস। শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ হইতে গ্র্যাজুয়েট্ ফ্রেণ্ডস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৶০। এইটী একটী ৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ক্ষুদ্র গল্প। গ্রন্থকার তাঁহার জনৈক বন্ধু কর্ত্তৃক তাঁহার এক নাস্তিক বন্ধুকে আস্তিক করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র গল্পটী রচনা করেন। এখন বন্ধুবর্গের অনুরোধে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। লেখাটী নেহাৎ কাঁচা ধরণের; তবে বইখানির ছাপা ও কাগজ খুব ভাল। লেখকের পিতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার পিতার একখানি সুন্দর হাফটোন ছবি এই পুস্তকের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

শ্রীহট্ট জেলার কামারখালে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে নিম্নলিখিত মত চাউল বিতরণ হইয়াছিল। গ্রাম ৩৪, পরিবার ৩৩৩, লোকসংখ্যা ১২০৬, চাউলের পরিমাণ ৪৮ মণ।

এখানে রোগিগণকে রীতিমত ঔষধও দেওয়া হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা লাউ বা বন্য শাক খাইয়া কলেরা বা উদরাময় রোগে ভুগিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেই ঔষধ লইতে আসিয়াছিল। এই ৩৩ জনের মধ্যে ৩২ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে; এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়া কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

পূর্ব্বে স্বীকৃত	৪৯০৪৷৴১০
ডাঃ পি, এন, মুখো কর্ত্তৃক (রায় ভগবান দাস বগলা বাহাদুরের মাড়োয়ারি হাঁসপাতালের ডাক্তার) মাড়োয়ারি ভদ্র মহোদয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত ৪র্থ দফা।	১০১৲
প্রবুদ্ধ ভারত আফিস হইতে প্রাপ্ত	৭৫৲

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস গুপ্ত, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ সমিতি, বরিশাল			৪৲
শ্রীঅভয়পদ হাজরা, ৪র্থ শিক্ষক, সোদপুর স্কুল		...	২৲
শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, কোহাট		...	১০৲
বেহালা হিতকরী সভা	...	...	১০৲
জনৈক মহিলা, শোলাপুর	...	...	১০৲
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা, বারাণসী (২য় দফা)	...	...	২৲
শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, চুনার	...	...	৫৲
শ্রীনদীয়ারচাঁদ পাল, শিলচর	...	...	৫৲

শ্রীসুব্বারাম শাস্ত্রী, মাদুরা নামে ভ্রমবশতঃ ২৫৲ টাকা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার হইয়াছিল সুতরাং ঐ টাকা জমার টাকা হইতে বাদ যাইবে।

সুতরাং উপস্থিত সর্ব্বশুদ্ধ ৫১০৩৷১০

শ্যামা সঙ্গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

তারা পেয়েছি মা ভয়।
আমি ভক্তিহীন, নাহি কোন জ্ঞান,
শমন-ভবন-গমন-বারণ
কারণ-শরণ ও চরণদ্বয়।
যে বলেতে বলী হয়েছিল বলি,
দ্বারের দ্বারী করেছিল বনমালী,
সে বল আমি কোথায় পাব লো করালী,
মনাঞ্জলি পদে দিয়েছি নিশ্চয়।
বিশ্বমাতা তুমি কর যারে ত্যজ্য,
কি ফল তাহার ধন জন রাজ্য,
ত্রিলোকেতে স্থান মিলেনা নির্দ্ধার্য্য,
ধার্য্য তাহার করে রাখ যমালয়।
অনুমানি তব মহিমা কে জানে,
বিধি বিষ্ণু আদি দেব পঞ্চাননে,

বর্ণিতে নাহিকো পারেন বর্ণনে,
কটাক্ষেতে হয় সৃষ্টিস্থিতি লয়।
লক্ষ্মী বলে আয়ুসূর্য্য অস্তপ্রায়,
নিশ্চিন্ত মা তারা রহিলি নিদ্রায়,
জাগরিতা হয়ে সভয়ে অভয়ে,
নিরাশ্রয়ে এখন দে মা পদাশ্রয়।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কত সব গো শিবে শিবমোহিনী।
দেহাগারে মূলাধারে তুমি কুল-কুণ্ডলিনী॥
সংসার মায়াতে মগ্ন, ইষ্ট কার্য্যে সদা বিঘ্ন,
কবে যাবে এ উদ্বিগ্ন, তুমি বিঘ্ন-বিনাশিনী॥
ধরাতে হয়ে পতিত, আছি মা হয়ে পতিত,
হতেছে মা কালাতীত, তুমি পতিত-পাবনী॥
তিমির করিতে নাশ, বারেক হও মা সুপ্রকাশ,
তবে কাটে কালের ফাঁস, তুমি কাল-বারিণী॥
ভ্রমিয়ে ষট্ কমলে, চল মা সহস্র-দলে,
পরম শিবসহ মিলে, লক্ষ্মীরে তার তারিণী॥

ঝিঁঝিট একতালা।

আয় মা রণরঙ্গিনী।

আমি অভাজন, লয়েছি শরণ,
মম হৃদি পদ্মে, দিয়ে পাদপদ্ম,
থাক বসে ওগো পদ্মবিলাসিনী॥
ঘরে বসে আমার সকল তীর্থ হবে, রসনাতে কালীনাম রটিবে,
নামামৃত পানে ভবক্ষুধা যাবে, পারের তরি হবে চরণদুখানি॥
অসাধ্য হল মা ছ'জন বাধ্য করা, বিষয়-মদ পানে সদা মাতোয়ারা,
ইষ্ট কার্য্য নষ্ট করে তারা তারা, তব সব খেলা জানিগো জননী॥
লক্ষ্মীরে রক্ষ মা ত্রৈলোক্যতারিণী, পতিতে পার কর পতিত পাবনী,
শমন-ভীষণ-শাসন-বারিণী. দেখা দিও যবে হারাব প্রাণী॥

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্‌।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণদেব শম্ভুচরণ মল্লিকের নিকট বাইবেলের যীশুতত্ত্ব শ্রবণ করিতেন। শম্ভুচরণ জাতিতে সুবর্ণবণিক ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। রাসমণির দেবালয়ের নিকট তাঁহার একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। কার্য্য হইতে অবসর পাইলে তিনি এই উদ্যানে আসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণদেবকে তথায় লইয়া গিয়া অতি যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। ক্রমে তাঁহার রামকৃষ্ণদেবের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। একদিবস শম্ভু একটী বেদানার অর্দ্ধেক আপনি খাইয়া উচ্ছিষ্ট অপর অর্দ্ধেক রামকৃষ্ণদেবকে দিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব গাহিতে লাগিলেন,——

"আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, কল্পতরু হৃদয়ে রোপিয়ে॥
শ্রীরাম কল্পতরু মূলে রই যে ফল বাঞ্ছা করি সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, এ ফলের গ্রাহক নই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥

শম্ভু গান শুনিয়া আপনার হীন বুদ্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের পেটের পীড়া অদ্যাপি সারে নাই, শরীর অতিশয় শীর্ণ। শম্ভুচরণ এজন্য তাঁহাকে আপনার উদ্যানে লইয়া গিয়া একটু একটু অহিফেন সেবন করাইতেন। দিন কয়েক এইরূপ করিলে পর রোগের কিছু উপশম হইল। একদিন শম্ভুর উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন কালে এক বিন্দু অহিফেন সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য শম্ভু তাঁহাকে অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কহিলেন, "সঞ্চয় করিতে পারি নি। একবার একটা আঁব গাছতলায় গোটাকতক আঁব পড়েছিল। মনে করলুম, নিয়ে ঘরে রেখে দি, কারুকে দিলেও ত চলবে। আঁব হাতে করা আর চথে দেখতে পাইনি, ক্রমাগতই ঘুরচি, ঘরে যাবার পথ আর পাইনি। শেষে আঁবগুলো ফেলে দিলুম। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।" শম্ভুর কিন্তু একথা বিশ্বাস হইল না। তিনি পরীক্ষার জন্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটু

অহিফেন কাগজে মুড়িয়া তাঁহার কাপড়ের এক কোণে বন্ধন করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু ঐ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিয়া কোন পথ দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। শম্ভু নিকটে আসিয়া তাঁহার মুখ অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন, স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, যেন সংজ্ঞা নাই। নিশীথে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে গিয়া বালকের বদনে যেপ্রকার কষ্টের লক্ষণ সমূহ দেখা যায়, শম্ভু তাঁহার মুখে তদ্রূপ কাতর ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বস্ত্র হইতে সেই অহিফেন খুলিয়া লইলেন। তখন তিনি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব সহজভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং কহিতেছেন, "কি খুলে নিলে? একটু আপিন বেধে দিয়েছিলে বুঝি?" শম্ভুচরণ অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

কলিকাতার নিকট ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে ঘুষড়িতে নেপালের মহারাজার শালকাষ্ঠের একটী বৃহৎ কারবার ছিল। নেপালনিবাসী কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় সেই ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বংশ পরম্পরায় ইঁহারা মহাবীর এবং মহাভক্তিমান্। বিশ্বনাথ পণ্ডিত লোক, বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার বড়ই প্রীতি, পূজা এবং স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া শিবনেত্র হইত, এবং ঐ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াই পূজা করিতেছেন। এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ এক দিবস স্বপ্নে দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডলী মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার মন প্রাণ পরমার্থ লাভের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। কখন ইচ্ছা হইত, কোন উপায়ে আবার সেই স্বপ্ন দেখেন, কখন ভাবিতেন, মহাপুরুষ স্বপ্নরাজ্যে দেখা দিয়াছেন, বাস্তব জগতে কি দেখা দিবেন না? আবার কখন বা ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি লোকমুখে শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি ভগবৎপ্রেমে দিবানিশি উন্মত্ত, কখন হাসেন কখন কাঁদেন কখন নাচেন কখন গান করেন, আর মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হন। ভগবৎ-কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা তাঁহার সহিত চলে না। জ্ঞান-পিপাসু বিশ্বনাথ আর বিলম্ব না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। দেখিলেন,

তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রামকৃষ্ণদেবই তাঁহার সেই স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্থ অপূর্ব্ব মহাপুরুষ। বিশ্বনাথ আনন্দে বিভোর হইলেন এবং অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইয়া গেল। রামকৃষ্ণদেবও বিশ্বনাথকে পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। তদবধি বিশ্বনাথ প্রায় প্রত্যহই নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার দিব্যজ্ঞানদাতার দর্শন করিতেন।

কর্ণেল বিশ্বনাথকে রামকৃষ্ণদেব বিশেষ ভালবাসিতেন এবং কাপ্তেন বলিয়া ডাকিতেন। একদিন কথায় কথায় কাপ্তেন বলিলেন, প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী নামে একজন সন্ন্যাসী আছেন এবং বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারও ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। কাপ্তেন তাঁহাকে আপনার গাড়ীতে লইয়া তখনি পাথুরিয়াঘাটা যাত্রা করিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটের দক্ষিণাংশটী পর্দ্দাদ্বারা ঘেরিয়া তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ রাত্রিবাস করিতেন এবং প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কলিকাতার পূর্ব্বে নূতন খাল পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে নিভৃতে শৌচে যাইতেন এবং তথায় তিন চারিঘণ্টা অতীত করিয়া তৎপরে একটী উদ্যানের পুষ্করিণীতে আরও তিন চারি ঘণ্টা কাল অবগাহন স্নান করিতেন। বেলা চারিটার পর তথা হইতে গমন করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় ভাগীরথীতীরে আসিয়া তিন চারিঘণ্টা ভোজন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে তাঁহার দুই একজন শিষ্য শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। রামকৃষ্ণদেব কাপ্তেনের সহিত তথায় উপস্থিত হ'লে, ব্রহ্মানন্দ 'আমি খড়ম পায় দিয়ে দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ দূরে শৌচে যাই, সন্ধ্যের পর একবার মাত্র সৈ দৈ সন্দেশ খাই, বিশ পঁচিশটা ডাব খাই, ইত্যাদি নানা প্রকার আত্মশ্লাঘা করিয়া তখনি অন্যত্র উঠিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেবও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা গাড়িতে উঠিলে পর কাপ্তেন প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, কেমন দেখলেন ?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "এর কিছু সিদ্ধাই আছে, কিন্তু তা হ'লে কি হবে ? ঈশ্বরে একেবারে বৈমুখ !"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসিলেন, "কেন বাবা ঈশ্বরে বৈমুখ ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মা কোন ছেলেকে একটা রাঙ্গা খ্যালনা, কোন ছেলেকে মেঠাই, এই রকম নানা জিনিষ দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। যে ছেলে

সেই সব জিনিষে আর ভোলে না, ক্রমাগত মা মা করে কাঁদতে থাকে, তাকে মা কোলে করেন। ও একটা সিদ্ধাই পেয়ে ভুলে আছে। আর সিদ্ধাই আর শক্তি পেলেই তাঁকে ভুলে যেতেই হয়। ওটাও সেই মহামায়ার মায়া কিনা।"

ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বদা আত্মগরিমা ও আপনার সিদ্ধাইয়ের কথাই কহিতেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে পিশাচসিদ্ধ বলিয়া জানিতেন এবং সেই কারণেই বোধ হয় তিনি সর্ব্বসাধারণে ভূতানন্দ বলিয়া অভিহিত ছিলেন।

দিন দিন দক্ষিণেশ্বরে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে, যিনি একবার রামকৃষ্ণদেবের সহিত আলাপ করেন, তাহার মন প্রান বিমোহিত হয় এবং তিনি পুনরায় তাঁহাকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না। দক্ষিণেশ্বর-নিবাসিগণ কিন্তু এখনও তাঁহাকে সেই পাগল মনে করিতেছেন, কারণ তিনি পূর্ব্ববৎ কখন গভীর সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন, তখন হয়ত দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন, কখন বা আপন মনে শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতেছেন আর দুইচক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। আবার কখন বা আপনার গ্রাম্য ভাষায় গভীরতত্ত্বকথায় সমবেত লোকদিগের হৃদয় মধ্যে ভগবদ্ভক্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এইভাবে দিন যাইতেছে ইতিমধ্যে একদিন মথুরানাথ আসিয়া তাঁহাকে নানা কথার পর কহিলেন, "দেখ বাবা, আমি ত কবে আছি কবে নেই। তা মনে কচ্ছি তোমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার কাগজ করে দি।"

রামকৃষ্ণদেব শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কেন? টাকা কি হবে? আমার মা কালী আছেন। টাকা কড়ির দরকার নেই।"

মথুর কহিলেন, "কি জান বাবা, আমার ছেলেদের বড় বিশ্বাস করিনি; তোমার সেবা ত চাই। তা আমি তোমার নামে কোম্পানির কাগজ করে দাওয়ানজীর কাছে রেখে দেব। তোমায় তার জন্য কোন বেগ কি হাঙ্গাম পোহাতে হবে না।

রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন, "আরে বাবু, তুমি ত বল্লে কোন বেগ পোহাতে হবে না, কোন হ্যাঙ্গাম হবে না। আমি ত জানব যে, আমার টাকা আছে, আমি এতটাকার মালিক, তা তুমি দাওয়ানজির কাছেই রাখ আর যেখানেই রাখ, মনে একটা দাগ পড়ে যাবে ত। শুধু তাই নয়, মার উপর বিশ্বাস কম হয়ে যাবে, আবার হয়ত ঐ টাকার জন্য ফিরে জন্ম নিতে হবে।

ও বড় বালাই। যাগ্, তুমি ও সব কথা মুখে এন না। আমার ভাবনা কিসের? মা কালী আছেন, তাঁর কাছে আমার কোনই অভাব নেই।" এই বলিয়া সেইস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, যেন সঞ্চয়ের কথায় তথাকার বায়ুও দূষিত হইয়াছে। মথুরানাথও বুঝিলেন যে, এ প্রস্তাবে তিনি রামকৃষ্ণদেবকে কোন প্রকারেই সম্মত করিতে পারিবেন না, ইহা স্থির করিয়া তিনি আর কখনও ঐ বিষয়ে কোন কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু ভাবিলেন, "বাবার মাকে যদি কিছু দিতে পারি তা হলেও আমার মনে সন্তোষ হয়।" রামকৃষ্ণদেবের মাতাঠাকুরাণীর নিকট গমন করিয়া মথুরানাথ কহিলেন, "আপনার কি অভাব আছে, আমায় বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার অভাব মোচন করিতে চেষ্টা পাব।"

চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "আমার কোন অভাব নেই বাবা। আমি গঙ্গাস্নান করছি, মা কালীর প্রসাদ পাচ্ছি, গঙ্গার তীরে দেবালয়ে বাস করছি, আর আমার কি চাই? কিছুই ত চাইনি বাবা, আমার আর কোনই অভাব নেই।"

মথুরানাথ দেখিলেন, এ প্রকারে বৃদ্ধাকে কিছু গ্রহণ করাইতে পারিবেন না। ভাবিলেন, জিদ করিলে হয়ত আমার আব্দার রক্ষার জন্যও কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারেন। কহিলেন, আমি তা বলছিনি। আমার বড় ইচ্ছে যে, আমি আপনাকে কিছু দিই। তাই বলছি, আপনি কি নেবেন বলুন।"

চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "কি নেব বাবা, আমার ত কোন জিনিসের দরকার নেই।"

মথুরানাথ বলিলেন, "তা হবে না ঠাকুরমা, আপনাকে কিছু নিতেই হবে; আপনি কিছু নিলে আমার জন্ম সার্থক হবে। তাই বলছি, আপনাকে কি দেব বলুন?"

চন্দ্রাদেবী মথুরের কাতরতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "আচ্ছা তবে তুমি আমার এক পয়সার দোক্তা কিনে দিও।" চন্দ্রাদেবী তাম্বুলের সহিত দোক্তা ব্যবহার করিতেন।

মথুর ভাবিতেছিলেন, চন্দ্রাদেবী হয়ত বলিবেন, "আচ্ছা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই দিও।" কিন্তু তাঁহার মুখে বিপরীত কথা শ্রবণে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "তা না হলে কি ভগবানকে পেটে ধরতে পারেন!"

তীর্থ হইতে আসিয়া আজ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু পেটের পীড়ার জন্য রামকৃষ্ণদেবের শরীর এখন অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল তত্রাপি কোন ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির নাম শ্রবণ করিলেই স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কেশব এখন একজন মান্যগণ্য লোক, বহুস্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ধর্ম্মবিষয়ে একজন নেতা হইয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মুখে কেশবের সুখ্যাতি শুনিয়া রামকৃষ্ণদেবের কেশবকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কাপ্তেনের গাড়ীতে বেলঘরিয়ার একটী উদ্যানে গেলেন। কেশব এই সময় সশিষ্যে সেই উদ্যানে ছিলেন। গাড়ীতে উঠিবার অগ্রেই ভাবাবিষ্ট হইয়া মা কালীকে বলিতে লাগিলেন, "মা যাবি? কেশবকে দেখতে যাবি?" এইরূপ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আপনিই উত্তর করিলেন, "যাব।" গাড়ীতে বসিয়াও ভাবাবস্থায় মা কালীর সহিত কতই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বেলঘরিয়ার উদ্যানে উপনীত হইলে প্রথমে হৃদয় নামিয়া কেশবের নিকটে গেলেন। কেশব তখন তাঁহার অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। হৃদয় তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমার মাতুল হরিপ্রসঙ্গ শুন্‌তে বড় ভালবাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হয়। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বর-গুণানুকীর্ত্তন শুন্‌তে এসেছেন।"

কেশব কহিলেন, "আচ্ছা, তাঁকে, আনুন।"

রামকৃষ্ণদেব ভাবের ঘোরে ছিলেন, হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া আনয়ন করিলেন। একে তাঁহার শরীর কৃশ, তদুপরি পরিধানে কেবল একখানি সামান্য লালপেড়ে কাপড়, কোঁচার খুঁটটী স্কন্ধে ফেলা। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমেই অনুমান করিলেন, কে একজন সামান্য লোক। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "বাপু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করে থাক? সে কিরকম দর্শন তাই জান্‌তে এসেছি।" এই বলিয়া সেই অল্প ঘোরের অবস্থাতেই স্বয়ং ঈশ্বর প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরদর্শন কি প্রকার কথঞ্চিৎ বলিয়া গাইতে লাগিলেন, "কে জানে কালী কেমন" ইত্যাদি। তাঁহার গান শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত। সে বিশুদ্ধ ভাব, প্রেমানন্দ বিকশিত অঙ্গকান্তি, এবং সে প্রাণস্পর্শী মধুর কণ্ঠধ্বনি, কেশব দেখিলেন অতুলনীয় এবং

প্রাণে পরমানন্দ বরিষণ করিতেছে। গানটী গাইতে গাইতে তিনি ক্রমে সমাধিস্থ হইলেন। স্পন্দহীন দেহ, স্থির দৃষ্টি, অপূর্ব্ব হাস্যব্যঞ্জক বদন, প্রেমাশ্রুবিগলিত রক্তাভ নয়ন—মূর্ত্তি দেখিয়াই সকলে স্তম্ভিত। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কেহই সমাধি দেখেন নাই, এমন কি, ভাব কাহাকে বলে তাহাও জানেন না। হৃদয় রামকৃষ্ণদেবের কর্ণে ক্রমাগত প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং সকলকে ঐরূপ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এ আবার কি ভেল্‌কী? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শেষে ব্যাপার কি হয় দেখিবার জন্য হৃদয় যাহা বলিলেন, তাহাই করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া উঠিলেন, এবং সেই ভাবাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ, একটা গাছে একটা বহুরূপী ছিল। একজন তাকে দেখে এসে বল্‌লে, সেটা লাল। আর একজন দেখে এসে বল্লে সেটা সবুজ। আর একজন বল্লে, না, সেটা হল্‌দে। আর একজন বল্লে তা নয় সেটা নীল। মহা তর্ক লেগে গেল। শেষে সকলে মিলে সেই গাছতলায় যে একজন লোক থাকত তাকে জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্লে, "তোমাদের সকলকারই ঠিক কথা। ওটা বহুরূপী; কখন লাল কখন সবুজ কখন হল্‌দে কখন নীল।—ঈশ্বর সেই রকম। তাঁর অনন্তরূপ, যে সাধক যেরূপ দেখেছে, সে জানে তিনি বহুরূপী। তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আবার আরও কত আকার আছে, তা কে বল্‌তে পারে?"

"পাঁচ জন অন্ধ হাতী দেখতে গেছ্‌ল। চোকে ত দেখতে পায় না, হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এল। কেউ শুঁড় দেখলে, কেউ পা দেখলে, কেউ পেট দেখলে। দেখে এসে তাদের মধ্যে মহা ঝগড়া বেঁধে গেল। কেউ বলে, হাতী জলের জালার মত, কেউ বলে, না, হাতী থামের মত, কেউ বলে কুলোর মত—মহা বিবাদ। গোলমাল শুনে একজন জিজ্ঞাসা কল্লে, কিসের ঝগড়া? সবাই বুঝিয়ে বল্লে। তখন সে বল্লে, "বাপু, তোমরা কেউ হাতী দেখনি, কেউ তার পেট্‌টা কেউ পাটা কেউ শুঁড়টা কেউ কানটা মাত্র দেখেছ। ঐ সমস্ত গুলো একত্র কল্লে যাহা হয় তাই হাতী। ঐ রকম সচ্চিদানন্দের একটু সামান্য অংশ দেখে লোকে মহা-ঝগড়া করে।"

"একটা ডেও পিঁপ্‌ড়ে চিনির পাহাড়ে গেছ্‌ল। একটা দানা মুখে

করে পগাল্‌, আর সেইটে খেয়েই ঢেউ ঢেউ। আর শক্তি কোথা যে থাবে? সেই রকম ভগবান্‌কে জেনে কে শেষ করতে পারে? আবার তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে জানবার যোটী নেই।”

রামকৃষ্ণদেব এইরূপে ভাবের অবস্থায় সামান্য সামান্যকথায় গভীর তত্ত্ব সকল বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা নাকি শক্তি মান না?” এবং তৎপরক্ষণেই ঈষৎ হাসিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “শক্তি না জানলে ব্রহ্ম জানবার যো নেই, সে যে অভেদ। যেমন আগুন আর দাহিকা শক্তি। একটা ভাবলে আর একটা ভাবতেই হয়। মণি আর তার আভা। একটা ছেড়ে আর একটা ভাবা যায়না। যেমন সূর্য্যের উত্তাপ ছেড়ে কি সূর্য্য ভাবা যায়? তেমনি ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি অভেদ। সৃষ্টির বিকাশ যখন করেন, তখন তাঁকে শক্তি ভাবা যায়—আদ্যাশক্তি মা আনন্দময়ী আবার যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম।

“তা সেই সচ্চিদানন্দময়ীকে মা আনন্দময়ী, মা কালী, মা দুর্গা, ভক্তের যার যেমন ইচ্ছে তাই বলে ডাকে। একটা জলাশয়, তার অনেকগুলো ঘাট আছে। একঘাটে হিন্দু জল খাচ্ছে। আর একঘাটে মুসলমান জল খাচ্ছে, আর এক ঘাটে কৃশ্চান জল খাচ্ছে। সেই একজলই সবাই খাচ্ছে, নাম দিচ্ছে—জল, পানি, ওয়াটার।

“সোলার আতা দেখেছ?”

কেশব উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে হাঁ।”

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “সেই সোলার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, তেমনি মাটীর মা কালী দেখলে ভক্তের মনে আসল মা কালীর, মা আনন্দময়ীর উদয় হয়।”

সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার আনন্দমাখা মুখের প্রতি তাকাইয়া অপূর্ব্ব সারগর্ভ কথাসকল শুনিতেছেন। তাঁহারা সকলে কি রকম ঈশ্বর দর্শন করেন জানিতে আসিয়া, ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে তিনি নিজেই যাহা জানাইয়া দিলেন, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য। কেশব ভাবিলেন, “ইনি ত দেখছি ঈশ্বর জানা লোক, ইনি ত যে সে নন!” যাহা হউক, একদিকে রামকৃষ্ণ-প্রমুখাৎ অবিরাম প্রাণসঞ্চারিণী-তত্ত্ব-প্রবাহ চলিতেছে, অপরদিকে বহুলোক-সম্মানিত নবীন-ব্রাহ্ম-সমাজ-নেতা কেশব আপনার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সেই অমিয়প্রবাহের কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বিনীত ও সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া

আছেন। সেদিন সকলে উপাসনা ভুলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু অপার আনন্দে মগ্ন।

অতঃপর রামকৃষ্ণদেব কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার ল্যাজ খোসেছে।" এই কথা শুনিয়া কেশবের অনুচরগণ কিছু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। কেশব তাঁহাদের কহিলেন, "তোমরা অমন করে হাস কেন, একথার অবশ্য কোন গূঢ় অর্থ আছে। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, উনি বুঝিয়ে বলবেন।"

রামকৃষ্ণদেব বুঝাইয়া কহিলেন," দেখ, যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে। তার পর ল্যাজ খোসে গেলে সে জলে থাকতে পারে আবার ডাঙ্গায়ও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের যত দিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। তা তোমার সে অবিদ্যারূপ ল্যাজ খোসেছে। এখন মনে করে সংসারেও থাক্‌তে পার আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পার।" এই সামান্য উপমাটীর মধ্যে এত গভীর তত্ত্ব নিহিত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। এই আলাপের পর কেশবের মন রামকৃষ্ণদেবের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেই সময় হইতে তিনি প্রায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, সময়ে সময়ে অতি যত্ন করিয়া তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইয়া যাইতেন, এবং প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের পরদিন সদলবলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ষ্টীমার যোগে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করা তাঁহাদের সেই সাম্বৎসরিক উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিতেন।

একদিন রামকৃষ্ণদেব মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা, চৈতন্য-দেবের সংকীর্ত্তনে লোকে কি রকম মাতামাতি করত, আমায় দেখিয়ে দে মা।" এইরূপ প্রার্থনার অল্প পরে হৃদয় আপনার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক কিছু দিনের জন্য বাটী যাইয়া বাস করিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কার্য্যে অবসর লইয়া বাটীতে যাইয়া বাস করিতেন। কিন্তু যখন তথায় যাইতেন, আপনার প্রাণসম রামকৃষ্ণদেবকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কারণ, একাকী বাটী চলিয়া গেলে তাঁহার অবর্ত্তমানে রামকৃষ্ণদেবের সেবার ত্রুটি হইতে পারে। এইবারও বাটী যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, রামকৃষ্ণদেবও সম্মত হইলেন।

যে দিবস তাঁহারা সিহোড়ে উপস্থিত হইলেন, সেইদিন হইতেই তথায় জনতা আরম্ভ হইল। সিহোড়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ নানা গ্রামের ভদ্রলোক সকল আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তৎপরদিন হইতে অসংখ্য কীর্ত্তনের দল আসিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহারা একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করেন, তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপে প্রতিদিনই জনতা বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহারা প্রতিদিনই কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে এক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সিহোড় গ্রামের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে আপনার গুরুবৎ জ্ঞান করিতেন আবার কেহ বা তাঁহার মধ্যে নিজ ইষ্ট-দেবতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে আপনাপন ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিতেন।

নটবর গোস্বামী রামকৃষ্ণদেবকে আপনার ইষ্টদেবতার স্বরূপ মনে করিতেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থিতি কালে স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বেদান্ত সম্বন্ধে বিচার হয়। পণ্ডিতগণ তাঁহার সরল উদাহরণ ও উপমায় কঠিন সমস্যা সকল পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নটবর গোস্বামীর পত্নী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন; রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী।" ইঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। যাহা হউক এইখানেও সেইরূপ প্রতিদিন অসীম জনতা এবং অসংখ্য কীর্ত্তনের দল আসিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইত। ক্রমেই লোকের মধ্যে সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বেগ বাড়িতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ভদ্রলোক সকল অতি সমাদর পূর্ব্বক নিজ নিজ গ্রামে তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিতে লাগিলেন। সিহোড়ের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে ফুলুই শ্যামবাজার গ্রামের ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া একদিন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের প্রারম্ভেই রামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্য হারাইতে লাগিলেন। কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, যেন সর্ব্বাঙ্গ অস্থিহীন—তাঁহার দেহসরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-প্রলয়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখন বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ,

স্থিরনেত্রে দরদর ধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে। অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন। গ্রামগ্রামান্তরের ইতর লোকে বলিতে লাগিল, "শ্যামবাজারে একজন লোক এসেছে, সে কীর্ত্তন করতে করতে দিনে সাতবার মরে যাচ্ছে আবার বেঁচে উঠ্‌ছে।" ক্রমেই আনন্দের প্রবাহ দিগ্‌দিগন্ত ছাইল, সহস্র সহস্র লোক মিলিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভাবে কেহ গাহিতেছেন, কেহ নৃত্য করিতেছেন, কেহ বা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। দূরাৎসমাগত ব্যক্তিগণ যাঁহারা কখনও রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার মানসে কেহ কুটীরের চালের উপর হইতে কেহ বা বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। সকলেই চিত্রাপিতের ন্যায় একদৃষ্টে সেই আনন্দমূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন। যাঁহারা কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন, সকলেই আনন্দে বিভোর, তিলার্দ্ধ বাহ্যজ্ঞান নাই। গ্রামের মহিলাগণ পর্য্যন্ত কেহ বা শঙ্খ লইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন কেহ বা উলুধ্বনি করিতেছেন, আবার কেহ বা তাঁহার দর্শন মানসে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখায় উঠিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন। অমনি পুনরায় শঙ্খ কাঁশর ঘণ্টার রবে আনন্দের তরঙ্গ আরও হুহুঙ্কারের সহিত মাতিয়া উঠিল। কীর্ত্তনের মধ্যস্থিত সহস্র সহস্র লোক সকলেই আত্মহারা, প্রেমের বন্যায় ভাসমান। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাপি কাহারও জ্ঞান নাই। পুনরায় রাত্রি আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইল। এইরূপে তিন দিন অতীত হইলে রামকৃষ্ণদেব ভাব সম্বরণ করিয়া অজ্ঞাতসারে তথা হইতে একেবারে সিহোড়ে চলিয়া আসিলেন। তিনি চলিয়া আসিলে পর সকলে যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

রামকৃষ্ণদেব তথা হইতে কামারপুকুরে আসিলেন এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া সেখান হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভগ্নীর বাটীতে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগ্নী তামাক সাজিয়া তাঁহার স্বামীকে দিতে যাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার ভগ্নীর পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ দৃশ্যটী এত সুন্দর রূপে আঁকিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন, যে সকলে দেখিয়া তাঁহার ভগ্নীও

ভগ্নীপতিকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং ভগ্নীর হুঁকাটী বহন করিবার ভাব দেখিয়া পতীভক্তির আদর্শ স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ব্রহ্মবাদিন্ একখানি বেদান্ত বিষয়ক সুপরিচালিত ইংরাজী মাসিক। মান্দ্রাজ হইতে এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

তারিখ ৮ই আগষ্ট, ৯'৬।

প্রিয়——

তোমায় কয়েক দিন পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমায় জানাইতেছি যে, আমি ব্রহ্মবাদিনের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে পারিব, তাহাতে তুমি নিজে স্বাধীন হইয়া ব্রহ্মবাদিনের জন্য কার্য্য করিতে ও উহাকে ভাল করিয়া দাঁড় করাইতে পারিবে।—এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলিয়া উহার মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তাহা হইলে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে যে মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহাতে ভাল ভাল লেখককে টাকা দিয়া উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই ব্রহ্মবাদিনে যে যে, লেখা বাহির হইবে, তাহা যে সকলকে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতা প্রণোদিত হইয়াও পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য সকলের ইহার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দুগণকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি।

কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক——

১। হিসাব পত্র সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—অবশ্য আমার মনে একথা স্থান পায় না যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কখন অসচ্চরিত্র হইয়া দাঁড়াইবে; আমার এ কথা বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য যে, আমরা হিন্দুগণ কাজকর্ম্ম ও হিসাব পত্র বড় নেতাজোবড়া রাখিতে ভালবাসি। হয় তো কোন বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের খরচের জন্য লাগাইয়া উহা শীঘ্রই শুধিয়া দিব—মনে করা দস্তুর মত সব জিনিসের ঠিক ঠিক হিসাব না রাখা ইত্যাদি।

২। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ দৃঢ়নিষ্ঠা। তোমায় জানিতে হইবে যে, ব্রহ্মবাদিনটীকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, উহা তোমার ইষ্ট দেবতার স্বরূপ হউক; তাহাহইলে দেখিবে, সব

সুবিধা হইয়া যাইবে। আমি ইতিপূর্ব্বেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি * * * মনে রাখিও—সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা এবং গুরুর একান্ত আজ্ঞাবহতা সকল সিদ্ধির মূল।

দুই বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিনটিকে এইরূপ দাঁড় করাইব যে, উহার আয় হইতেই উহার খরচ চলিয়া যাইবে; শুধু তাহা নহে, উহা হইতে স্বতন্ত্র একটা আয়ও দাঁড়াইবে। বিদেশে ধর্ম্মপত্রিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব সুতরাং হিন্দুগণকে উহার পৃষ্ঠপোষক হইতে হইবে। আর যদি তাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে উহারা নিশ্চয়ই ইহা করিবে।

ভাল কথা, এ্যানি বেশান্ত একদিন আমাকে তাঁহাদের সমিতিতে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি এক রাত্রি বক্তৃতা দিই—কর্ণেল অলকটও উপস্থিত ছিলেন। সকলের সহিতই যে আমার সহানুভূতি আছে, ইহা দেখাইবার জন্যই আমি এইরূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু, আমি কোনও পাগলামিতে যোগ দিব না। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলিও, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা জগতের শিক্ষক—ফিরিঙ্গিরা নহে। ইহলোকের বিষয়ে অবশ্য তাহাদের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাকসমুলারের প্রবন্ধ পড়িলাম। ৬ মাস পূর্ব্বে যখন তিনি উহা লিখেন, তখন তাঁহার নিকট প্রতাপ মজুমদারের ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া লিখিবার আর কোন উপাদান ছিল না; সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধটি ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। সম্প্রতি তিনি আমাকে একখানি সুন্দর সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়া আমার নিকট সেই গ্রন্থের উপাদান চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে কতকটা দিয়াছি, ভারত হইতে আরও পাঠাইতে হইবে। কায করিয়া যাও। লাগিয়া থাক, সাহসী হও, ভরসা করিয়া সব বিষয়ে লাগো। ব্রহ্মচর্য্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; তোমার ত যথেষ্ট ছেলেপুলে আছে, আর কেন? এই সংসারটা কেবল দুঃখময়। কি বল?

ইতি তোমারই
বিবেকানন্দ।

উন্নতির উপায়।

অনেকেরই মনে অজ্ঞাতসারে একটা ভাব আছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার, উন্নতি করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে—এই প্রণালীটী কোন প্রকারে জানিতে পারিলেই মানুষ উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে। এই প্রণালীটী জানিবার জন্য মানুষ কতই না চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহার ফলে কতই না বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সকলেই সমগ্র জগৎকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর সহায়ে উন্নতির চরম সীমায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কতই না প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। মানবজীবনের কতই সমস্যা মানুষের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার কতপ্রকার বিচিত্র সমাধানও মানবসমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। জগতের বর্ত্তমান কালেও আমরা কত কত সম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত লইলাম এবং কতপ্রকার কথাই না শুনিলাম। অহরহঃ কত কথাই না শুনিতেছি এবং কতই না নূতন মতের অভ্যুত্থান দর্শনে কখন বা আশান্বিত, কখন বা ভীত হইতেছি।

একপ্রকার চিন্তাপ্রণালী আছে—তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতগুলিকে বৃথা বলিয়া উল্লেখ করিয়া নবোদ্ভাবিত প্রণালীবিশেষকে সকল সমস্যার মীমাংসক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কেহ কেহ আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রণালীগুলির আংশিক সত্যতা স্বীকার করিয়া নিজ মতকেই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ভাল বাসেন। আমিও যে এবিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত দোষ হইতে মুক্ত হইব, এ স্পর্দ্ধা রাখি না। আমি শিষ্য ও ছাত্র—আমার কার্য্য আলোচনা করা মাত্র— নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার বা প্রচার করা নহে।

বস্তুতঃ নূতন কথাটীই আমার নিকট কেমন নূতন নূতন ঠেকে। আমি দেখিতেছি, জগতে নূতন কিছুই নহে। আমি দেখিতেছি, সেই এক পুরাতন বাণীই নূতন নূতন আকারে প্রকাশ হইতেছে। আমি আশা করি যে জগৎ কোন দিন স্বর্গরাজ্যে পরিণীত হইবে। কিন্তু আশা না রাখিলেও আমি কার্য্য হইতে বিরত নহি। কারণ, কার্য্যই জীবন। নূতন কিছু না

থাকিলেও পুরাতনের নূতন করিয়া উপলব্ধি আছে। সেই উপলব্ধিতে আশা আছে, বিশ্বাস আছে, জীবন আছে, আলো আছে, অমৃত আছে।

তাই আজি যাহা লইয়া হে পাঠক, তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, তাহাও একটা সামান্য পুরাতন কথা—কিন্তু ঐ পুরাতন কথা আমার প্রাণে নূতন করিয়া জাগিয়াছে—আমি ইহাতে আশাবাণী পাইয়াছি। যদি কেহ উহা গ্রহণ করিতে পারে, আমার বিশ্বাস—সেও বল পাইবে।

কথাটী কি? কথাটী এই—জগতের উন্নতির নূতন প্রণালী কিছুই নাই। প্রকৃত প্রণালীটী সনাতন—সৃষ্টির মত অনাদি অনন্ত। চেষ্টা কর। যাহা লাভ করিতে চাহিতেছ, তাহার জন্য উদ্যম কর আর তোমার বুদ্ধি—উহা যতই ক্ষুদ্র হউক, লোকে উহাকে যতই ছোট বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করুক—তুমি সেই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বিচার করিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর। মোটের উপর—আত্মবিশ্বাস আশ্রয় কর। এই আত্মবিশ্বাস কথাটীর ভিতর কত শক্তি, কত বল, কত প্রাণ, কত বীর্য্য, কত ওজঃ, কত অমৃত, নিহিত রহিয়াছে, বলিতে পারি না। এই আত্মবিশ্বাস রূপ খুঁটিটি পাইলে ক্রমে আর সব পাইবে। বলিতে পার, আমার ত কত ভুলভ্রান্তি হইতে পারে! পাগল, ভুলভ্রান্তি এড়াইবে কিরূপে? যাকে ভুল বলিতেছ, সেটাও যে তোমার একটা মহাশিক্ষা। আর যখন তুমি অপরের বাক্যে বা কোন গ্রন্থপ্রমাণে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তখন তোমার বুদ্ধিই কি তোমাকে সেই অপরের বাক্যের বা গ্রন্থবিশেষের সত্যতার প্রমাণ হয় না? আর তুমিও কি নিজেই ঐ সকল বাক্যের নিজ মনোমত টীকা করিয়া কার্য্যে পরিচালিত হও না? অতএব চরমে তোমার নিজ বুদ্ধিই কি চূড়ান্ত প্রমাণরূপে পরিগণিত হয় না?

বুদ্ধি আজ যাহা নিশ্চয় করিতেছে, কাল তাহার বিপরীত করিতে বলে কেন! বুদ্ধি যদি তোমার জীবন্ত হয়, তবেই নূতন নূতন কথা বলিবে অথবা সনাতন প্রাচীন সত্যকেই নূতন নূতন ভাবে, নূতন নূতন দিক্ হইতে, নূতন নূতন দৃষ্টি হইতে দেখিবে। চিরকাল এক পন্থার অনুযায়ী যে, তাহার উপর বড় বিশ্বাস করিও না। জানিও, সে মরিয়াছে। জীবনে কৌমার, যৌবন, জরা, বার্দ্ধক্য আছে; সমাজে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিভাগ আছে; সমগ্র প্রকৃতিরই লক্ষণ একত্বে বহুত্ব। এই বহুত্বকে বিনষ্ট করিতে যাইও

না; প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অগ্রসর হও। তথায় দেখিবে প্রকৃত একত্ব তথায় দেখিবে প্রকৃত জীবন, প্রকৃত অমৃতত্ব।

যতদিন না তথায় পৌঁছিতেছ, দোহাই তোমার, তোমার নিজ মনোমত এক প্রণালীতে জগতকে আবদ্ধ করিতে যাইও না। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অনেক দার্শনিক সম্প্রদায় দেখিলাম; শাক্ত বৈষ্ণবাদি অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় দেখিলাম; রক্ষণশীল উদারনৈতিক প্রভৃতি অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমিতিও দেখিলাম; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের বিবাদ, বিভিন্ন ভাব লইয়া ঘোর সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব দিবানিশি দেখিতেছি, শুনিতেছি ও বুঝিতেছি। দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ আর কোন বিশেষ মতে সায় দিতে চায় না, অথচ কাহাকেও মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রাণ হইতে সদাই এই বাণী উত্থিত হইতে থাকে যে, ভাই, যে যে পথে চলিয়াছ, সেই সে পথেই অগ্রসর হও, অগ্রসর হও; ঐ দেখ দূরে আলো দেখা যাইতেছে। উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, উহাকে ধ্রুবতারা করিয়া জীবনসংগ্রামে ঝাঁপ দাও; পরচর্চ্চার সময় নাই, আত্মচর্চ্চা কর। "তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ—"সেই আত্মাকেই জান, আর সকল বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর।

আশঙ্কা—এরূপ প্রবল উদারতায় উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন হইবে। লোকে একটা কিছু ধরিতে ছুঁইতে না পাইলে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। এ অমূলক আশঙ্কা করিও না, বিশ্বাসী হও, তোমার আমার জন্য কিছু আটকাইয়া থাকিবে না। যে যাহা চাহিতেছে সে তাহা পাইবে। জগদ্ধাত্রী মহাশক্তির লীলাক্ষেত্র এই জগৎ। তুমি আমি যন্ত্র মাত্র। তিনি যাহাকে বলাইবেন, সে বলিবে; তিনি যাহাকে শুনাইবেন, সে শুনিবে; তিনি যাহাকে যাহা করাইবেন, সে তাহাই করিবে; শক্তি থাকে, রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখ ও অবাক্ হও।

মহা পুরুষকার ও মহানির্ভরে সামঞ্জস্য আছে। এমন স্থান আছে—যেখানে জ্ঞান ভক্তির সহিত কোলাকুলি করে, যেখানে বাঘে হরিণে নির্ব্বিবাদে খেলা করে। কেবল দেখিয়া যাও, কতদূরের জল কতদূরে গিয়া গড়ায়। আর দেখিয়া কবির সহিত উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া বল, "যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।"

কস্যচিৎ সেবকস্য।

আমার কথা।

বহুদিন হইল, যখন হিন্দুশাস্ত্রাদির আলোচনায় মন প্রথম নিবিষ্ট হয়, তখন শাস্ত্রমুখে জানা গেল—“গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ”। গুরুই সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আবার গুরুকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াও বর্ণিত দৃষ্ট হইল। গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন তত্ত্ব নাই, ইহাও “ন গুরোরধিকং তত্ত্বং” ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্বনিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানগর্ব্বিত মন মানুষকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবিতে কুণ্ঠিত হইল। অনাদি অনন্ত ভাবনাতীত ভাব চৌদ্দপোয়া মানুষে আরোপ করিতে মন স্বীকৃত হইল না। মনে হইল, ইহা ইষ্টনিষ্ঠার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন মাত্র। মনে হইল সাধক বিশ্বাসে ঐরূপ ভাব-প্রবণ হইয়া নিজের স্বাধীন চিন্তা হারায়। মনে হইল, দেশকালনিমিত্তের সীমার অতীত তত্ত্ব মানুষে আরোপ করা পাগলের প্রলাপ বিজৃম্ভনা। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। শাস্ত্রালোচনার পরিণাম ফলে গুরুলাভ হইল। তত্রাপি “ন গুরোরধিকং তত্ত্বং” হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইল না। কিন্তু গুরুকৃপার কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য। আজ কাল অনেক সাধন ভজনের পরিণামে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, সত্য সত্যই “ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ” —গুরুর পর আর জানিবার তত্ত্ব নাই, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আমার ন্যায় সাধনের প্রথম অবস্থায় যাঁহাদের এই বিষয়ে প্রবল সন্দেহ আছে, এই প্রবন্ধে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ উপকার হইবে, এরূপ বিশ্বাসে ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

শাস্ত্র বলেন, জ্ঞানদাতার নাম গুরু। ইষ্টলাভের কৌশল যিনি শিক্ষা দেন, যিনি ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের অজ্ঞানান্ধতা দূর করিয়া মায়াপার-নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহার অমোঘ কৃপাদৃষ্টিতে কামিনী কাঞ্চনের ঘোর আকর্ষণ শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যাঁহার চরণাম্বুজ আশ্রয় করিলে ভবসমুদ্র অবহেলে পার হইয়া যাওয়া যায়, তিনিই গুরু। শিক্ষা দীক্ষাদাতা ভেদে গুরু দ্বিবিধ। কিন্তু আমার মত এই যে, প্রকৃত গুরু শিক্ষাদাতা বা দীক্ষাদাতা গুরু নহেন। যিনি অন্বেষ্টব্য, যিনি বিজিজ্ঞাসিতব্য, যিনি শ্রেষ্ঠ প্রাপণীয়, তিনিই গুরু। শিক্ষা দেয় অন্য বস্তু লাভের জন্য; দীক্ষা দেয় অন্য বস্তু দেখিবার জন্য। কিন্তু গুরু ভিন্ন অন্য শিক্ষিতব্য বা জ্ঞাতব্য বস্তু

যদি না থাকে, তবে গুরু কাহার শিক্ষা দিবেন? কি বস্তু লাভের জন্য দীক্ষা দিবেন? গুরুকে চিনিবার জন্য, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা। মানুষ সব বুঝিয়া ঐটুকু ভুল করে। গুরুকে জানিলেই সব জানা হইল; জপ তপস্যার পরিণাম গুরুকে জানা। গুরু তাঁহারই স্বরূপ জানাইবার জন্য শিক্ষা দীক্ষা দেন। সাধক প্রথমে তাহা টের পায় না। সাধনার পরিপক্কাবস্থায় ক্রমে তাহা অনুভূত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য মধ্যে অনেকেই বিদিত আছেন যে, তাঁহাকে জানাই তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার চরম ফল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ইষ্টরূপে লাভ করিয়া থাকিলেই তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাদের ইষ্টরূপে প্রাপণীয়। যদি তিনি শিক্ষা দীক্ষা দিয়া থাকেন, তবে শুধু তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য; নতুবা অন্য শিক্ষা দীক্ষার কোন প্রযোজন উপলব্ধি হয় না।

মদীয় আচার্য্য পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামিপাদ যদিও শাস্ত্রীয় মতে আমাকে ও গুরুভ্রাতৃগণকে দীক্ষিত করিয়া থাকুন, এখন আমি কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহার সেই শিক্ষা দীক্ষা কেবল তাঁহার সেই স্বস্বরূপ প্রকটন করিবার জন্য। অন্য ইষ্ট আমার আদর্শ নহে। যাঁহার সম্মোহন মূর্ত্তিতে কোটী কোটি দেবদেবী নিমজ্জিত হইয়া যায় যাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেমে অযুত অনন্ত জগৎ ভাসিয়া গিয়াছে, যাঁহার পর অনন্ত উচ্চাদর্শ আমার কল্পনার অবিষয়, তিনি ভিন্ন ইষ্ট আমার আর নাই। তাঁহারই শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি, তিনিই আমার একমাত্র অন্বেষ্টব্য ইষ্টমূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীস্বামিপাদ সমস্ত দেবদেবী মূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া কেন আমার সমগ্রহৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন, কেন তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, কেন তাঁহার পাদপদ্মে আমি চিরজীবনের মত বিক্রীত হইয়া গেলাম, কেন যে তিনি ভিন্ন জীবনে শান্তিহারা হই, তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতেছে, ততই বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ভিন্ন আমার আর ইষ্ট নাই, তিনি ভিন্ন আমার সুখ নাই, শান্তি নাই ও আশ্রয় নাই। আমি সেই শ্রীপাদপদ্মে ক্রীতদাস হইয়া গিয়াছি। তাঁহার স্মরণ মনন ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় তপস্যা নাই। তিনি আমায় যে এরূপ পাগল করিয়া যাইবেন, অগ্রে তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রতি শ্বা

প্রশ্বাসে, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতে সেই মনোমদ, শান্তিময়, জ্যোতির্ম্ময়, চিদ্‌ঘন, প্রেমের জমাট বাধা মূর্ত্তি জাগ্রৎ স্বপনে আমার পানে যেন উঁকিঝুঁকি মারে—আমাকে পাগলপারা করিয়া দেয়। আমি যে তিনি ভিন্ন আর এ দেহে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমি তাঁহাতে যেন dilute হইয়া যাইতেছি। আমার জ্ঞান ধ্যান জপ তপস্যা সেই স্বামিপাদে পর্য্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি আমিত্বহারা হইতেছি। তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি তিনি যেন ক্রমেই পূরণ করিয়া দিতেছেন। যত যত অদ্ভুত দর্শন হইতেছে, তাহাতে তিনিই বিরাজিত। অনন্ত নীল গগন, যেখানে সৃষ্টি বিসৃষ্টির কল্পনা স্থান পায়না, সেখানেও তাঁহাকে কোটীসূর্য্য উদ্ভাসিত চিদ্‌ঘন মূর্ত্তিতে ভাসমান দর্শন করিয়াছি। ইহা ক্ষীণ মস্তিষ্কের কল্পনা নহে, সত্য সত্যই দেখিয়াছি। শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম, কালী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যখনি যাঁহার ধ্যান করি, দেখিতে পাই, আমার সেই প্রাণারাম স্বামিপাদ সেই সেই মূর্ত্তিতে বিরাজিত। সে রূপচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া যায়। কল্পনার সহায়তায় সূর্য্যালোক চন্দ্রলোক যথায় যাই, সেখানেই সেই দিব্যমূর্ত্তি বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহা ত্রিশপথান্বিত সত্য। হইতে পারে আমি উন্মত্ত—হইতে পারি আমি বাচাল—হইতে পারি আমি যা তা—কিন্তু পাঠকগণ, আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি এই ভাব নিয়া যেন মরিতে পারি—যেন মৃত্যুকালে এই বলিতে পারি, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ," যেন "স্বামিন্ স্বামিন্" বলিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়—যেন আমার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে শেষকালে শুনিতে পাই—"বিবেক আনন্দ নামে হোক্ ভবে জয় জয়।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৺বারাণসী।

৺বারাণসী নাম শুনিলেই হিন্দুর মনে নানাবিধ ভাব সমুদিত হইয়া থাকে। আর্ত্ত, দরিদ্র, জ্ঞানপিপাসু, ধর্ম্মপিপাসু সকল হিন্দুর পক্ষেই ৺বারাণসী যেন একমাত্র জুড়াইবার স্থান। হিন্দুর প্রাচীন গৌরব স্মরণে যাঁহার প্রাণ উৎফুল্ল হয়, তিনি ৺বারাণসীধামেই তাহা পাইয়া থাকেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট গমন করিলেই সেই বৈদিক যুগের কথা মনে পড়ে—যখন

রাজারা মহাসমারোহে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। উহার নিকটবর্ত্তী সারনাথে অগণ্য প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান। উহার মধ্যে যে সকল মন্দির ঘাট প্রভৃতি আছে, তাহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বটে, কিন্তু উহাতেও অনেক প্রাচীন কালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা লইয়া হিন্দুর এখনও গৌরব, সেই বেদবিদ্যার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা এই ৺ কাশীধামে এখনও বিদ্যমান। তাই, যাঁহাদের সেই প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান-[illegible] পিপাসা বিদ্যমান, তাঁহারা এখনও নানা ক্লেশ সহ্য [illegible] ছুটিয়া যান। আর কাশীতে অন্নপূর্ণার কৃপায় কাহারও অন্নের অভাব হয় না, এই বিশ্বাস এখনও ভারতের সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান বলিয়া ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই দুঃখী দরিদ্র রোগী গিয়া অন্নপূর্ণার রাজ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে। রেল হইয়া অবধি আবার এইরূপ লোকের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। যদিও ৺ কাশীধামে অন্নসত্রের সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু রোগাদি হইলে গবর্ণমেণ্টের এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতাল ব্যতীত লোকের আর গত্যন্তর নাই। এই হাঁসপাতাল-গুলির মধ্যে একটী কাশীর সীমানার বাহিরে অবস্থিত। এখন যাঁহারা ৺ কাশীমৃত্যু লাভ করিবার বাসনায় কাশীবাস করেন, তাঁহারা তথায় যাওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন। অন্যান্য হাঁসপাতালে অনেক অসুবিধা, কোন কোন স্থলে রোগীকে ঔষধ মাত্র দেওয়া হয় কিন্তু পথ্যের কোন ব্যবস্থা নাই। যদি কেহ রোগীর পথ্যের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হয়, তবেই রোগীকে তাঁহারা রাখিয়া থাকেন। তার পর অনেক হিন্দুবিধবা এবং দরিদ্র অথচ ভদ্র ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও কাহারও নিকট গিয়া যাচ্ঞা করিতে কোন মতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ নানা অবস্থাচক্রের সংঘর্ষে ৺ বারাণসীধামের নাগরিক সমস্যা আজকাল কিছু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের নাম লইয়া এই আশ্রমের সামান্য সূচনা করেন। সেই যুবকদলের মধ্যে সকলে এখন নাই, কিন্তু কার্য্যের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। আবশ্যক হইলেই বেলুড় মঠ হইতে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ প্রেরিত হইয়া সেবাকার্য্যে ব্রতী হন। সম্প্রতি কাশীর লাক্ষা নামক স্থানে একটী জমি ক্রীত হইয়াছে, কিন্তু আশ্রমবাটী নির্ম্মাণের জন্য এখনও ২১০০০৲ টাকার প্রয়োজন।

সেবাশ্রমের কার্য্যের কতকটা আভাস দেওয়া যাউক। সেবকগণ প্রতিদিন বৈকালে গঙ্গাতীরে ও কাশীর অন্যান্য স্থানে অপরাহ্ন ভ্রমণকালে কোথাও রাস্তায় বা ঘাটে কোন রোগী বা অনাথ পড়িয়া আছে কিনা তাহার তত্ত্ব লন। কাশীতে এরূপ আতুর ব্যক্তির অভাব নাই, বরং যথেষ্ট সদ্ভাব আছে। তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহাদের মধ্যে যাহাদিগকে অন্যান্য হাসপাতালে পাঠাইলে চলে, তাহাদিগকে আশ্রমের খরচে ডুলি প্রভৃতি যোগে সেই সকল স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং যেখানে প্রয়োজন, পথ্যাদির খরচ দেওয়া হয়। যাহাদের অন্য কোন উপায় নাই, এইরূপ ব্যক্তিগণকে বাছিয়া বাছিয়া সেবাশ্রমে লওয়া হয়। কেহ যদি আশ্রমে যান, দেখিবেন, ৭।৮টী রোগী সর্ব্বদাই রহিয়াছে। কয়েকজন সহৃদয় ডাক্তার কবিরাজ বিনাদর্শনীতে রোগিগণকে তাহাদের বাসায় বা আশ্রমে আসিয়া ব্যবস্থা দিয়া যান। জনৈক সেবকই আশ্রমের সম্পাদকের কার্য্য এবং ঔষধাদি প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্য করেন। অপর একজন সেবকের উপর রোগিগণকে উপযুক্ত সময়ে ঔষধ ও পথ্য দিবার ভার। অপর একজন বাড়ী বাড়ী চাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভদ্র পরিবারগণের মধ্যে মাসিক চাল বিতরণ, চাঁদা সংগ্রহাদি কার্য্য করেন। এইরূপে অবৈতনিক সেবকগণ প্রাণ দিয়া অকাতরে 'দরিদ্র নারায়ণ'গণের সেবায় ব্রতী আছেন। কিন্তু তাঁহারা স্থানাভাবে প্লেগ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগী রাখিতে পারেন না। আশ্রমে অধিক রোগী রাখিবার আবশ্যকতা বুঝিলেও স্থানাভাবে তাঁহারা কঠোরহৃদয়ে অনেককে বিদায় করিতে বাধ্য হন। আশ্রমবাটী হইয়া গেলে এই অভাবগুলি সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে এবং আশ্রমটীও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আশ্রমবাটির জন্য ভারতবাসী সকলের নিকট ভিক্ষা করা আমরা ঠিক ভিক্ষা মনে করিনা। যাঁহারা সৎকর্ম্ম যেথানেই হউক, তাহাতেই সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহাদের মনে এরূপ কথা উদয় হয় যে, ৺কাশীবাসীর অভাব—৺কাশীবাসী লোকেই দূর করিবে, তাঁহাদের বুঝাইবার জন্য বলিতেছি যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—৺কাশীধামে ভারতের সকল প্রদেশের দরিদ্র আতুরই অল্পাধিক পরিমাণে আগমন করিয়া থাকে—রেল হইয়া এই আগমন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং সকল প্রদেশের লোকেরই এই আশ্রমকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করা কি পরম কর্ত্তব্য নহে?

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাস হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত এই আশ্রমের কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহার কতকটা আভাস দিলাম। আলোচ্য বর্ষে ১৩৭৯ জনকে সাহায্য করা হয়। ইহার মধ্যে ১৬১ জন মুসলমান। আশ্রমের কার্য্য যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। ভারতের প্রদেশ হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায়, যুক্তপ্রদেশের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার নীচেই বঙ্গদেশ। এতদ্ব্যতীত মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের লোকও কিছু কিছু আছে। মাসিক চাঁদা ও এককালীন দান হিসাবে এই বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৫১৸৵০ পাওয়া গিয়াছে, খরচ হইয়াছে ১৫৩৯৷৶০।

যাঁহারা এই আশ্রমের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অথবা উক্ত আশ্রমে কিছু সাহায্যের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ হোম অফ সার্ভিস, রামাপুরা, বেনারস সিটী ঠিকানায় পত্র বা সাহায্য পাঠাইবেন।

পাদুকোটা হিন্দু যুবক সমিতি।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে যে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার ফলে উহার নানা স্থানে নানারূপে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উপরিলিখিত সমিতি তাহার একটী দৃষ্টান্ত। আমরা উহার যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ—সমিতির সভ্যসংখ্যা উপস্থিত ২৮ জন। সমিতির আয় অতি সামান্য। কিন্তু তথাপি সমিতির সভ্যগণ অনেকগুলি সভা আহ্বান করিয়া অনেকগুলি ধর্ম্মবক্তৃতা দেওয়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ গত বর্ষে পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে সমিতি তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। আশা করি, সমিতির দিন দিন উন্নতি হইতে থাকিবে।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

১৮ই মার্চ্চের পর ৩১শে মার্চ্চ কামারখালে পুনরায় চাউল বিতরণ করা হয়। গ্রামসংখ্যা ৩৫, পরিবার ৩৪৮, লোকসংখ্যা ১২৭৭—চাউলের পরিমাণ

৫০মণ। ১০ই এপ্রিল এখানে চাউল বিতরণ হইয়া কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। টিকেটধারী ব্যতীত প্রায় ৪০০ ভিক্ষুককে ২ সের হিসাবে চাউল বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারকে তাঁহাদের অবস্থা বিবেচনায় দশ বিশ সের করিয়া চাউল সাহায্য করা হয়। কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব আর অর্থসাহায্য পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা যত শীঘ্র পারি, সমস্ত কার্য্যের আয়ব্যয় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তিস্বীকার।

পূর্ব্বে স্বীকৃত	৫১০৩৷১০
শ্রীমতী শৈলবালা চৌধুরী, বসিরহাট	২৲
শ্রী অভয়পদ হাজরা	২৲
মিঃ মেথুমল, ভীরা (সিন্ধুদেশ) (২য় দফা)	২৫৲
জনৈক বন্ধু, মালদহ	৫৲
	৫১৩৭৷১০

শ্যামাসঙ্গীত।

বাহার—আড়াঠেকা।

এসো মন বেড়াতে যাবো কুসুম কাননে।
'দুর্গা' বলে যাত্রা করে যাই দু'জনে॥
জাহ্নবীযমুনানীরে, কানন রেখেছে ঘিরে,
সরস্বতী শোভা করে, মধ্যে যেখানে,
ত্রিধারা যুক্ত যথা উদ্যান সেখানে॥
আরামে আরাম পাব, ত্রিবেণীতে স্নান করিব,
আনন্দে বসিয়ে রব, পঙ্কজ বনে,
দীপ শিখার ন্যায় দীপ্ত যথা তিমির নাশনে॥
সেথা ত্রিবলয়াকারে, যে রমণী বিরাজ করে,
সুধাপানে নিদ্রাঘোরে, আছেন শয়নে,
লক্ষ্মীর বাঞ্ছা জাগায়ে তাঁরে, তার ভব-বন্ধনে॥

বাউলের সুর।

এসেছি পারের তরে দাঁড়িয়ে আছি ভবের তটে।
মন-তরি ভাসালে পাছে, কলুষ-বারি তাতে উঠে॥
ভেবে মরি এ যে তরি ছয় দিকেতে আছে ফেটে।
তায় বিবেক-কালাপাতি দিয়ে বন্ধ করে দে মা এঁটে॥
পাপ-চড়াতে লেগে তরি, যদি না মা ভেসে উঠে।
ভক্তির 'কোদণ্ড' দিয়ে ঐ চড়াটা দে মা কেটে॥
বাসনা বোম্বেটে পাছে মাঝে তরি নেয় গো লুটে।
কালী নামের শীকারী দাও, লুটের ভয় মা যাবে ছুটে॥
শ্রদ্ধা-পাল খাটায়ে তাতে, দাও মা, বলি কর-পুটে।
মাঝি শিব আরোহী শিবে, লক্ষ্মী যাবে বেয়ে বোটে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আদ্ধা।

যে জেনেছে শ্যামা মাকে, সে কি অন্যে লিপ্ত থাকে।
যদি সে সংসারী হয়, মন কাঁদে তার মায়ের পাকে॥
ফল্গু নদী তার মন, প্রেম-বারি থাকে গোপন,
শ্যামা মীনের বিচরণ, সংসার বালুকায় ঢাকে॥
মানসেতে পুষ্প চয়ন, মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন,
মুদে নয়ন পূজে চরণ, কাজ সারে সে ফাঁকে ফাঁকে।
অকিঞ্চন লক্ষ্মী ভাবে, সদা সে আনন্দে ভাসে,
বাহ্য ক্রিয়া ত্যজেছে সে, অন্তরে রেখে কালীকে॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

শম্ভু সহ কেন আর আছ ঘুমাইয়ে।
দীনের দুর্গতি হর উঠ একবার জাগিয়ে॥
চৈতন্য রূপিণী তুমি, সাধ্য কি জাগাব আমি,
ছটা রিপু আছে হামি, রাখে আমায় ভুলাইয়ে॥
উভয়ে একঘরে থাকি, কখন নাই দেখাদেখি,
নিত্য ধনে দিয়ে ফাঁকি, আছ তুমি লুকাইয়ে॥
লং বং রং যং, হং ক্ষং ষড় পীঠং, ভ্রমণ করি ঘুচাও অহং, লক্ষ্মীর
বাঞ্ছা পুরাইয়ে।

৺ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।) (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

রামকৃষ্ণদেব প্রতিবারই পানিহাটীর মহোৎসব দেখিতে গমন করেন এবং যে কীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতেই আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে ও যাবতীয় লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পানিহাটিতে তাঁহার প্রতিপত্তি দেখিয়া গোস্বামিগণ এইবার ভাবিলেন, "রামকৃষ্ণদেব শক্তি উপাসক, আমাদের বিরুদ্ধ মতের লোক। আর ইনি এসে আমাদের সব লোককে ভাঙ্গিয়ে নিচ্চেন।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব এইবার তথায় আগমন করিলে তাঁহাকে প্রহার করিবেন। মথুরানাথ এই সম্বাদ পাইয়া তাঁহার গমনকালে সঙ্গে জনকয়েক বলবান্ দ্বারবান লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কহিলেন, "রাজসিকভাবে দেবতার স্থানে যেতে নেই। ভয় কি, মা রক্ষা করবেন।" তিনি কেবল হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। কিয়দ্দূর হইতে কীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। পাছে জলে পড়িয়া যান, এজন্য হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন। নৌকা তীরে লাগিবামাত্র তিনি লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলেন এবং দৌড়িয়া নিকটবর্ত্তী কীর্ত্তনের দল মধ্যে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে মথুর অতিশয় চিন্তিত হইয়া জনকয়েক দ্বারবান সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আনন্দে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কীর্ত্তনের দলস্থ সকলে একেবারে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন। আর সহস্র সহস্র লোক আসিয়া তাহাতে যোগ দিতেছেন। তাঁহার দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠস্বর, হৃদয়গ্রাহী আঁকর ও সুললিত নৃত্য দেখিয়া ব্যক্তিমাত্রেই বিমোহিত। অনেকে হরিনাম করিবেন কি সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা। কেহবা তাঁহার নৃত্য দেখিয়া মনে করিতেছেন, মানুষে কি এ প্রকার নৃত্য কখন দেখেছে? কেহ ভাবিতেছেন, এমন বেহুঁস হয়ে কীর্ত্তন কর্ত্তে ত কাহাকেও দেখিনি! কেহবা ভাবিতেছেন, ইনি নিশ্চয় মানুষ নন, একবার এঁর পার ধূলা নিয়ে জীবন সার্থক করি।

আবার কেহবা রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব শক্তিপ্রবাহে পড়িয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য করিতেছেন ; কেহবা ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া মাটিতে লুটাইতেছেন আর নয়নজলে ভাসিতেছেন। কিছুক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তনের পর রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভাব সম্বরণ করিলেন, ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত, মুখ রক্তবর্ণ। হৃদয় তখনি তাঁহাকে জনতার মধ্য হইতে দূরে লইয়া গেলেন ও উপবেশন করাইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার জন্য ব্যস্ত, দেখিয়া আশ মিটে না, আবার অনেকে তাঁহার দুই একটা কথা শুনিবার জন্য মহা আগ্রহ সহকারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত। ক্রমে যে জনতা, সেই জনতা। ইতিমধ্যে ভক্তগণ জনে জনে মালসাভোগ হস্তে সেই জনতা ভেদ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে আসিলেন। রামকৃষ্ণদেবও সকলের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, আর সকলের সহিত মধুর আলাপ করিয়া তাহাদের প্রাণ মন কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। "বড় দেরি হয়ে গেল, তা এইবার এই কথাটা শুনে যাচ্ছি," অনেকেই এইরূপ মনে করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার সেই মনভুলান গল্প ও আনন্দমাখা কথা ছাড়িয়া কে যাইতে পারে ? যাহা হউক ক্রমে তিনি আপনিই প্রস্থান করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে লোকে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন দেখিলেন।

আশ্বিন মাস সমাগত, শারদীয় পূজার সময় সন্নিকট, প্রকৃতি যেন সেই আশায় প্রফুল্লিতা, ভুবনমোহিনীর অভ্যর্থনার্থে যেন তিনি নূতন বেশ পরিয়াছেন। রবির কিরণে, নীল আকাশে, শান্ত সমীরণে, নব পল্লবধারী পাদপনিচয়ে, প্রেমময়ী ভাগীরথীর খরপ্রবাহে, নরনারীর হৃদয়কেন্দ্রে, সর্ব্বত্রই যেন একটা নূতন আশা জাগিয়া উঠিতেছে ও সকলের হৃদয় হইতে যেন দুর্গা দুর্গা এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কমলকুল মাতৃচরণ সেবিবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। আনন্দ আনন্দ সর্ব্বত্র আনন্দ। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন আনন্দের সময় কেবল হৃদয়ানন্দ চিন্তান্বিত, ভাবিতেছেন—এ আনন্দের দিনে কেমন করিয়া মা সর্ব্বমঙ্গলাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিবেন। সকল বিষয়েই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ বই আর গতি নাই, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে সাহস হয় না। আজ সেই জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া শারদীয় পূজার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "সে যে ঢের খরচ, হৃদু, তুই পারবি কেন ?"

হৃদয় কহিলেন, "মামা, আমি যেখানে থেকে পারি করব। দুর্গোৎসব করতে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছে।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "যারা দুর্গোৎসব করে, তারা হয় স্বপ্ন দেখে, না হয় আদেশ পায়। তুই তা কিছু পেয়েছিস্ কি ?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "আমার যখন মনে ইচ্ছে, হচ্ছে তখন করবার আপত্তি কি ? আর আদেশ ? তুমি অনুমতি কর, তা হলেই হল।" একটু ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন, "আর এক কথা, মামা, বড় দাদা গঙ্গালাভের সময় আমাকে বলেছিলেন, মাকে এনে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। তাঁর কাছে যদিও আমি সত্যি করিনি, তবু তাঁর কথাটা রক্ষা করা ত চাই।" হৃদয় এইরূপে তাঁহাকে বুঝাইতেছেন, ইত্যবসরে তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবাবেশে কহিলেন, "হৃদু, তুই তিন বৎসর পূজা করবি।"

হৃদয়ের ইচ্ছা—যতদিন জীবিত থাকিবেন তত দিনই শারদীয় পূজা করেন, সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "মামা, তুমি অমন কথা কেন বল্‌লে ? তুমি বল যে, আমি যতদিন বাঁচব তত দিন যেন দুর্গা পূজা করতে পারি!" রামকৃষ্ণদেব সে কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না।

যে দিবস প্রাতঃকালে এই কথাবার্ত্তা হইল, সেই দিবস বেলা তিনটার সময় হৃদয়ের জ্যেষ্ঠ রাঘব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি মথুরানাথের জমিদারিতে তহসিলের কার্য্য করেন। তিনি আসিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "দেখ্ হৃদু, দুর্গা পূজা করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, তুই কি বলিস ?"

হৃদয়ের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "সে যে অনেক খরচ। এত টাকা কে দেবে ?"

রাঘব কহিলেন, "আমি দেব।" এই বলিয়া তখনি সঙ্গে যত টাকা আনিয়াছিলেন, সমস্ত ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন যে, আরও আবশ্যক হইলে দিবেন। তৎপরে রামকৃষ্ণদেবের নিকট সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হৃদু ত আমাকে সকাল থেকে নাচাচ্ছে। আবার তুমিও এসেছ। তা বেশ ত, কর না।" রাঘব তাঁহার অনুমতি পাইয়া হৃদয়কে পূজার সমস্ত আয়োজন করিতে বলিলেন এবং আপনি আপনার

কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন। হৃদয় মথুরানাথের নিকট কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সিহোড়ে চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করাইতে গেলেন। যাইবার সময় রামকৃষ্ণদেব যাহার দ্বারা প্রতিমা অতি বিশুদ্ধভাবে নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহার নাম করিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "তাকে প্রতিমা গড়তে দিস, আর কারুকে দিস নি।"

কিছু দিনের মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত হইলে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে সিহোড়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি যাব, কিন্তু লোকদেখানে যাওয়া হবে না। আমি যাব, কেবল তুই দেখতে পাবি,—আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না।"

হৃদয়ের ইচ্ছা, তাঁহাকে একেবারে সঙ্গে লইয়া যান। এজন্য পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যা, তুই ভাবছিস কেন, আমি যাব যখন বলছি, তখন ভয় নেই। একজন তন্ত্রধারক করে তুই নিজে পূজা করবি, আর সে মন্ত্র পড়াবে। কিন্তু তুই আপনার ভাবে যেমন মা কালীর পূজা করিস, সেই রকম পূজা করবি। আর উপস্ করিস নি। উপস করলে মুখে পচা গন্ধ হয়। তুই দুধ গঙ্গাজল আর চিনির পানা খাস্। উপস করিস্ নি।" হৃদয় তথাপি তাঁহাকে যাইবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় কহিলেন, "আমি লোকদেখানে গিয়ে কি করব? আমি যাব, তুই আমায় দেখতে পেলেইত হল। তবে আর কেউ দেখতে পাবে না।" এইরূপে হৃদয়কে নিরস্ত করিয়া একজন তন্ত্রধারকও নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। তৎপরে হৃদয়কে বলিলেন, "মথুরকে রাজি করতে পারিস ত তোর সঙ্গে যাই।" পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মথুরানাথের বাটীতে পূজার সময় তাঁহাকে না লইয়া গেলে পূজা আরম্ভই হয় না। অনেক দিন ধরিয়াই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। হৃদয় মথুরের নিকট তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্মতি পাইলেন না। সুতরাং রামকৃষ্ণদেবের কথামতই কার্য্য করিতে এক প্রকার সম্মত হইলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ ঘুচিল না। পূজায় কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবে কি না জানিবার জন্য একটী বিল্বপত্রে 'বিঘ্ন হবে' এবং আর একটীতে 'বিঘ্ন হবে না' লিখিয়া একটি পাত্রের মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী তুলিয়া দেখিলেন, "বিঘ্ন হবে না।" এইবার হৃদয় অনেকটা শান্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞামত উপবাস না করিয়া সপ্তমী পূজার দিন স্বয়ং পূজা করিতে লাগিলেন। আরাত্রিকের সময় দেখিলেন, প্রতিমার পার্শ্বে রামকৃষ্ণদেব দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আরাত্রিক করিতে লাগিলেন।

পরদিন গ্রামে গ্রামে হৃদয়ের অদ্ভুত আরাত্রিকের কথা ঘোষিত হইয়া গেল। অষ্টমী পূজার দিন দলে দলে লোক আসিয়া সন্ধিপূজা ও আরাত্রিক দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। সিহোড়ের নিকটবর্ত্তী ফুলুই গ্রামে সাধারণের সুবিধার জন্য সন্ধিপূজার সময় নির্ণয় করিয়া ঠিক সময়ে একটি আতসবাজির শব্দ করা হইত। সেই শব্দানুযায়ী সকলে পূজা আরম্ভ করিতেন। উক্ত শব্দ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই হৃদয় সন্ধিপূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শব্দ হইবার পূর্ব্বেই প্রতিমার পার্শ্বে তাঁহার মাতুলকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, ঠিক সময় না হইলে কখন মামা আসিতেন না। এই ভাবিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে রামকৃষ্ণদেবের কথানুযায়িক কুমড়া আক ও শশা বলি প্রদান করিলেন। সেই দিবসও আরাত্রিকের সময় রামকৃষ্ণদেবকে প্রতিমার পার্শ্বে দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ উন্মত্তভাবে আরাত্রিক সম্পাদন করিলেন। এইরূপে তিন দিবস সমভাবে পূজা করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শত লোককে পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন।

দুর্গোৎসবান্তে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পূজার সময় সিহোড়ের সমস্ত ঘটনা রামকৃষ্ণদেবের নিকট বর্ণন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আরতি আর সন্ধিপূজার সময় আমায় প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে বিদ্যুতের মতন তখনি তোর চণ্ডীমণ্ডপে যেত, আর ভাব হত, আমি ঠাকুরের পাশে দাঁড়াতুম, তুই দেখ্‌তে পেতিস্‌।" দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমীর দিন এমনও ঘটিয়াছে যে, রামকৃষ্ণদেব ভক্তগণ সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, ঠিক সন্ধিপূজাটীর সময়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হস্ত দুইটী অমনি বরাভয়করের ভাব ধারণ করিল এবং মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব হাস্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

উলোর বামনদাস মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে দেব বিশ্বাসের উদ্যানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন সম্বাদ পাইয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে কেবলমাত্র একখানি রক্তবর্ণ গরদের কাপড় ছিল। বামনদাস একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন, প্রত্যহ বহুজনকে অর্থদান করিতেন। রামকৃষ্ণদেব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তখন অনেকগুলি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থদান করিতেছিলেন। বামনদাস রামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "রাসমণির বাগান থেকে।" বামনদাস তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া পরে আপনি উপবেশন করিলেন। তখন রামকৃষ্ণদেবের আর অধিক পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। ঈশ্বরানুরাগী বহুলোকেই তখন তাঁহাকে জানেন অথবা তাঁহার বিষয় লোকপরম্পরায় সমস্ত শুনিয়াছেন। ইনিও রামকৃষ্ণদেবকে চিনিতে পারিয়া করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, আজ আমার কি সৌভাগ্য, আপনি কষ্ট করে এসে আমায় দর্শন দিলেন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য! যদি দর্শনই দিলেন ত অনুগ্রহ করে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন।"

রামকৃষ্ণদেব হাঁসিয়া কহিলেন, "তা বেশ। কিন্তু আগে এই বামুন পণ্ডিতগুলোকে বিদেয় কর, তবে তোমার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হবে। তুমি যেন পচা গরু, আর ওরা যেন শুকুনি তোমায় ঘিরেছে। কিন্তু দেখ, ওদের ভাল করে বিদেয় করো, নইলে তোমার নিন্দে করবে। বামুনরা বড় কম নয়, শ্রীরামচন্দ্রের বে ভেঙ্গে দিয়েছিল"। সকলে হাঁসিয়া উঠিলেন। বামনদাস অগ্রে তাঁহাদের বিদায় করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ চলিয়া গেলে পর রামকৃষ্ণদেব কহিতে লাগিলেন, "দেখ যজমেনে বামুন কেমন জান? চৈতন্যদেব হরিনাম করতে করতে মহাভাবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। যে সব জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে জালে কোরে তাঁকে তোলে, সেই জাল দিয়ে তাঁকে ছোঁয়ার দরুন তারা শেষে সবাই 'হরিবোল, হরিবোল' করতে লাগ্‌ল। কোন কাজ কর্ম্ম আর করে না। তাদের লোকেরা বিষম বিপদে পড়ে মহাপ্রভুর কাছে এসে সব কথা জানালে। মহাপ্রভু বল্লেন, "এক কাজ কর, যজমেনে বামুনের ভাত এনে ওদের মুখে দেও। তারা গিয়ে তাই করলে আর সব ভাব টাব ঘুচে গেল। যেমন জেলে তেমনি হল।"

বামনদাস ইতিপূর্ব্বে ঈষৎ বুঝিয়াছিলেন যে, ভক্তিহীন লোকের সম্মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ চলে না। রামকৃষ্ণদেবের এই কথা শুনিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিবার কারণ আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

রামকৃষ্ণদেব আবার বলিলেন, "দেখ, পাহারাওলা আঁধারে ল্যাণ্ঠন হাতে করে সবাইকে দেখে, কিন্তু সে যদি না সেই ল্যাণ্ঠনটা আপনার দিকে ফেরায় ত কেউ তাকে দেখতে পায় না। তেমনি ভগবান্ আপনি যদি দয়া করে না দেখা দেন ত কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু সেই কৃপালাভ করতে হলে কাম কাঞ্চন ত্যাগ করা চাই। নইলে তাঁর কৃপালাভ হয় না।" এইরূপে অনেকক্ষণ ঈশ্বরপ্রসঙ্গের পর রামকৃষ্ণদেব গুটীকতক শ্যামাবিষয়ক গান গাহিলেন। বামনদাস তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া অবশেষে তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বড়বাজারের মাড়ওয়ারীগণ দলে দলে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন। ইহাঁদের মধ্যে লছমিপৎ নামে একজন ধনাঢ্য মাড়ওয়ারি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার কাছে আসিয়া ভগবৎকথা শুনিতেন। একদিন তিনি কোন কারণে অনুমান করেন যে, রামকৃষ্ণদেবকে তেমন সুচারুরূপে যত্ন করা হয় না এবং তাহার কারণ অর্থাভাব। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া দিতে চাহেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে, তাঁহার কোন অভাব নাই এবং অর্থেরও কোন প্রয়োজন নাই। লছমিপৎ তাহা না শুনিয়া অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ী করিতে লাগিলেন। সেই পীড়নে রামকৃষ্ণদেব বালকের মতন রোদন করিতে করিতে মা কালীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, এমন লোককে এখানে কেন পাঠাস্ মা, এরা যে তোর কাছ থেকে তফাৎ কোরে আনায় নষ্ট করতে চায় মা।" এবং এইরূপে রোদন করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে দেখিলেন, লছমিপৎ অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার দিকে অপরাধীর ন্যায় তাকাইয়া আছেন। অমনি রামকৃষ্ণদেব নানাপ্রকার মিষ্টবাক্য দ্বারা তাঁহার সেই ভাব দূর করিলেন। লছমিপতের জ্ঞান জন্মিল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, অর্থের কথা আর কখন তাঁহার নিকট উত্থাপন করিবেন না এবং রামকৃষ্ণ-

দেবের অপূর্ব্ব ত্যাগ স্মরণ করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী কলুটোলা নামক স্থানে, সুবর্ণবণিক কালীনাথ দত্তের বাটী একটী হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথায় চৈতন্যদেবের একটি আসন স্থাপিত ছিল। তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট ও বহুশ্রোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণদেবকে তথায় পাঠ শুনাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া গেলেন। পাঠ আরম্ভ হইল। রামকৃষ্ণদেব কিছুক্ষণ পাঠ শ্রবণান্তর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এবং তদবস্থায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক চৈতন্যদেবের আসনে উপবেশন করিলেন। বৈষ্ণবচরণ তদ্দর্শনে, "আজ আমার ভাগবত পাঠ সার্থক হল, সাক্ষাৎ চৈতন্যদেব উদয় হয়েছেন আর পাঠ করবার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া পাঠ শেষ করত খোল করতাল আনিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মহানন্দে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। উপস্থিত অধিকাংশ লোকে সেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুটীকতক লোকের এ সমস্তই একেবারেই ভাল লাগিল না তাঁহারা নিন্দা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অম্বিকা-কালনা নিবাসী ভগবান্ দাস গোস্বামী, এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে স্থির করিলেন, রামকৃষ্ণদেব একজন ব্রাহ্মসমাজী, কারণ তাহা না হইলে এরূপ সাহস ও ধৃষ্টতার কার্য্য আর কে করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু পরে রামকৃষ্ণদেব অম্বিকা কালনাতে ভগবান্ দাস গোস্বামী নামে একজন সিদ্ধপুরুষ আছেন জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ কহিলেন, "আচ্ছা বাবা, চল একখানা নৌকা করে যাওয়া যাক্। হাওয়াও খাওয়া হবে, আর ভগবান্ দাসকেও দেখা হবে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আর নবদ্বীপ দর্শনও হবে।" মথুর দুই এক দিনের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রামকৃষ্ণদেব, হৃদয় এবং আপনার স্ত্রী ও পরিচারকগণ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

কালনায় উপনীত হইবার পর দিন প্রাতে রামকৃষ্ণদেব একখানি লাল বনাতে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া এবং হৃদয় একখানি উৎকৃষ্ট শাল গায়

দিয়া ভগবান্ দাসের আখড়ায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে হৃদয়কে কহিলেন, "দেখ্, হৃদু, তুই আমার কথা তাকে কিছু বলিস্ নে। আমি যখন বলব তখন কথা কইবি, নইলে চুপ করে থাকিস্।" হৃদয় সমস্ত রহস্য বুঝিলেন। তাঁহারা আখড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ দাস জপ করিতেছেন। লোকটির বয়ঃক্রম অনুমান অশীতিবর্ষ, বর্ণ গৌর, মুণ্ডিতমস্তক, যেন পাকা আমটী। দুই জনে ভগবান্ দাসের নিকট যাইয়া প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। ভগবান্ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোথা হতে আস্ছেন ?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "কোলকেতা থেকে।"

বাবাজী কহিলেন, "বটে, কোলকেতা থেকে এখানে কেউ এলে আমাকে দর্শন কর্ত্তে আসে।"

হৃদয় বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা আসবে বই কি! আপনি মহাপুরুষ, আপনাকে দেখ্তে ত আসবেই।" বাবাজী এই কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া হাসিলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই সময় অন্য একজন গোস্বামী আসিয়া ভগবান্ দাসকে কহিলেন, "দেখুন বাবাজী মশাই, অমুক বৈষ্ণব আমাদের এখানে না জানিয়ে কাল মোচ্ছব করেছে।"

ভগবান্ দাস একথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে-প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, "বটে! ব্যাটার ত বড় অহঙ্কার হয়েছে! বেটা অবৈষ্ণব! বেটাকে জুতো মেরে কণ্ঠী ছিঁড়ে নেব!"

বাবাজী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয় কহিলেন, "বাবাজী মশাই, এ কি হচ্ছে? মালা জপ করতে করতে এ সব কি রকম কথা ব'লচেন ?"

ভগবান্ দাস উত্তর করিলেন, "আমার কি আর জপ তপ আছে, সে সব অনেক কাল উঠে গেছে। তবে যে মালা ফেরাই, তা কেবল জীব-শিক্ষার জন্যে বই ত না। আমি না এ রকম কল্লে জীব উদ্ধার হবে কি করে ?"

রামকৃষ্ণদেব আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তোমার ত ভারি অহঙ্কার! তুমি জীবকে শিক্ষা দেবে? জীবকে শেখাবার তুমি কে? জীবকে উদ্ধার করবার তুমি কে হে বাপু?" তাঁহার তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাবাজীর যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ইনি যে দেখছি মহাপুরুষ। এ যে দেখ্ছি

মহা অপরাধ হয়েছে, এতক্ষণ এঁকে চিন্‌তে পারিনি।" ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেবের ভাব হইল, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়নযুগল স্তিমিত, বদনে সুমধুর হাস্য—দেখিয়া বাবাজী মহাশয়ও দণ্ডায়মান হইলেন এবং করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "তাইত আজ এ মহাপুরুষ কোথা থেকে এলেন। আজ আমার কি সৌভাগ্য।" তৎপরে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, ইনি কোথায় থাকেন? ইনি কে, মশাই?" বাবাজী এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হৃদয়ও তাহার যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। এদিকে হৃদয় অতিযত্নসহকারে রামকৃষ্ণদেবকে ধরিয়া আছেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণীর দেবালয়ে অবস্থিতি করেন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ দাস বাবাজী অতি ব্যগ্রতা সহকারে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "মশাই, আমি এঁর কাছে অত্যন্ত অপরাধী। ইনিই কি কোলুটোলার চৈতন্যমহাপ্রভুর আসনে বসেছিলেন?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

ভগবানদাস আরও কাতর ভাবে কহিতে লাগিলেন, "আমি এঁর কাছে মহা অপরাধী। এঁকে না চিন্‌তে পেরে এঁর অনেক নিন্দে করিচি। আমার এ অপরাধ ইনি না ক্ষমা কর্‌লে, আমার গতি কি হবে? আমি জানতুম না যে, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর উদয় হয়েছে। ইনিই ত সেই আসনের যোগ্য, এঁরইত সেই আসন। ইনিই ত মহাপ্রভু, আমি এঁর নিন্দে করে মহা অপরাধ করিচি। মশাই, আপনি বলুন, আমি এ অপরাধ হতে কি করে মুক্ত হব?" এইরূপ দারুণ কাতরোক্তি করিয়া ভগবানদাস ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হৃদয় আশ্বাসবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আপনার কোন শঙ্কা নেই। ইনি কারুর অপরাধ নেন না। আপনার কোন ভয় নেই মশাই।" হৃদয়ের কথায় বাবাজী যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক চরণধূলি লইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন, রামকৃষ্ণদেব তখনও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হৃদয় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তৎপরে তাঁহার কর্ণে আস্তে আস্তে শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অল্পে অল্পে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য আসিতে লাগিল, তিনি অতি ধীরে ও অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?"

হৃদয় কহিলেন, "আপনি যে ভগবান্‌দাস বাবাজীকে দেখতে এসেছেন। এই তাঁর আখড়া" হৃদয় এইরূপ দুই তিন বার বলিলে পর তাঁহার আরও বাহ্যজ্ঞান আসিল, তখন তিনি বলিলেন. "তোমার নাম ভগবান্‌দাস?"

বাবাজী কহিলেন, "আমি আপনার দাস।" হৃদয় আপনার গাত্র হইতে শালখানি খুলিয়া তথায় পাতিলেন এবং তদুপরি রামকৃষ্ণদেবকে বসাইলেন। ভগবান্ দাস আপনার পূর্ব্বে অপরাধের উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনাইয়া তাঁহাকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখনও তিনি ভাবের ঘোরে ছিলেন সুতরাং হৃদয় তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া তাঁহার মুখে তুলিয়া দিলেন কিন্তু উহা তাঁহার গলাধঃকরণ হইল না। ভগবান্‌দাস প্রাণের আবেগে হৃদয়ের নিকট আপনার নানা দুঃখের কথা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের আর পূর্ব্ববৎ সেবা চলিতেছে না; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, তাঁহার কুটীর খানি পতনোন্মুখ হইয়াছে, এমন সঙ্গতি নাই যে, তাহার সংস্কার করান। শীতকাল, ক্রমে বেলা প্রায় দশটা হইয়াছে। অনুমান করিয়া হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে সেই ঘোরের অবস্থায় লইয়া নৌকায় গমন করিলেন।

এ দিকে মথুরানাথও বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে লোক জন সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য ভগবান্‌দাসের আখড়াভিমুখে গমন করিলেন। আখড়ায় উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক ভগবান্‌দাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "মশাই, এখানে একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন বল্‌তে পারেন?"

ভগবানদাস কহিলেন, "আহা তিনি মহাপুরুষ নন, সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, তাঁর দর্শন পেলুম। তিনি অল্পক্ষণ হল এস্থান হতে গেছেন।" মথুরানাথ বুঝিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব তবে অন্য কোন পথ দিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার সহিত পথে সাক্ষাৎ হয় নাই। বিদায় লইবার সময় মথুরানাথ বাবাজীকে দশটি টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে বাবাজী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বাবাজীটি বেশ

সিদ্ধ হয়েছে। আহা দেখ মথুর, ওর ঠাকুরের সেবা চলছে না, বড়ই কষ্ট। তুমি কিছু দিয়েছ কি ?"

মথুর কহিলেন "হ্যাঁ বাবা, দশ টাকা দিয়েছি।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আরও কিছু বেশী করে দেও।" এই কথা শুনিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ আর নব্বই টাকা লোক দ্বারা ভগবান্ দাসকে পাঠাইয়া দিলেন। ভগবান্‌দাস টাকাগুলি পাইয়া কহিলেন, "আহা, দুঃখহারী মহাপ্রভু আজ আমার দুঃখ মোচন করবার জন্যেই এসেছিলেন। এখন কিছুদিন ঠাকুরের সেবা চলবে।"

এখান হইতে নৌকা নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিল। নৌকা নবদ্বীপের সম্মুখীন হইবামাত্র রামকৃষ্ণদেব ভাবে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে এতই উন্মত্ত হইলেন যে, নৌকা হইতে লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, হৃদয় অতি কষ্টে ধরিয়া রাখিলেন। ক্রমে নৌকা তীরের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার ভাব শান্ত হইল। তিনি তৎপরে তীরে উঠিয়া হৃদয়ের সহিত নবদ্বীপ পরিদর্শন করিয়া আসিলেন। কিন্তু আর কোনও স্থানে তাঁহার ভাব হইল না।

ফিরিয়া আসিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছেন, মথুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা কেমন দেখলে ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখলুম সে সব স্থান আর নেই, লোপ পেয়ে গেছে।" ঐ যে সব চড়া দেখছ গঙ্গার মাঝে, আগে ঐ জায়গায় নবদ্বীপ ছিল।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় নৌকায় উঠিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে পূর্ব্বে যে স্থানে তাঁহার ভাব হইয়াছিল, তথায় নৌকা আসিলে তাঁহার পুনরায় ভাবাবেশ হইতে লাগিল। স্থানটী অতিক্রম করিলে তাঁহার সহজাবস্থা আসিল এবং মথুরানাথ কহিলেন, "ঠিক কথা বাবা, সে সব স্থান লোপ পেয়েছে, গঙ্গার গর্ভে গেছে, নইলে তোমার ত কৈ ওখানে ভাব হল না। নৌকায় সেই একই জায়গায় ভাব হল।"

ক্রমশঃ।

লাইকার্গাস্।

গ্রীসদেশের ইতিহাস অধ্যয়নকালে প্রথমেই যাঁহাদের প্রতি নয়ন আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যে লাইকার্গাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। একটী লোকে এক সমগ্র জাতির কিরূপে উদ্ধার সাধন করিতে পারে, তাহা এই মহাত্মার জীবনে বিশেষভাবে বিবৃত। প্রাচীন গ্রীসদেশে পেলোপনেসাস্ (Peloponesus) নামে এক প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশের বর্ত্তমান নাম মোরিয়া। স্পার্টা রাজ্য পেলোপনেসাসের অন্তর্গত। এই স্পার্টা রাজ্যের উন্নতির মূলই লাইকার্গাস। লাইকার্গাসের জন্ম ও জন্মকাল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। তবে অনেকে বলেন, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। লাইকার্গাস স্পার্টার রাজবংশসম্ভূত। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলিডেকটেস্ স্পার্টার রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে রাজ্ঞী গর্ভবতী ছিলেন। রাজ্ঞী লাইকার্গাসের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার সহিত একত্রে রাজ্যভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার নবজাত পুত্রকে হত্যা করিতে পারেন। লাইকার্গাস ছল করিয়া স্বীকৃত হইলেন। রাজ্ঞী যখন সন্তান প্রসব করিলেন, লাইকার্গাস সেই নবজাত সন্তানকে বাজারে লইয়া গিয়া স্পার্টার ভবিষ্যৎ রাজা বলিয়া দেখাইলেন। ইহাতে রাজ্ঞীর ক্রোধ হইল; লাইকার্গাসের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রচার করিলেন যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে লাইকার্গাসকে দেশত্যাগ করিতে হইল।

এই সময় দেশের অবস্থা অতি শোচনীয়; স্বদেশের উন্নতিকল্পে, লাইকার্গাস ভ্রমণ করিতে করিতে নানাদেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও শাসন প্রণালীর বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন; রাজ্যে বিশৃঙ্খলার আতিশয্য ঘটিল। সকলেই প্রচলিত শাসন প্রণালীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় বহু বৎসরের পর লাইকার্গাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। লাইকার্গাস দেখি-

লেন যে, নূতন শাসনপ্রণালী ও রীতি নীতির প্রবর্ত্তন করিবার বিশেষ সুবিধা। কিছু নূতন প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে দেবতার আদেশ লওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া ডেল্‌ফির (Delphi) মন্দিরে যাইলেন এবং দেবতার সম্পূর্ণ অনুমতি ও আশ্বাসবাণী লাভ করিয়া উৎসাহের সহিত আপন অভীষ্ট কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। লাইকার্গাস একদিন সহসা ৩০ জন সশস্ত্র স্পার্টাবাসী বেষ্টিত হইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার মত প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার সংস্কারকার্য্য সহজে সম্পন্ন হয় নাই। একজন যুবক উত্তেজিত হইয়া তাঁহার একটী চক্ষু উপড়াইয়া লইয়াছিল। অবশেষে স্বদেশবাসীদিগকে প্রতিশ্রুত করিয়া লইলেন যে, যতদিন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, ততদিন তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। ইহার পর তিনি চিরকালের মত স্পার্টা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সংস্কারগুলি দেবতার পরিতোষজনক হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য ডেল্‌ফির মন্দিরে যাইলেন। ইহার পর লাইকার্গাসের বিষয় কিছু জানা যায় নাই।

লাইকার্গাস সংস্কারব্রতে দীক্ষিত হইয়া দেখিলেন, স্পার্টার অবস্থা অতি শোচনীয়; চতুর্দ্দিকে শত্রুদিগের রাজ্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত।

তিনি স্থির করিলেন, স্পার্টার উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহাকে বীরপ্রসবিনী হইতে হইবে, তূণীর কৃপাণের পূজা করিতে হইবে; কোমল মনোবৃত্তির অলস আবেশে মুগ্ধ হইলে চলিবে না।

লাইকার্গাসের সংস্কারের মধ্যে দেশশাসনসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার কথা বলিব না; কি প্রকারে স্পার্টানদিগকে এক পরাক্রান্ত জাতিতে সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই বলিব।

লাইকার্গাসের সংস্কারগুলি সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যঞ্জক। তিনি দেখিলেন, স্পার্টানদিগের উন্নতিসাধন করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জীবনযাপন করিতে হইবে; এই জন্য কতকগুলি ব্যবস্থার প্রণয়ন করেন; এই ব্যবস্থানুসারে স্পার্টান্ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত চালিত হইয়াছিল। ফলতঃ লাইকার্গাসকে স্পার্টান্ রাজ্যের মনু বলা যাইতে পারে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। লাইকার্গাসের ব্যবস্থাগুলি বলা যাইতেছে—জন্মগ্রহণের পর স্পার্টান্ শিশুকে প্রকাশ্যে সকলসম্মুখে আনয়ন করা হইত, বিকলাঙ্গ কিম্বা দুর্ব্বল হইলে তাহাকে টেজেটাস পর্ব্বতে ফেলিয়া রাখা হইত,

সেইখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিত। সপ্তমবর্ষ পদার্পণ করিবার পর পিতা মাতার পুত্রের উপর কোন কর্তৃত্ব থাকিত না। তাঁহাকে রাজার অধীনে থাকিয়া অন্যান্য বালকের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক শিক্ষালাভ করিতে হইত। শারীরিক ব্যায়াম ও সমরকৌশলের শিক্ষা ভিন্ন শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত।

লাইকার্গাস নিয়ম করিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য আর্টিমিসের (Artemis) দেবালয়ের বেদীর সম্মুখে কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে এবং যতক্ষণ না শরীর হইতে রক্ত বাহির হইয়া বেদী রঞ্জিত ও প্লাবিত হয়, ততক্ষণ নীরবে প্রহার সহ্য করিতে হইবে। এই পরীক্ষার সময় তাহার পিতামাতা ও নগরের সমস্ত লোকেরা উপস্থিত থাকিতেন। অনেক যুবক এই প্রকার প্রহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্পার্টান্ যুবকেরা শীত গ্রীষ্মে একই পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পাইতেন; তাহাদিগকে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিতে দেওয়া হইত না; উদরপূর্ণ করিবার জন্য পর্ব্বত কিম্বা অরণ্যে শীকার করিতে হইত। স্পার্টান যুবকদিগকে কৌশলের সহিত চুরি করিতে উৎসাহ দেওয়া হইত, কিন্তু ধরা পড়িলে অতিশয় কঠোর শাস্তিভোগের ব্যবস্থা ছিল। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন যে, কোন স্পার্টান যুবক একটি শৃগাল চুরি করিয়া তাহাকে আপনার পরিহিত বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; শৃগালটী তাঁহার উদরস্থ অন্ত্র চর্ব্বণ করিতে লাগিল, তথাপি প্রকাশিত হইবার ভয়ে নীরবে সে তাহা সহ্য করিতে লাগিল। সমরকৌশলের সহিত সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই দেখিয়া, স্পার্টান যুবকদিগকে সাহিত্যচর্চ্চা অবহেলা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। ওজস্বিনী বক্তৃতা কিম্বা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত; অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। ত্রিংশৎ-বর্ষ পূর্ণ হইলে স্পার্টান যুবক যৌবনসীমা অতিক্রম করিতেন গণ্য করা যাইত এবং এই সময় বিবাহ করিবার ও রাজনীতি আলোচনা করিবার কিম্বা রাজ্যসংক্রান্ত পদপ্রার্থী হইবার অধিকার হইত; কিন্তু তখনও কঠোর নিয়ম অনুসারে চলিতে হইত এবং পরিণীত স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিতে কিম্বা একত্র আহার করিতে পাইতেন না। স্পার্টানেরা ৬০ বৎসরের সময় সমস্ত কঠোর নিয়মের শাসন ও যুদ্ধকার্য্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন।

লাইকার্গাস যে মূলমন্ত্রে সমগ্র স্বদেশবাসীকে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য।

আমায় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, বাঙ্গালি জাতি এত অধঃপতিত কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার এই সরল সহজ উত্তর দিই যে, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত অভাব। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে আমরা মোটামুটি যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দরূপে ইহার ব্যবহার করি নাই।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শারীরিক, মানসিক কিম্বা আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে হইলে ইন্দ্রিয়-সংযম একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা কোন ব্যায়ামালয়ে বা আখড়ায় ব্যায়াম ক্রীড়া করেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন যে, তথায় সংযমের কি প্রকার আদর। সংযমের সামান্য শৈথিল্যে তথায় তাঁহাদিগকে তিরস্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খেলার প্রতিযোগিতার (Match) কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে খেলোয়াড়দিগকে অত্যন্ত কঠোর সংযমের সহিত জীবনযাপন করিতে হয়। মানসিক উন্নতির সহিত সংযমের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। জ্ঞানরাজ্যে যাঁহারা অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চিরকুমার, কিম্বা বিবাহ করিয়াও ঘোর সংযমী। নিউটন, হীন, ক্যাণ্ট ইহারা সকলেই অবিবাহিত; আর জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, কার্লাইল, হাক্সলি, মিল, টিণ্ডাল, ডারউইন প্রভৃতি বিবাহ করিয়াও ঘোর সংযমী। আমরা দেখিলাম, উন্নতি ও সংযমে কত নিকট সম্বন্ধ; একটি অপরটির প্রসূতি-স্বরূপ।

কামসংযম বা ইন্দ্রিয়সংযম এত প্রয়োজনীয় যে, অনেক স্থলে শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্যের সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ইহার অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই।

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥"

ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ মনু গম্ভীর ভাবে বলিয়াছেন :—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥" (২,২১৫)

ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ইহা অতিরঞ্জিত নহে।

লাইকার্গাস দেখিলেন যে, স্পার্টার উন্নতি করিতে হইলে তাহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিতে হইবে; নিয়ম করিলেন, সকলকে এক সঙ্গে আহার করিতে হইবে; তাঁহারা ১৫ জন করিয়া এক সঙ্গে আহার করিতেন। আহারের সময় ধনী কিম্বা দরিদ্রের সন্তান বলিয়া কোন ইতরবিশেষ ছিল না। সকলেই একই খাদ্য আহার করিতেন। প্রত্যেককে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যব, মদ্য, পনীর ইত্যাদি এবং মৎস্য মাংস ক্রয় করিবার জন্য সামান্য অর্থ চাঁদা দিতে হইত। স্পার্টান যুবকেরা সময় সময় মাংস খাইতে পাইতেন। স্ত্রীলোকদিগকেও পুরুষের ন্যায় কঠোর নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে হইত। তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার ব্যায়ামক্রীড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ২০ বৎসরের সময় স্পার্টাদেশীয়া স্ত্রীলোকেরা বিবাহ করিতে পাইতেন এবং এই সময় হইতে রাজ্যের সাধারণ শাসন হইতে অব্যাহতি পাইতেন। স্বামীর সহিত স্ত্রীর সংস্রব অতি অল্পই ছিল এবং উভয়ের একত্রাবস্থান সাধারণতঃ ঘটিত না। স্বামী স্ত্রীকে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। স্ত্রী, স্বামী ও পুত্রের সমরসজ্জা করিয়া দিতেন এবং সমরক্ষেত্রে যাইবার জন্য উত্তেজিত করিতেন। স্পার্টান স্ত্রীলোকেরা পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইবার সময় বলিতেন, হয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, নচেৎ যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিবে। লাইকার্গাস সর্ব্বপ্রকার বিলাস ও ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার বিরুদ্ধে নিষেধার্থক নিয়মের প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসরণ করিয়াই স্পার্টা অচিরকালমধ্যে এক সমরকুশল জাতি হইয়া উঠিল এবং শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপিত করিল। এই নিয়মানুসরণ না করিলে স্পার্টার ইতিহাস গ্রীসদেশের ইতিহাসের এক সামান্য অধ্যায়ে পর্য্যবসিত হইত। শুভলগ্নে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই স্পার্টার স্মৃতি এখনও বিস্ময়ের সহিত বিজড়িত। কত শত রাজ্যের উদ্ভব ও তিরোধান হইল, অনন্তকালসাগরের কোথায় লীন হইল, কিন্তু স্পার্টার গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত। আর বর্ত্তমান ভারত? বুঝি বিভিন্ন জাতির সহিত প্রতিযোগিতায়

অসমর্থ হইয়া চিরকালের মত পিছনে পড়িল, বুঝি যোগ্যতমের উদ্বর্তন রূপ (Survival of the fittest) প্রাকৃতিক নিয়মের জলন্ত দৃষ্টান্ত হইল। স্পার্টারাজাকে শত্রুদিগের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিতে লাইকার্গাসের জন্ম হইয়াছিল, ভারতকে রক্ষা করিতে কি কেহ জন্মিবে না? স্পার্টা বহু-শতাব্দী ব্যাপী নিদ্রার আবেশ হইতে জাগিয়াছিল, ভারত কি জাগিবে না?

শ্রীমনোমোহন গাঙ্গুলি।

মসুরির পথে গঙ্গোত্রী।

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, দেহরাডুন।)

গঙ্গোত্রী নাম বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অবিদিত নহে। ইতিপূর্ব্বে কয়েক জন কীর্ত্তিমান্ লেখক গঙ্গোত্রী যাত্রার বিবরণ লিখিয়াছেন। সচরাচর যাত্রিগণ হরিদ্বার ও হৃষীকেশ হইয়া টিহরীর পথ দিয়াই যাত্রা করিয়া থাকেন। গত ১৩১০ সালের চৈত্র মাসের উদ্বোধনে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মল্লিক মহাশয় এই পথের পরিচয় দিয়াছেন। পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহাশয়ও "তিব্বতে তিনবৎসর" প্রবন্ধে মসুরির পথে তিব্বৎ যাত্রা করিয়া কিরূপ ধৈর্য্যসহকারে কষ্ট স্বীকার করিয়া সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও অতীব কৌতুহলপ্রদ সন্দেহ নাই। কিন্তু মসুরির পথের পরিচয় বোধ করি অনেকে জানেন না। বিশেষ বদরিনারায়ণ ও কেদারের পথে যেরূপ যাত্রিসমাগম ও যেরূপ পান্থশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে, এ পথে সেরূপ সুবিধা নাই। সম্প্রতি আমাদের বিশেষ পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন স্বামী আনন্দপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী তীর্থ দর্শন করিয়া দেহরাডুন সহরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠক এই মহাত্মার সহিত পরিচিত নহেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ক্রমে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দিবার বাসনা আছে। নাহান রাজ্যের এলাকাভুক্ত রেণুকা তীর্থের বর্ণনকালে তাঁহার মনোরম গৌতমাশ্রম ও কুণ্ডের সহিত আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিব। আপাততঃ তাঁহার নিকট স্বকর্ণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি এবং এতদ্দেশবাসনিবন্ধন পাহাড়ী দেশের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। মসুরি হইতে গঙ্গোত্রী যাইতে ১৫টি পড়ওয়া বা আড্ডা পড়ে। আমি ক্রমান্বয়ে তাহদের বিস্তৃত বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে দেহারাদুন পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরাবধি যে রেলপথ চলিতেছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এই দেহরাদুন সহরের দক্ষিণ দিকে শিবালিক্ এবং উত্তরে হিমালয়ের পাহাড়গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহর হইতে উত্তর মুখে রাজপুররোড্ নামে একটী প্রশস্ত রাস্তা মসুরীর দিকে গিয়াছে। এই রাস্তায় টমটম্, টঙ্গা, পালকি গাড়ী প্রভৃতি, সকল প্রকার যানের সুবিধা আছে, এই পথের ৭ মাইল পথ যাইয়া রাজপুর নামক একটী ক্ষুদ্রগ্রামে গাড়ী ছাড়িয়া ডাণ্ডী অথবা ঘোড়া ভাড়া করিয়া পাহাড়ী পথ দিয়া ৬ মাইল উঠিলে মসুরি এবং তথা হইতে ১ মাইল দূরে ল্যাণ্ডোরে পৌঁছান যায়। অবশ্য যাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া চলিতে পারেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের স্বামীজীর মত লোক অক্লেশে মসুরি হইতে দিনে দুইবার উঠা নামা করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ল্যাণ্ডোর বাজার হইতে একটী পাহাড়ী রাস্তা টিহরীর দিকে গিয়াছে। নিকুঞ্জ বাবু ইহাকে কার্টরোড বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা কার্টরোড্ নহে। এ রাস্তা দিয়া কোন গাড়ী যাতায়াত করে না, কেবল ডাণ্ডী বা ঝাঁপানে চড়িয়া বড়লোকেরা যাতায়াত করিতে পারেন। পাহাড়ী কুলিরাও পিঠে করিয়া মাল বহন করিয়া লইয়া যায়। এ ছাড়া এক রকম পাহাড়ী ছাগল আছে। তাহাদের পিঠের দুই দিকে দুইটি থলি বাঁধিয়া দিলে, তাহারা ১৫ সের অবধি মোট বহিয়া লইতে পারে।

(১) ল্যাণ্ডোর হইতে টিহরীর পথে ৩ মাইল যাইলে সওয়াখালি। এই স্থান হইতে একটী পাকডাণ্ডী (সাবে-পোর) রাস্তায় ১০ মাইল পথ চলিলে ধরাসু (বা দারাসু) নামক চটিতে পৌঁছান যায়। কিন্তু এই পথ গ্রীষ্ম ঋতু ব্যতীত অন্য সময় অগম্য। এই জন্য টিহরীর পথই প্রশস্ত।

(২) সওয়াখালি হইতে কাল্পকি ৩ মাইল। এখানে দেহরাদুনের মোহন্ত লছমনদাসের একটী দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। ইহার চারিটী কুঠুরী, তন্মধ্যে একটী বড় হল। এই সব স্থান টিহরীর রাজার এলাকাভুক্ত জৌনপুর পরগণার অন্তর্গত। এই সব জায়গার জঙ্গলে চিড় (বা দেবদারু), ঝোঁপ প্রভৃতি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক রকম জঙ্গলী গোলাপ জন্মে, তাহাকে এদেশে কুঁজো বলে। ইহা হইতে যে আতর প্রস্তুত হয়, তাহার তরি ৪।৫ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়।

(৩) কাল্পকি হইতে বুরুট ৯ মাইল। এখানে টিহরীর রাজার একটী

ডাকবাংলা আছে। ৪।৫ খানি দোকান এবং তন্মধ্যে একটী ধর্ম্মশালা আছে।

(৪) খুমুটী হইতে কদ্দুখালা ৫ মাইল। এখানে বামদিকে একটী উচ্চ পর্ব্বত আছে। ইহার উপরে ছিন্নমস্তার মন্দির আছে। এতদ্দেশে ইহাকে শ্রীখণ্ডা দেবীর মন্দির বলে। প্রবাদ এই যে, দশমহাবিদ্যারূপধারিণী ভগবতী শিবকে এইখানে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি দর্শন করান। এই পাহাড় আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অতি অপরূপ শোভাধারণ করে। তখন দূরে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার, বদরিনাথ ও চক্রাটার পাহাড় সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের চতুর্দিকে অযত্নপ্রসূত ফুলের বাগান আছে। মন্দিরে ২টী কুঠুরী ও নিকটে একটী কুণ্ড আছে।

(৫) কদ্দুখালা হইতে কাণাতাল ৪ মাইল। এখানে দুইটী ধর্ম্মশালা আছে। একটী প্রসিদ্ধ বাবা কালা কমলীওয়ালার প্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা। এই মহাত্মা কাশী অঞ্চলে বিশুদ্ধানন্দ স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় ও উদ্যোগে কেদারখণ্ডের প্রধান প্রধান তীর্থে ও হরিদ্বার কাশী প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থেও যাত্রীদিগের জন্য ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি হৃষীকেশেই অধিককাল বাস করিতেন। এখন পরহিতব্রতপালন করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন। শুধু তীর্থে কেন, তীর্থের পথেও অনেক স্থানে এইরূপ ধর্ম্মশালা, সদাব্রত ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে তীর্থ-যাত্রীদিগের কি পরিমাণ সুবিধা হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে সহজে বুঝিতে পারিবেন না। সম্প্রতি শ্রীরামনাথজী এই সব পঞ্চায়তী ছত্রমণ্ডলীর ম্যানেজার। অপর ধর্ম্মশালাটী টিহরীর কোতোয়াল শিবদত্ত প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এটী ভারি অপরিষ্কার। কাণাতালের পাহাড় মসুরী হইতে উচ্চ ও অধিক ঠাণ্ডা। এখানে টিহরীর রাজা সেউ নাসপাতি, চিলু ইত্যাদি ফলের বাগান নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহার চারিদিকে আলুর ক্ষেত। পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালার নিম্নে একটী ঝরণা আছে। এই স্থানের মাটি হরিদ্রাবর্ণ এবং এঁটুলে, বেশ বসবাসের উপযুক্ত। সাহেবেরা ছাউনীর জন্য এই স্থানটী পছন্দ করেন, কিন্তু টিহরীর রাজা তাহা দিতে চাননা। এই পাহাড় হইতে ১৬ মাইল দূরে টিহরী রাজার গ্রীষ্মাবাসভবন প্রতাপনগর নামক স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। অপর একটী ত্রিকোণ পর্ব্বতও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একদিকে দেবপ্রয়াগ একদিকে শ্রীনগর ও অপরদিকে টিহরী।

শিখরদেশে ভুবনেশ্বরী দেবার মন্দির আছে। নিকুঞ্জ বাবু ইহাকে দেবী চন্দ্রবদনা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, এ মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, তান্ত্রিকমতে যন্ত্রে পূজা হয়। এপাহাড়টী টেহরী হইতে ১৮ মাইল দুরবর্ত্তী। চারিদিকে পাহাড়ী গ্রাম। জঙ্গলে বন্যশুক, হরিণ, ঘোল (জঙ্গলী ছাগল, বন্যকুক্কুট প্রভৃতি নানাবিধ জন্তু বাস করে। কানাতাল হইতে এক মাইল দুরে একটী দোকানের কাছে দুটী রাস্তা মিলিয়াছে। একটী দক্ষিণ দিকে টিহরীর রাজধানীর দিকে গিয়াছে, অপরটী গঙ্গোত্রীর পথ। এখান হইতে টিহরী ১২ মাইল দূরবর্ত্তী।

(৬) কাণাতাল হইতে বড়িয়ানা ৯ মাইল। এ পথ ক্রমশঃ উৎরাই। এখানেও দুটী ধর্ম্মশালা ও দুটি অশ্বথগাছ আছে। গঙ্গা এখান হইতে আন্দাজ ২০০ ফুট নিম্ন হইবে। লোকে সচরাচর ঝরণার জলই ব্যবহার করে।

এখান হইতে আধ মাইল দূরে একটী সেতু আছে। উহা পার হইয়া ৭ মাইল চড়াই উঠিলে প্রতাপনগর যাওয়া যায়। আর একটি রাস্তা গঙ্গার ধারে ধারে বরাবর টিহরী হইয়া হৃষীকেশাভিমুখে গিয়াছে। টিহরী এখান হইতে ১০ মাইল এবং হৃষীকেশ ৬১ মাইল।

(৭) বড়িয়ানা হইতে নোগুণ ১০ মাইল। এখানে একটী শিবমন্দির ও দুইটি ধর্ম্মশালা আছে, কোন দোকান নাই। লোকজনের বসবাস দৃষ্ট হয় না। মন্দিরে একজন ঘরবারি (গৃহস্থ) সাধু পুত্র পরিবার লইয়া বাস করেন। নিম্নে ধানের ক্ষেত ও গঙ্গা নদী। একটী পাহাড়ী নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হওয়ায় স্থানটী অতি সুদৃশ্য ও মনোরম দেখায়। কিন্তু এই সমস্ত চটিতে ছারপোকা ও পিশুর দৌরাত্ম্যে রাত্রে নিদ্রা যাইবার যো নাই।

(৮) নোগুণ হইতে দারাসু ৫ মাইল। প্রবাদ— এখানে ব্যাসমুনি তপস্যা করিতেন। এখানে একটী দহ আছে, তাহাকে ব্যাসকুণ্ড বা সূর্য্যকুণ্ড) বলে। এখানেও পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা ও একটী অশ্বত্থ গাছ আছে এবং একটী পাহাড়ী নদী গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। তার পর কাটের সেতু পার হইলে টিবায় ডাক বাংলা। নিম্নে রাস্তা যমুনোত্রীর দিকে গিয়াছে। এই রাস্তায় যমুনোত্রী ৪ দিনের পথ। পাঙ্গোর গ্রাম অবধি রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে। বাকি ১২ মাইল পথ বাকি আছে। যমুনোত্রীপথের নিম্নে দক্ষিণ দিকে গঙ্গার ধারে ধারে যে রাস্তা গিয়াছে, সেটি উত্তরকাশীর দিকে। এই স্থানে কোন সাধু একটী আমবাগান লাগাইয়াছিলেন, এখন তাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

(৯) দারাসু হইতে টুণ্ডা ৯ মাইল। এখানেও একটী ধর্ম্মশালা আছে। গঙ্গার ধার দিয়া রাস্তা জঙ্গলাকীর্ণ। রাস্তায় জল পাওয়া যায় না। পথে যাইতে পরপারে ৩।৪ খানি গ্রাম দেখা যায়—দূরে দেখিতে অতি সুন্দর। থরে থরে গঙ্গার দিকে ক্ষেত নামিয়াছে, তাহাতে পাহাড়ী ঝরণার জল সেচন করা হয়। টুণ্ডার চটির কাছে একটী পাহাড়ী দেবীর মন্দির আছে। শীত-কালে পূজা বন্ধ থাকে। গ্রীষ্মকালে যাত্রিসমাগমে পূজারী ও দোকানদারের শুভাগমন হয়। পাহাড়ী মেলাও মধ্যে মধ্যে বসিয়া থাকে। এখানে শীতকালে উচ্চপর্ব্বতবাসীদের গোমাহষাদি আশ্রয় লাভ করে। পথে একটী নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাকে ভুবগঙ্গা বলে। পার হইবার জন্য একখানি মাত্র কড়িকাঠ বসান আছে। পরপারে গঙ্গায় একটি ঝোলা। ঝোলার পার্শ্বে একটী দ্বিতল ধর্ম্মশালা। এখানে একজন জঙ্গম সাধু (দক্ষিণ-দেশবাসী শিবোপাসক) দুইটী গরু লইয়া ঈশ্বর চিন্তা করেন। এখান হইতে বরুণা নদীর পোল ৪ মাইল অন্তর। সেখান হইতে উত্তরকাশী আড়াই মাইল মাত্র। বরুণা হইতে এক মাইল দূরে গঙ্গার ধারে শিখেরা গ্রন্থসাহেব রাখিবার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন।

(১০) দারাসু হইতে উত্তরকাশী (দারাট) ৯ মাইল। এখানে বিশ্বে-শ্বরের মন্দির প্রধান। এই মন্দিরের ছাদ ভেদ করিয়া একটী প্রকাণ্ড ত্রিশূল দণ্ডায়মান। এই মন্দির শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে গুরখাদের আমলে ইহা নির্ম্মিত হয়। সম্বৎ ১৮৮২ সনে এইদেশে একটী প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। তাহাতে সমস্ত প্রাচীন মন্দিরাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। অন্যান্য দেবতার মধ্যে অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর ভৈরব, পরশুরাম ও দত্তাত্রেয় এই কয়েকটী দেবদেবীর মন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য লোকেরও ৩।৪ টী মন্দির আছে, এক মাইল দূরে দুর্গার মন্দির। তথা হইতে আধ মাইল দূরে ডাক বাঙ্গলার নীচে কোটেশ্বর (অথবা লাক্ষেশ্বরের) মন্দির। এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁহারা ছত্রে গিয়া ডালরুটি ভিক্ষা করিয়া খান আবার অগ্রহায়ণ মাসে ছত্র যখন হৃষীকেশে নামিয়া আসে, তখন তাঁহারাও তথায় আসিয়া বাস করেন।

উত্তরকাশীতে জয়পুরের মহারাজার একটী দেবালয় আছে। তাহার নাম কুঞ্জী। তথায় পাঁচটী লোকের নিত্য আহারের বন্দোবস্ত আছে।

অধিক হইলে ভাগে কুলায় না। এজন্য তিনখানি পুরি দিবার ব্যবস্থা। ৮ সের করিয়া চাউল রাঁধিবার নিয়ম। কিন্তু একসের মাত্র রসুই হয়। জয়পুরের রাজা একটী ধর্ম্মশালাও নির্ম্মাণ করাইতেছেন। পঞ্চায়তী ছত্রে সাধুদিগের জন্য সদাব্রত খোলা আছে। যে ইচ্ছা খাইতে পায়, সিধাও পায় কিন্তু গরীব যাত্রীদিগকে থাকিতে দেয় না। বড়মানুষদিগকে অর্থলোভে আশ্রয় দিয়া থাকে। এই ছত্রে গঙ্গাদাস নামে একজন পাঞ্জাবী সাধু বৈদ্য আছেন। ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কামিনী ও কাঞ্চন (সামাজিক উপন্যাস) শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

'কামিনী কাঞ্চন' কথাটী শুনিলেই আজকাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে। কারণ, ঈশ্বরলাভের পথে 'কামিনীকাঞ্চন' যে বিশেষ প্রতিবন্ধক, তাহা ইনিই আজকাল বিশেষ ভাবে ও বারবার বলিয়াছেন। এই কারণে সংবাদপত্রে এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলেই সমালোচনার জন্য গ্রন্থখানি পাইবার পূর্ব্বেই গ্রন্থখানি আনাইয়া আগ্রহসহকারে উহা পড়িয়াছিলাম।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন ;—

'কামিনীকাঞ্চনবিজয়ী, পরমযোগী ভক্তবৎসল পরমহংসদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আজি ধ্যানে সেই ছবি দেখিতেছি। আমার এ মানসী মূর্ত্তি, আমার চোক দিয়া দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত ভক্তমণ্ডলী ইহার বিচার করিবেন। পরন্তু কোন অংশে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে আমার উপর রাগ না করিয়া তাঁহারা নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। কেননা, তাঁহার প্রকৃত ভক্ত বা ভগবান্ জানিত মহাত্মার পদরেণুরও আমি যোগ্য নহি।'

গ্রন্থকার মহাশয়ের এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও আমরা সত্যের অনুরোধে এবং সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে বাধ্য যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকৃতভাব আরও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম

করিবার চেষ্টা করিলে ভাল করিতেন। অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় উপন্যাস যখন তিনি লিখিতে বসেন নাই, তখন তাঁহার লিখিবার পূর্ব্বে একটু বিশেষরূপ দায়িত্ববোধ করা কর্ত্তব্য ছিল।

আমরা বইটী পড়িবার পর অনেকে আমাদিগকে বইখানি কিরূপ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে যেরূপ বলিয়াছি, সাধারণের সমক্ষেও তাহাই বলিতেছি। বইখানি মন্দ হয় নাই। পরমহংস-দেবের ভাব মাঝে মাঝে বেশ চিত্রিত হইয়াছে—মাঝে মাঝে একটু খাপ-ছাড়াও হইয়াছে।'

দুইটী চরিত্র দ্বারা গ্রন্থকার কামিনী ও কাঞ্চনের মোহকরী শক্তি ও মানুষের তাহাতে কতদূর পর্য্যন্ত অধঃপতন হয়, তাহা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 'কামিনি' অংশ অপেক্ষা 'কাঞ্চন' অংশটী আমাদের অধিক ভাল লাগিয়াছে।

গ্রন্থ পড়িয়া গ্রন্থকার পরমহংসদেবের আদর্শটী ঠিক ধরিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণ কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত সংসারী জীবও কিরূপে কঠোর সাধনাবলে উভয়ের কবল হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তাহা না দেখাইতে পারিলে পরমহংসদেবের ভাব ঠিক বুঝান হইল না। গ্রন্থকার যাহা আঁকিয়াছেন, তাহা কিছু নূতন নহে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপন্যাসিকগণও কেহ কেহ তাহা অপেক্ষাও উত্তমরূপে এ চিত্র আঁকিয়াছেন। এ হিসাবে গ্রন্থে কিছু নূতনত্ব নাই। পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি ও সাধ্বী পত্নীর চেষ্টায় ও প্রার্থনায় সে আসক্তি হইতে অব্যাহতি লাভ এবং কাঞ্চনের অতিরিক্ত লোভে আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশসাধনচেষ্টা উপন্যাসজগতে কিছু নূতন নহে। তবে ইহার মধ্যে 'রামপ্রসাদের' কথা মধ্যে মধ্যে আনিয়া একটু ধর্ম্মভাবের চাটনি দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তাহাও আজকালকার কালে অনেক উপন্যাসের ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক, গ্রন্থকার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া দুই একটী অপ্রিয় কথা বলিলাম বলিয়া তিনি যদি অসন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্র উত্তমরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করেন, তবে—তাঁহার লিখিবার শক্তি আছে—তিনি ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন ভাব অবলম্বনে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অনেক উপন্যাস রচনা করিয়া সাধারণের অনেক কল্যাণ করিতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।] [পূর্বপ্রকাশিতের পর।]

ফাল্গুন মাস, হৃদয় ছুটী লইয়া সিহোড়ে যাইবেন তাহার সমস্ত আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু মনটা যেন ভাল নয়, বুকের ভিতরে যেন কি হইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার মাতুলের নিকট আসিলেন, বলিলেন, "মামা, ছুটী পেয়ে মনে কর্লুম বাড়ী যাব, পুঁটলী পাঁট্লা সব বাঁধ্লুম, কিন্তু মামা, বুকের ভেতর যেন কেমন কচ্ছে, যেতে যেন মন সরচে না। তা যাব না মামা, তুমি কি বল ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "একে ত ছুটি পাস্নি। কত জোরে ছুটি পেলি, তা যাবিনি কেন ?"

হৃদয় কহিল, "কি জানি মামা, বুকের ভেতর কি রকম করে উঠ্চে। আমি যাব না মামা।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তবে যাস্নি, থাক্।" হৃদয় তখনি যাইয়া তাঁহার পুঁটলি খুলিয়া ফেলিলেন, তবে একটু শান্তি বোধ করিলেন। প্রতিদিন রাত্রিকালে মা কালীর ভোগ আরাত্রিকের পর হৃদয় সেই ভোগের প্রসাদ আনিয়া রামকৃষ্ণদেবকে আহার করাইতেন। অদ্য সন্ধ্যার পর হইতেই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; মা কালীর ভোগ আরাত্রিক হইয়া গেল, হৃদয় মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তিনি যাই বলিয়া পুনরায় মাতার সহিত কথায় মগ্ন হইতেছেন, আসিতেছেন না। তাঁহার মাতা সেই নহবতখানাতেই অবস্থিতি করিতেছেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইলে রামকৃষ্ণদেব আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার মাতাও প্রসাদ পাইয়া আপনার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। চন্দ্রাদেবী প্রতিদিনই অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। কিন্তু পরদিন প্রায় আটটা বাজিয়া গেল, তখনও তিনি দ্বার খুলিলেন না। কালীর মা নামক মন্দিরের একজন দাসী প্রতিদিন সকালে আসিয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহকার্য্যে সাহায্য করিত। অদ্য সে ঘরের অনতিদূর হইতে ঘড় ঘড় শব্দ ও দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দৌড়িয়া হৃদয়কে সম্বাদ দিল। হৃদয় যাইয়া দেখিলেন,

দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ এবং ভিতর হইতে ঘড় ঘড় শব্দ আসিতেছে, ডাকিয়া চন্দ্রদেবীর সাড়া পাইলেন না। হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে সমস্ত [illegible] চিন্তিত ও অস্থির হইয়া কহিলেন, "অ হৃদু, দরজা কাটতে হবে না কি? দীনু খাজাঞ্চি যে রকমের লোক, দরজা কাটান মুস্কিল। কি করা যায় বল্ দেখি? কি করে দরজা খোলা যায়?" এই বলিতে বলিতে তাঁহারা চন্দ্রাদেবীর দরজার নিকট আসিলেন। হৃদয় দরজা ফাঁক করিয়া একখণ্ড লোহার শিক দিয়া হুড়কা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, বৃদ্ধা বমনাদি করিয়া তদুপরি পড়িয়া অচৈতন্য রহিয়াছেন, গলা ঘড় ঘড় করিতেছে। রামকৃষ্ণদেব তদ্দৃষ্টে হৃদয়ের গলা জড়াইয়া বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ভাগ্যে হৃদু কাল তুই যাস্‌নি। তুই না থাক্‌লে আমার মাকে কে দেখ্‌ত, কে বা দরজা খুল্‌ত।" হৃদয় তাঁহাকে একটু শান্ত করিলেন, পরে বাহিরে একটী শয্যা পাতিয়া তদুপরি চন্দ্রাদেবীকে অতি কষ্টে শয়ন করাইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন যে, এই সময়ে কবিরাজী ঔষধ কিছু খাওয়াইলে ভাল হয়। হৃদয় তৎক্ষণাৎ এঁড়িয়াদহের অভয় কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া মধুর সহিত সেবন করাইতে লাগিলেন এবং গঙ্গাজল মুখে দিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিন দিন অতীত হইলে চতুর্থ দিবসে, অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন তাঁহার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইলে তাঁহাকে হৃদয় তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় লইয়া গেলেন। চন্দ্রাদেবী হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "দেখিস্ হৃদু, যেন গঙ্গা পাই।" রামকৃষ্ণদেব অমনি ব্যস্ত হইয়া পুষ্প চন্দন তুলসী লইয়া মাতার চরণে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "ওই শরীর হতেই এই শরীর হয়েছে।" তিনবার অঞ্জলি দিয়া আপনার ঘরে যাইয়া বসিলেন। হৃদয়কে কহিলেন. "তুই মুখ অগ্নি কোরগে।" হৃদয় কহিল, "তা কি হয়? রামলাল করবে।" ভ্রাতষ্পুত্র রামলাল সমস্ত কার্য্য করিলেন। রামকৃষ্ণদেব শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিলেন না। সেইজন্য সমস্ত কার্য্যাদি শেষ হইলে একদিন কহিলেন, "আমি ত মার কোন কাজই কর্‌লুম না, তা তর্পণটা করি," বলিয়া গঙ্গায় তর্পণ করিতে গেলেন। কিন্তু অঞ্জলি করিয়া জল তুলিবামাত্র অঙ্গুলি অসংলগ্ন ও বক্র হইয়া সমস্ত জল পড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই হস্তদ্বয় বিকৃত হইয়া জল পড়িয়া

যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ক্রন্দনপূর্ব্বক এই কথা বলিতে বলিতে ফিরিয়া আসিলেন, "মা আমায় তর্পণটাও কর্‌তে দিলিনি মা।" রামকৃষ্ণদেবের কর্ম্মত্যাগ সমস্তই এই প্রকার। তাঁহার পূজাত্যাগও এই প্রকার; পূজা করিতে গিয়া পুষ্প বা অর্ঘ্য আপনার মস্তকে দিয়াই বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন আর তখন কে পূজা করিবে? পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য পুষ্প হস্তে লইলে হয় উহা পড়িয়া যাইত নচেৎ হাতের পুষ্প হাতেই থাকিয়া যাইত, বাহ্যজ্ঞান চলিয়া যাইত, তখন আর কে পুষ্পাঞ্জলি দেয়?

রামকৃষ্ণদেবের আদেশ মত হৃদয় তিন বৎসর দুর্গাপূজা করিয়াছেন, তিন বৎসরই তাহা সমভাবে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। হৃদয়ের তথাপি ইচ্ছা যে, তিনি প্রতিবৎসরই পূজা করেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার অল্পদিন পরে রামকৃষ্ণদেবকে সেই জন্য পুনরায় অনুমতি দিতে বলিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "হৃদু, তোর যেমন পূজা হইয়াছে, অমন আর কারুর হয় না। তোর পূজার উদ্‌যাপন হয়ে গেছে, আর পূজা করবার দরকার নেই, তুই আর পূজ করিস্ নি। কেমন জানিস্, এক জনের জন্যে যদি বিছানা করে রাখিস্ আর সে যদি একবার এসে তাতে বসে, তাহলে আর তার জন্যে বিছানা করতে হয় না। তুই আর পূজা করিস্‌নি।"

হৃদয় এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মামা যাহাই বলুন না কেন, তিনি পূজা করিবেন। প্রকাশ্যে কহিলেন, "লোকে যে, যতদিন বাঁচে ততদিন পূজা করে, তার কি?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ্, তুই যাদের কথা বলছিস্, তাদের কি ঠিক পূজা হয়? মা কি আসেন? সেই জন্যে তারা বার বার পূজা করে। কিন্তু তোর যা হয়েছে অমন আর কারুর হয় না।" হৃদয় এ প্রকার কথায় বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন, "মামা যাই বলুন আমি পূজা কর্ব্বই কর্‌ব।"

কিছুদিন পরে উত্তরায়ণে সংক্রান্তির দিনে হৃদয়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা রাঘব ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাঘব দুর্গোৎসবের সমস্ত খরচ দিতেন। সুতরাং রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই যে পূজা করবি বলিস্, এখন কে খরচ দেবে, আর কি করেই বা পূজা করবি?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "আমি যেমন করে পারি কর্‌ব।" হৃদয় মনে ভাবিলেন, এবার হইতে মথুরের নিকট সমস্ত খরচের টাকা লইবেন। যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব নানাপ্রকারে তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, দুর্গাপূজা আর তাঁহার

করা উচিত নহে, কিন্তু কোন কথাই হৃদয়ের মনে স্থান পাইল না। তিনি বলিলেন, "যখন তুমি বলেছ যে, তিন বৎসর পূজা করবি, সেই জন্যেই তুমি এখন আর পূজা করতে নিষেধ করছ। তুমি কেন বল না আমি পূজা করি?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ওরে আমার ইচ্ছেয় কি হয়, মা কালী যা করাবেন তাই হবে, আমি কি করব?"

হৃদয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তবে তুমি কেন মা কালীকে বল না?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "ওরে আমি বললে আমার কথা কি শোনে? তাঁর যা ইচ্ছা তাই করাবেন। আমি একটা যন্ত্র বইত নয়।" সেই বৎসর বৈশাখ মাসে হৃদয় মথুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মাকে এবৎসর আনিবেন কি না। মথুর তাহাতে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মাকে আনবে তার আর কথা কি? সে ত ভাল কথা"। মথুরানাথ যদি রামকৃষ্ণদেবের এ বিষয়ে অসম্মতি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোন মতেই এরূপ কথা বলিতেন না। যাহা হউক হৃদয় মনে স্থির করিলেন যে, মথুর যখন সাহস দিয়াছেন, তখন পূজার আর কোন আশঙ্কা নাই, সমস্ত খরচ পত্রও তিনি দিবেন। এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে সম্বাদ আসিল যে, মথুরানাথের সামান্য জ্বর প্রত্যহই হইতেছে। ক্রমে সেই জ্বর মজ্জাগত হইল, কিছুতেই তাহার বিরাম হয় না। নানাবিধ চিকিৎসা করিয়াও জ্বর নিবারিত হইল না। হৃদয় মহা উদ্বিগ্ন, তিনি প্রত্যহই মথুরকে দেখিতে যান, এবং মথুর প্রত্যহই তাঁহাকে অত্যন্ত কাতরভাবে বলেন, "বাবা একবার আসবেন না?" হৃদয় আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন যে, মথুর তাঁহাকে একবার তথায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি গিয়া কি করিব? যদি তার রোগটা ভাল করে দিতে পারতুম তাহলে যেতুম।" হৃদয় প্রতিদিন মথুরকে দেখিয়া আসিয়া সম্বাদ দেন আর তাঁহাকে তথায় যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব কিছুতেই তথায় যাইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, "তুই গেলেই আমার যাওয়া হল।"

এইরূপে সাত আট দিনের জ্বরে মথুরানাথের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। বৈকাল বেলা তিনটার সময় তাঁহাকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল, তথায় বেলা পাঁচটার সময় তাঁহার দেহত্যাগ হইল। ঠিক ঐ সময়ে রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি হৃদয়কে

মথুরের পরলোক গমনের কথা বলিলেন, "মথুরের দেহত্যাগ হলে, মথুরের তেজ অন্নপূর্ণাতে মিশে গেল।" মথুরানাথের সৎকার করিয়া সকলে রাত্রি নয়টার সময় দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের নিকট হৃদয় শুনিলেন, ঠিক পাঁচটার সময়ে মথুরানাথের দেহত্যাগ হয়। রামকৃষ্ণদেব ঠিক সেই সময় উহা ভাবাবস্থায় জানিতে পারিয়াছিলেন বুঝিয়া হৃদয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন।

সেই বৎসর দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত। হৃদয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পূজা করিবেনই করিবেন। তিনি আপনার ভাব মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া যদুনাথ মল্লিকের বাটীতে গমন করিলেন। তথায় মামাকে লুকাইয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামকে পত্র লিখিলেন, পূজার সমস্ত আয়োজন করিতে, কিন্তু গোপনে, কারণ মাতুলের ইহাতে মত নাই, তত্রাচও তাঁহারা যতদিন বাঁচিবেন ততদিনই পূজা করিবেন, এই বাসনা। পূজার সমস্ত আয়োজন হইলে তাঁহাকে পত্র লিখিলে তিনি তখনি দেশে গমন করিবেন। এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া স্বহস্তে ডাকে ফেলিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে পূর্ব্বে যেমন প্রাণের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিতেন, এবার আর তাহা না করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়ন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির, বার কয়েক শৌচে গেলেন, যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ছট্ ফট্ করিতে করিতে শেষে তাহার সঙ্গে বমনও আরম্ভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো মামাগো, আমায় রক্ষা কর গো। ওগো মামাগো আর আমি বাঁচ্‌ব না গো, মনু যে গো।" চীৎকার শুনিয়াই রামকৃষ্ণদেব ভাবস্থ হইলেন এবং সেই অবস্থায় কহিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে হৃদে! তুই নাকি আমাকে না জানিয়ে পূজ করবি? আমাকে না বলে রাজারামকে চিটি লিখেছিস্, মনে করিছিস্ আমি জানতে পারব না? বারণ করলুম শুনলিনি। বল্ পূজ করবিনি! এখনো বল্ পূজ করবি কি না?"

হৃদয় কাতর হইয়া কহিলেন, "না মামা, আমায় রক্ষা কর, আমি মহা অপরাধ করিছি। আমি বলছি আর পূজ করব না, করব না, করব না!" এই বলিতে বলিতে আবার পেট হুড় হুড় করিয়া আসিল, আবার শৌচে গেলেন কিন্তু ঘরের পশ্চিমের গোল বারাণ্ডা অতিক্রম করিতে পারিলেন না এবং উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণদেবের ভাব ভঙ্গ হইলে

তিনি শুনিলেন, হৃদয় ক্রন্দন করিতেছেন আর অতি মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "আর বাঁচিব না মামা, এইবার মলুম মামা।" ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কাঁদিতে লাগিলেন এবং সকলকে জাগ্রত করিতে লাগিলেন জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি এই সময়ে মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করিবার জন্য আগমন করেন, তিনি নিকটেই শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া ঘরের মধ্যে মেঝের উপর বিছানা করিয়া তদুপরি হৃদয়কে শয়ন করাইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন এবং হৃদয়কে কহিতে লাগিলেন, "মা কালীর ইচ্ছে নয় যে, তুই আর পূজ করিস্। তা তুই আমাকে না জানিয়ে কেন রাজারামকে চিটি লিখলি?" হৃদয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন যে, এমন কর্ম্ম আর কখন করিবেন না। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট বসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, যখনি যে কার্য্য করিবেন, তাঁহাকে না জানাইয়া যেন আর কোন কার্য্য না করেন। হৃদয়ও তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপ কথা কহিতে কহিতে হৃদয় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অল্প পরে জ্ঞানানন্দ একজন ডাক্তার আনয়ন করিলেন। ডাক্তার আসিয়া হৃদয়কে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন, "আর কোন ভয় নাই।" রামকৃষ্ণদেব তাঁহার কথায় সুস্থির হইলেন। হৃদয় পরদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রার পর একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। উঠিয়াই রাজারামকে পত্রদ্বারা পূজার আয়োজন করিতে নিষেধ করিলেন।

ক্রমশঃ।

মসুরীর পথে গঙ্গোত্রী।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল দেহরাদুন।

এইছত্রের নিম্নে একটী প্রস্তরময় ঘাট আছে। লোকে এখানে স্নান করে এবং তাহাকে মণিকর্ণিকার ঘাট বলে। এইরূপ একটী কেদারঘাটও আছে। সেখানেও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা আছে। সে গুলি ভারি অপরিষ্কার। এখানে সচ্চিদানন্দ নামে একজন ব্রহ্মচারী বাস করেন। তিনি সাধুসন্ন্যাসীদিগকে নিজ ব্যয়ে আহারাদি করান এবং শিক্ষাও দিয়া থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায়, গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই উত্তরকাশীতে একজন

সাধুকে পাহাড়ী পুলিসে অর্থলোভে হত্যা করিয়াছে। ফলতঃ উত্তরকাশী তীর্থ শুনিতে যেরূপ, দেখিতে সেরূপ নহে।

উত্তরকাশী হইতে ৩ মাইল উচ্চে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। ইহার আড়াই মাইল উত্তরে অসি ও আড়াই মাইল দক্ষিণে বরুণা নদী। এখান হইতে একটী পাকডণ্ডী রাস্তায় ৬ মাইল চড়াই উঠিলে গাঙ্গোর গ্রামে পৌঁছান যায়। এটী যমুনোত্রীর পাণ্ডাদের গ্রাম। বোধ করি নিকুঞ্জ বাবু ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে যে দাঙ্গর গাঁয়ে গিয়াছিলেন, ইহা সেই গ্রামই হইবে।

(১১) উত্তরকাশী হইতে মণিরি ৯ মাইল। মণিরির পথে যমুনা হইতে একটী ঝরণা আসিয়া নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানে একটী কাঠের পোল অতি সন্তর্পণে পার হইতে হয়। কিঞ্চিৎ দূরে অসি-গঙ্গা। এই নদী পার হইয়া আধ মাইল দূরে নাথু সাহেবের বাংলা। নিকুঞ্জ বাবু যে ঠিকাদার সাহেবের কথা লিখিয়াছেন, ইনিই সেই এই বাঙ্গালা হইতে এক মাইল দূরে অপর একটী নদী ও পোল পার হইয়া ৫ মাইল দূরে ভাটিয়ারী গ্রাম। বলা বাহুল্য এই গ্রামকেই নিকুঞ্জ বাবু বাটারী এবং অখণ্ডানন্দ স্বামী ইহাকে ভটারী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(১২) মণিরি হইতে ভাটিয়ারি ৮ মাইল। এই পথে এক জায়গায় পাহাড় ধসিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া রাস্তা। কখন কখন পাথর খসিয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার জল ও বালি পড়িতে থাকে সুতরাং এই স্থান যাত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। ভাটিয়ারীতে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন শিবালয় আছে,তন্নিম্নে একটী নদী গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। এখানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর সদাব্রত এবং পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা আছে। গঙ্গানদীর পরপারে শঙ্খধারা নামে একটী ঝরণা নামিতেছে। উহা দেখিতে বড় সুন্দর। এখানে গঙ্গার প্রধান স্নানের ঘাট সূর্য্যকুণ্ড। এখানে কুলি ও ঝাঁপানের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য টিহরী রাজার একজন ঠিকাদার আছেন। এই স্থান হইতে গঙ্গার পরপারে বুড়া কেদার ও ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া কেদার যাইবার পথ আছে কিন্তু রাস্তা বড় দুর্গম। বঙ্গদেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ কঠিন।

(১৩) ভাটিয়ারী গ্রাম হইতে গঙ্গানি ৯ মাইল। এখান হইতে রাস্তা আধ মাইল উচ্চ। এইস্থানে ইন্দোরের মহারাজার সদাব্রতের টিকিট লইয়া বুড়া কেদারের রাস্তায় আট মাইল যাইয়া টিকিট দেখাইলে আহার্য্য পাওয়া যায়।

ভাটিয়ারি হইতে আন্দাজ ৪ মাইল দূরে গঙ্গার সেতু পার হইলে একটী পাটো-য়ারি ধর্ম্মশালা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে লোকজনের গতিবিধি নাই, চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখান হইতে কঙ্কির জঙ্গলের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ রাস্তা গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়াছে। এখানে গঙ্গা ২০০ হইতে ৩০০। ৪০০ ফুট নিম্নে প্রবাহিতা। এখানে একটী সেতু পার হইয়া গঙ্গানিতে পৌঁছান যায়। এখানে কিন্তু লোকালয় নাই। এখানে পিলিভিতের শেঠদিগের একটী সদাব্রত আছে। জয়পুরের মহারাজার উত্তরকাশীর ছত্র হইতে টিকিট লইয়া আসিলে খাইতে পাওয়া যায়, নতুবা উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। গঙ্গানির নিম্নে একটী কাঠের সেতু আছে। তাহা পার হইয়া দুইটি গরম জলের কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। একটী অত্যন্ত গরম, অপরটী অপেক্ষাকৃত শীতল, তাহাতে যাত্রীরা স্নান করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে ঋষিকুণ্ড বলে। এখানে দুইজন পাণ্ডা একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৈরাগী সাধু বাস করেন।

(১৪) গঙ্গানি হইতে ধারালি ১২ মাইল। ধারালি হইতে গঙ্গার ধার দিয়া ৪ মাইল দূরে অনন্তনাগ নামে একটি নূতন ধর্ম্মশালা সজনি ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখনও সদাব্রত খোলা হয় নাই। এখানে কোন দোকানও নাই। এখান হইতে সুকী গ্রাম ৪মাইল অন্তর। এটী চড়াইয়ের রাস্তা। রাস্তায় যাইতে সুকী গ্রামের ১ মাইল নিম্নে একটি কুণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহার দুইটী ধারা। ১৮৬২ সম্বতের ভূমিকম্পে নিকটবর্ত্তী ১২ খানি গ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎ-কালে কুণ্ডটী মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হয়। পরে রাস্তা খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে। জঙ্গলে নানা স্থানে দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহাদের পূজাদি কিছুই হয় না। সুকী হইতে ২ মাইল উৎরাই নামিলে ঝালা গ্রাম। তথায় একটী ডাক বাঙ্গলা আছে। চতুষ্পার্শ্বে চিলুর বাগান। তন্মধ্যে একটী অপরিষ্কার ধর্ম্মশালা এবং পায়রার খোপের ন্যায় একটী দোকান আছে। শীতকালে এখানে ১২।১৩ ফুট বরফ জমে। এখান হইতে ১ মাইল পথ নামিলে একটী নদী। সম্ভবতঃ উহা যমুনো-ত্রির পাহাড় হইতে নামিয়া গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এখানে একটী সেতু পার হইয়া আন্দাজ ২ মাইল দূরে হর্শোল নামক স্থানে টিহরীর রাজার একটী দ্বিতল বাগানবাটী দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফল ফুলের গাছ। সেয়ো, নাসপাতি, আড়ু, বিহিদানা, চিলু প্রভৃতি ফলের চারা

বসান হইযাছে। এখানে দেবদারুর গাছ প্রচুর। নিকটে একটী পাহাড়ের মধ্যে একটী নীল বর্ণ ঝরণা হইতে বরফ গলিয়া আসিতেছে। স্রোতোবেগ ভয়ানক, গঙ্গার চেয়েও প্রবল। এই নদী হইতে দুইটী নহর বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে 'পানচাকি' (Water-mill) চলে। এখান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে দত্তুজাঠের একটী দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। ইনি জাতিতে জাঠ নহেন, ভুটিয়া, এদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মশালাটী ভারি অপরিষ্কার। ইহা পিশু ও ছারপোকায় পরিপূর্ণ। ইহার উপর-তলায় যাত্রীরা অতি কষ্টে বাস করেন, নিম্নে গোমহিষাদি থাকে। এখানে একটী দোকান আছে। দোকানের সম্মুখ দিয়া বামদিকে একটী পাকডণ্ডী রাস্তা মুখবা গ্রাম হইয়া গঙ্গোত্রীর রাস্তার সহিত মিলিয়াছে। এখানে গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা বাস করেন। শীতকালে এখানে গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তিপূজা হয়। এই গ্রামের নিম্নে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম ছিল। হর্শীল হইতে পুনরায় ভাগীরথীর পোল পার হইয়া গঙ্গোত্রীর পথে আন্দাজ ৩ মাইল দূরে ধারালি গ্রাম। এখানেও একটী ধর্ম্মশালা আছে। তদুপরি অন্য এক ক্ষুদ্র পাহাড়ী গ্রাম। গ্রামের লম্বরদার শিবসিং অতি ভদ্রলোক, বড় অতিথিবৎসল ও ঈশ্বরভক্ত। ধর্ম্মশালার নিম্নে ২টী মন্দির আছে। একটী শিবের মন্দির, অপরটী দুর্গার। প্রবাদ—শঙ্করাচার্য্য এই মূর্ত্তি দুটী প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু ভূমিকম্পে মন্দির দুটী ভূগর্ভে বসিয়া যাওয়ায় মূর্ত্তি দুটী জলমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। এখানকার জঙ্গলে চামলী গরু (বা সুরা গাই) ও কস্তুরী মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে জয়পুরের মহারাণীর একটী সদাব্রত আছে, তথায় বিনা টিকিটে যাত্রীদিগকে খাইতে দেয়। এখান হইতে টিকিট লইয়া গঙ্গানিতে দেখাইলে সদাব্রত পাওয়া যায়।

(১৫) ধারালি হইতে গঙ্গোত্রী ৯ মাইল। ধারালির মন্দির হইতে একটী ঝরণা আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। ইহার নাম নীলগঙ্গা। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এই নিঝরিণী নীলকণ্ঠ মহাদেবের পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এখানে পুনরায় গঙ্গার সেতু পার হইয়া একটী ডাকবাংলা পাওয়া যায়। ইহার ধার দিয়া আন্দাজ ৩মাইল দূরে অপর একটী রাস্তা মিলিয়াছে। উপরের রাস্তাটী ভৈরব ঘাটীতে গিয়াছে। উচ্চে একটী লৌহসেতু পার হইয়া ভৈরবের মন্দিরে যাইতে হয়। ঐ ঝোল' পার হইবার সময় নড়িতে থাকে। যাত্রীদিগের পক্ষে ইহা বিপজ্জনক দেখিয়া, সজনি ব্রহ্মচারী নিম্নে অপর একটী

নূতন রাস্তা তৈয়ার করাইয়া ভোটগঙ্গার উপর একটী কাষ্ঠসেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, এখানেও সদাব্রত আছে। ভোটগঙ্গা তিব্বৎ হইতে নামিয়া আসিয়া কাষ্ঠসেতুর নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এই নদীর মৃত্তিকা হরিদ্রাবর্ণ। এই নদীকে পাণ্ডারা গরুড়গঙ্গা বলে। ইহার স্রোত গঙ্গার চেয়েও অধিক প্রবল। এখানে ইহা ধনুকাকারে প্রবাহিত। এই সেতু হইতে দেড় মাইল চড়াই উঠিলে ভৈরবজির মন্দির ও একটী প্রাচীন ধর্ম্মশালা দেখা যায়। অপর একটী নূতন ধর্ম্মশালাও নির্ম্মিত হইতেছে। কোন সদাশয় ব্যক্তি তিন মাইল দূর হইতে এখানে একটী জলের নল আনাইতেছেন। এই জলই এখানে ব্যবহার্য্য। ভৈরবজীর পুরোহিত এখানে একটী দোকান রাখিয়াছেন। ইহার চতুর্দ্দিকে দেবদারুর জঙ্গল। এখান হইতে গঙ্গোত্রী ৬ মাইল দূর। এই রাস্তায় যাইতে দূরে একটী উচ্চ পাহাড়ের উপরে একটী মন্দিরাকৃতি চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। আকারে কাশীর বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরের ন্যায়, কিন্তু কোনই পথ না থাকায় উঠিবার কোন উপায় নাই। ২ মাইল অন্তরে গঙ্গার কাষ্ঠের সেতু পার হইয়া পুনরায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অপর একটী সেতু পার হইলে বামদিকে গৌরীকুণ্ড। উচ্চ হইতে পাহাড় ভেদ করিয়া আন্দাজ শত হস্ত নিম্নে এই কুণ্ডে ৩।৪ হাত পরিসর গঙ্গার স্রোত পতিত হইতেছে। এখান হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে গঙ্গাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে পাণ্ডারা গঙ্গাদেবীর পূজা করে। যাত্রীরাও এইখানে গঙ্গাদেবীর পূজা সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাজলে পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়। উপরে কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায় সদাব্রত পাওয়া যায়। ইহাঁদের একটি দোকানও আছে। গঙ্গা এখানে পশ্চিমবাহিনী, সরলভাবে গোমুখী-পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়াছে। গোমুখী এখান হইতে ১৮ মাইল, রাস্তা নাই। পাথরের উপর দিয়া গঙ্গার ধারে ধারে উঠিতে হয়। পথে ধর্ম্মশালাদি কিছুই নাই। পাহাড়ের গুহায় (এদেশে গুফা বলে) বাস করিতে হয়। তবে কাষ্ঠের অভাব নাই। সচরাচর গোমুখী যাইতে পথে তিন দিন লাগে। আহার্য্য দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। যাতায়াতে কুলিভাড়া ৫ টাকা লাগে। গোমুখীর পাহাড়ে বরফ পড়ে। গঙ্গার মূল উৎপত্তি স্থান নির্ণয় করা কঠিন।

গঙ্গোত্রীতে পর্ব্বতের শোভা অতি বিচিত্র। দুইদিকে পর্ব্বত উচ্চে লম্বভাবে দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে গঙ্গা কুলকুলনাদে খরবেগে প্রবাহিত। চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলাকীর্ণ, দেবদারু ভূর্জ্জপত্রতরু ও অন্যান্যনানাবিধ পার্ব্বত্যপাদপে পরিপূর্ণ।

উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া প্রায়ই তুষারপাতে রজতকান্তি ধারণ করে, যেন কোন যোগী পুরুষ বিভূতিভূষিত হইয়া অনন্তকাল যোগনিরত রহিয়াছেন। নিম্ন পর্ব্বতে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতাপে বরফ গলিয়া গেলে বৃক্ষলতাদি দৃষ্টিগোচর হয়। উপরের পাহাড় চিরতুষারময়। যে স্থানে বরফ গলিয়া যায়, সে পর্ব্বতের চূড়া রথ বা মন্দিরের ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিত। কাঁঠালের গায়ের মত বলিলেও তুলনা মন্দ হয় না।

গঙ্গোত্রীর পথ পাকারাস্তা নহে। সাধারণতঃ পাহাড়ী রাস্তা যেমন প্রস্তরে-চাপে ক্রমশঃ বসিয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। অধিকাংশ স্থলে যাত্রীদিগের গমনাগমনে পথ প্রস্তুত হইয়াছে। বদরিনারায়ণের পথ যেমন একটু প্রশস্ত ও সংস্কৃত, এ পথ তেমন নহে। মধ্যে মধ্যে পাহাড় ধসিয়া গিয়া, যাত্রীদিগের মনে কিরূপ ত্রাস উৎপাদন করে, তাহাও বলা হইয়াছে। মসুরী হইতে গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশই টিহরীর রাজার এলাকাভুক্ত। টিহরী রাজ্য-বিষয়ে শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকগণ এত অধিক বর্ণন করিয়াছেন যে, আর কিছু অধিক লেখা অনাবশ্যক। কিন্তু গাড়োয়ালীদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সন্তোষজনক নহে। ব্রিটিশ গাড়োয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চলের অধিবাসীরা আজকাল ইংরাজি শিক্ষা ও শাসনের গুণে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু টিহরী গাড়োয়ালবাসীদিগের অবস্থা তেমন উন্নত নহে। বিশেষ, নিম্নশ্রেণীর গাড়োয়ালীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহারা চাকুরীব্যপদেশে দেহরাদুনে প্রায়ই আসিয়া থাকে। এই সকল পাহাড়ী চাকরের সাহায্য বিনা আমাদের সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। ইহারা বেশ শ্রমদক্ষ ও কার্য্যকুশল বটে, কিন্তু তেমন বিশ্বাসী নহে। চুরি করা ও মিথ্যাকথা বলায় ইহারা বেশ অভ্যস্ত। ইহাদের বেশ মুখ মিষ্টি বটে, কিন্তু অন্তরে হলাহল। কাজকর্ম্ম জোর করিয়া না করাইলে করিতে চায় না। স্বদেশেও ইতর লোকদিগের স্বভাবচরিত্র নির্দ্দোষ নহে। সম্প্রতি আমাদের স্বামীজির নিকট এই দেশে একটী ডাকাতির কথা শুনিতে পাইয়াছি। হৃষীকেশ হইতে ২ জন মাড়োয়ারী যাত্রী ২ জন স্ত্রীলোক সমভি-ব্যাহারে টিহরী যাইতেছিলেন। ইঁহাদের জিনিসপত্র ৪ জন পাহাড়ী কুলিতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এই পাহাড়ীদের মধ্যে ৩ জনের বাড়ী বুড়াকেদার এবং অপর ব্যক্তি টিহরী গাড়োয়াল বাসী। ৫।৬ দিন সঙ্গে করিয়া লইয়া ইহারা যাত্রীদিগকে একটী মহিষশালায় লইয়া যায়। দুপুরবেলা

"নিংড়া" নামক এক প্রকার শাক তুলিয়া লইয়া ভালগুলি নিজেরা রাঁধিল এবং বাছিয়া বাছিয়া "বিষ নিংড়া" গুলি যাত্রীদিগকে খাইতে দিল। ইহাতে তাহাদের নেশা হওয়াতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তারপর তাহাদিগের সকলকে খুন করিয়া ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করে। পরে কোন ক্রমে এই দস্যুরা ধৃত হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, টিহরীর রাজা ইহাদিগকে সর্ব্বজনসমক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

তীর্থযাত্রা হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মের একটা প্রধান সাধন স্বরূপ কীর্ত্তিত। গঙ্গোত্রী তীর্থ দর্শন লাভে যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মসঞ্চয়ের অপূর্ণতা অনুভব করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের ক্ষোভ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। গঙ্গোত্রীতেও যে গঙ্গা প্রবাহিত, হরিদ্বার, কাশী প্রভৃতি তীর্থেও তাঁহারই আবির্ভাব। বহু কৃচ্ছ্র-সাধনে দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া অনশনে ও পিশুছারপোকা প্রভৃতির দংশন সহ্য করিয়া, অসভ্য পাহাড়ী পাণ্ডাদের সহবাসে পুণ্য সঞ্চয়ের আশা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। সাধু সন্ন্যাসীর অবস্থাও বর্ণিত হইয়াছে। সংসঙ্গলাভ সুদূরপরাহত। প্রকৃত মহাত্মা পুরুষের দর্শন লাভের আশা অতি বিরল। তবে যাঁহাদের অর্থবল আছে, পার্ব্বত্যপ্রদেশের শোভা সন্দর্শনে আগ্রহ আছে কিম্বা যাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। *

---

* লেখকের মত আমাদের একদেশী বলিয়া প্রতীত হয়। বাস্তবিক যাঁহারা কলিকাতা সহরে বা সুদূর পল্লীগ্রামে বসিয়া নিজ মনোগত হিমালয় অথবা তথাকার গুহায় অবস্থিত চিরধ্যাননিমগ্ন মহাত্মার কল্পনা করেন, হিমালয়ে একবার ভ্রমণ করিয়া আসিলে তাঁহাদের কল্পিত মানসী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় বলিয়া তাঁহারা বিষম কষ্ট অনুভব করেন বটে, কিন্তু তাহাতে হিমালয়ের মাহাত্ম্যও কমে না অথবা ভ্রমণের উপকারিতায়ও ব্যাঘাত হয় না। হরিদ্বারাদি সুগম স্থানে প্রবাহিত গঙ্গায় ও গঙ্গোত্রীতে প্রবাহিত গঙ্গায় স্নানের ফলের কি তারতম্য, তাহা কর্ম্মরহস্যবিদ্‌গণ বিচার করুন। আমরা এইটুকু বুঝি যে, ভারতবাসীকে বিশেষতঃ দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতিকে যদি আবার কষ্টসহিষ্ণু ও বলবান্ হইতে হয়, তবে এই পর্ব্বতভ্রমণই তাহার প্রথম উপায়। সৌভাগ্যক্রমে এখনও বদরি কেদারে রেল যায় নাই। আমরা এখন অতিশয়

অলস ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি তাই খোঁড়া দেখিলেই খোঁড়া হইয়া পড়ি। আমরা বিদেশীকে বয়কট করিতে যাই, অথচ বিদেশীর উদ্ভাবিত বিদেশী পরিচালিত, রেল, ষ্টিমার, ট্রামে লোক ধরে না। কিন্তু নিজেরা যে চেষ্টা করিয়া মাথা ঘামাইয়া তাহাদের বিদ্যাটা নিজেদের করিয়া লইব, সে উদ্যোগ ও চেষ্টা নাই। আমরা যে ধার্ম্মিক! আমরা ঐ সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইব? ভাই বাঙ্গালী, যদি তোমার মন মুখ এক হয়, তবে সকলে জীবনে অন্ততঃ কোন এক পার্ব্বত্য দুর্গম তীর্থভ্রমণ করিয়া এস দেখি—একটু শারীরিক ক্লেশ হইতে পারে, কিন্তু তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে। রেল ষ্টিমার যোগে বিদ্যুদ্বেগে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিয়া যাহা না শিখিবে, পদব্রজে পার্ব্বত্য পথ ভ্রমণে তদপেক্ষা অধিক শিখিবে। 'অসভ্য' পাহাড়ী জাতিকে ঘৃণা না করিয়া তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি করিতে শিখিবে। শিক্ষার অভাবেই যদি তাহাদের হীনাবস্থা বুঝিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে কেবল ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় না খাটাইয়া তাহাদের শোকে সান্ত্বনা, রোগে ঔষধ পথ্য এবং অজ্ঞান নিবারণের জন্য শিক্ষাদানে উৎসাহিত হইবে আর সরল ভাবে বলিলে চমকিত হইও না—পার্ব্বত্য গুহায় অবস্থিত কাল্পনিক মহাত্মার মানসী মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তোমার ঘরের আশে পাশে, তোমার সহরে, তোমার গ্রামে বিরাজিত অপরিচিত অজ্ঞাত প্রকৃত মহাত্মাগণের উপর শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিবে।

ইতি উঃ—সম্পাদক।

—*—

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

১৪, গ্রে কোট গার্ডেন, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার,
লণ্ডন, ১৮৯৬।

প্রিয় আ—

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হইল, সুইজর্লণ্ড হইতে ফিরিয়াছি, কিন্তু তোমাকে এ পর্য্যন্ত বিস্তারিত পত্র লিখিতে পারি নাই। আমি গত মেলে কীলনিবাসী পল ডয়সন * সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি।

ষ্টার্ডির † কাগজ বাহির করিবার মতলব এখনও কিছু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তুমি দেখিতেছ, আমি সেণ্ট জর্জ্জ রোডের বাসা ছাড়িয়াছি। আমাদের একটী বক্তৃতা দিবার হল হইয়াছে। ৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট c/o ই, টি, ষ্টার্ডি এই ঠিকানায় এক বৎসর পর্য্যন্ত পত্রাদি আসিলে আমার নিকট পৌঁছিবে।

গ্রেকোট গার্ডেনের যে বাসা তাহা আমার ও অপর স্বামীর থাকিবার উদ্দেশ্যে, মাত্র তিন মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে। লণ্ডনের কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই ক্লাসে অধিক লোকসমাগম হইতেছে। শ্রোতৃসংখ্যা যে ঐ হারে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর ইংরাজ জাতি বড়ই দৃঢ়-

---

* জর্ম্মানির অন্তর্গত কীল নামক স্থানে অধ্যাপক পল ডয়সন বাস করেন। তিনি হিন্দুদর্শন, বিশেষতঃ উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বেদান্তের বিশেষ অনুরক্ত। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামীজি মান্দ্রাজের ব্রহ্মবাদিন্ পত্রে এক প্রবন্ধ লিখেন—এই পত্রে সেই সম্বন্ধেই তিনি বলিতেছেন। কীলে স্বামীজির সহিত অধ্যাপকের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ প্রবুদ্ধ ভারতপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† E. T. Sturdy.—ইনি লণ্ডন নিবাসী। থিওজফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তিনি ভারতে আসিয়া অনেকদিন ধরিয়া হিমালয় প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শিবানন্দের সহিত ইহার পরিচয় হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে গমন করিলে ইনি তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করেন। স্বামীজির বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য তিনি করিতেন। স্বামীজির উৎসাহে তিনি ইংরাজীতে নারদীয় ভক্তিসূত্রের একখানি উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান্। অবশ্য আমি চলিয়া গেলেই যতটা গাঁথনি হইয়াছে,তাহার অধিকাংশই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তার পর হয়ত কোন অসম্ভাব্য ঘটনা হইবে, হয়ত কোন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি আসিয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন—প্রভুই জানেন, কিসে ভাল হইবে। আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশ জন প্রচারকের স্থান হইতে পারে, কিন্তু কোথা হইতেই বা প্রচারক পাওয়া যাইবে আর তাহাদিগকে তথায় আনিবার জন্য টাকাই বা কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি কয়েক জন দৃঢ়চেতা খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্দ্ধেক জয় করিয়া ফেলা যাইতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ—মুখে স্বদেশহিতৈষিতার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াইতেছি আর আমরা মহা ধার্ম্মিক এই অভিমানে ফুলিয়া রহিয়াছি। মান্দ্রাজিরা অপেক্ষাকৃত চটপটে ও দৃঢ়তাসহকারে একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগুলো সকলেই বিবাহিত! বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটী কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া জন্মিয়াছে—যোনিকীট—এদিকে নিজেদের ধার্ম্মিক ও সনাতনপথাবলম্বী বলিয়া পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা কিন্তু এখন মান্দ্রাজে উহার ততটা প্রয়োজন নাই, কিন্তু চাই এখন অবিবাহিত জীবন। যাক্ বালাই! আজ কাল আমাদের বালকেরা যেরূপে বিবাহিত হইয়া থাকে, তদপেক্ষা বেশ্যাবৃত্তি শ্রেয়ঃ। তাহাতে আত্মাকে ততদূর বন্ধনে আসক্ত হইতে হয় না। এ আমি বড় শক্ত কথা বলিলাম, কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু—ইস্পাতনির্ম্মিত হইবে আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে, যাহা এমন সকল পদার্থে নির্ম্মিত—যাহাতে বজ্র নির্ম্মিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষত্রবীর্য্য, ব্রহ্মবীর্য্য। আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাহাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ,—সব শক্তি আছে—কেবল যদি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হইত! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মান্দ্রাজ তখনই জাগিবে, যখন উহার হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার হইতে একবারে স্বতন্ত্র হইয়া কোমর বাঁধিবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। ভারতের বাহিরে এক ঘা দিতে পারিলে

উহার ভিতরের ১০০০০ ঘায়ের তুল্য হয়। যাহা হউক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হইবে।

আমি তোমাদের যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, মিস্ মুলার * সেই টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার নূতন প্রস্তাবের বিষয় বলিয়াছি। তিনি উহা ভাবিয়া দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে আমার বিবেচনায় তাঁহাকে কিছু কায দেওয়া ভাল। তিনি ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারতের এজেণ্ট হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে লিখিবে। তাঁহার ঠিকানা—এয়ার্লিলজ, রিজওয়ে গার্ডেন্স, উইম্‌ব্লেডন, ইংলণ্ড। আমি গত কয়েক সপ্তাহ তাঁহার নিকটেই বাস করিতে-ছিলাম, কিন্তু আমি লণ্ডনে বাস না করিলে লণ্ডনের কার্য্য চলিতে পারে না সুতরাং আমি বাসা বদলাইয়াছি। মিস মুলার ইহাতে একটু বিরক্ত হইয়াছেন এবং আমিও তজ্জন্য দুঃখিত। কিন্তু কি করিব! উঁহার পুরোনাম—মিস হেন্‌-রিয়েটামুলার। ম্যাক্সমুলার দিন দিন অধিকতর মিত্রভাবাপন্ন হইতেছেন। আমাকে অক্সফোর্ডে শীঘ্রই দুইটী বক্তৃতা দিতে হইবে।

আমি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একখানা বড় বই লিখিতে ব্যস্ত রহিয়াছি। বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদে যে সকল বচন আছে, সেই সমুদয় সংগ্রহ করিতেছি। তুমি যদি এখন একটি লোক যোগাড় করিতে পার, যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও পুরাণ সকল হইতে প্রথমতঃ দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৎপরে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদাত্মক মত পারে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে, তবে আমার খুব সাহায্য হয়। ঐ গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক্‌রূপে সন্নিবেশিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক শ্লোকটি কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায় হইতে গৃহীত, তাহা লিখিতে হইবে। লেখাগুলিও যেন খুব পরিষ্কার হয়। বেদান্ত দর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া গিয়া পাশ্চাত্যদেশ হইতে চলিয়া যাওয়া ভাল বোধ হইতেছে না।

মহীশূরে তামিল অক্ষরে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ্ সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ডয়সনের পুস্তকাগারে আমি উহা দেখিলাম। উহার

* মিস মুলার লণ্ডনের একজন বিদুষী ধনী রমণী। ইনিও থিওজফিষ্ট ছিলেন। স্বামীজির প্রচারকার্য্যে ইনি নানাভাবে সাহায্য করেন।

কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে? যদি থাকে ত আমায় একখানি পাঠাইবে। যদি না থাকে, আমাকে তামিল সংস্করণটীই পাঠাইবে এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষর সকলও) পাশে পাশে নাগরীতে লিখিয়া পাঠাইও—যাহাতে আমি তামিল অক্ষর শিখিয়া লইতে পারি। সে দিন আমার সহিত সত্যনাথান মহাশয়ের লণ্ডনে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে তাঁহার বেদান্তের উপর একটি বক্তৃতা এবং তাঁহার মৃত সহধর্ম্মিণীকৃত একখানি উপন্যাস উপহার প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, মান্দ্রাজের প্রধান এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পত্র মান্দ্রাজ মেলে রাজযোগ পুস্তকখানির একটী অনুকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। আমি শুনিলাম, আমেরিকার প্রধান শারীরবিধানশাস্ত্রবিৎ উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত আমার মত ও সিদ্ধান্ত সমূহ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এদিকে আবার ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার মতগুলি লইয়া উপহাস করিয়াছেন। অবশ্য আমার মতবাদগুলি অতিসাহসপূর্ণ আর উহার অধিকাংশই চিরকালই লোকের নিকট নিরর্থক থাকিয়া যাইবে। কিন্তু উহাতে এমন সকল বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে, শারীরবিধান-শাস্ত্রবিৎগণ সেইগুলি যত শীঘ্র গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন, ততই ভাল। যাহা হউক, যেটুকু ফল হইয়াছে, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। আমার ভাব এই—লোকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কিছু বলুক।

অবশ্য ইংলণ্ডের সমালোচকগণ ভদ্র—আমেরিকার ন্যায় পচাল বকে না। তারপর ইংলণ্ডের মিসনরিদের কথা শুন। দেখিবে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ডিসেণ্টার *। উহারা ইংলণ্ডের ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত নহে। এখানকার ভদ্রলোকগণের মধ্যে যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা সকলেই চার্চ্চ অব ইংলণ্ড ভুক্ত। ইংলণ্ডে ডিসেণ্টারগণের অতি অল্পই প্রতিপত্তি আর তাহারা শিক্ষিত নহে। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যাহাদিগের নিকট হইতে সাবধান থাকিতে লিখ, আমি এখানে তাহাদের কথা কিছু শুনিতে পাই না। তাহারা এখানে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এবং তাহারা বাজে বকিতেও সাহস পায় না। আশা করি, রামকৃষ্ণানন্দ এতদিনে মান্দ্রাজে আসিয়াছেন এবং তোমাদেরও সর্ব্বাঙ্গীন

---

* যাহারা প্রতিষ্ঠিত চার্চ্চের বিরোধী তাহাদিগকে ডিসেণ্টার (Dissenter) কহে।

শারীরিক কুশল। হে বীরহৃদয় বালকগণ, অধ্যবসায়সম্পন্ন হও। আমাদের কার্য্য সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কখনই নিরাশ হইও না, কখনই বলিও না,—আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। আমি একটু সময় পাইলে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য গুটিকতক গল্প লিখিয়া পাঠাইব। অভেদানন্দের দ্বারা মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার দয়া করিয়া যে সমাচার পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

তোমাদের চিরপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

পুঃ—পাশ্চাত্যদেশে যখনই কেহ আসে এবং বিভিন্ন জাতিগণকে দেখে, তখনই তাহার চক্ষু খুলিয়া যায়। এইরূপেই আমি দৃঢ়চেতা কর্ম্মীর সকল পাইয়া থাকি। কেবল অনর্থক বকি না, ভারতে আমাদের কি আছে, কি নাই, তাহা তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিই। আমার ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ দশ লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক।

ইতি—বিঃ।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক (জানুয়ারি ১৯০৬ হইতে ডিসেম্বর ১৯০৬) কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের মধ্যে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, হরিদ্বারের নিকটেই হিমালয়ের পাদদেশে কনখল অবস্থিত। শুভ্রসলিলা ভাগীরথী উহার পাদদেশ ধৌত করিয়া চলিয়াছেন। হরিদ্বারে ভারতের নানাপ্রদেশ হইতে যে কত যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সাধনের অনুকূল স্থান বলিয়া এখানে বাসও করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কনখলকে একটী সাধুর গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে সাধুদের আহারের জন্য ছত্রাদি আছে, কিন্তু পীড়িত হইলে সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসাপথ্যের বিশেষ কিছু সুবন্দোবস্ত নাই। তীর্থযাত্রীদেরও পীড়াদি হইলে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। এই সকল দুঃস্থ সাধু, দরিদ্র তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় দরিদ্র গ্রামবাসিগণের

এইরূপ বিপদের সময় আবশ্যক বিবেচনায় আশ্রয়, চিকিৎসা, পথ্য, সেবাশুশ্রূষা প্রভৃতি যাহার যাহা অভাব, তাহাকে তাহাই জোগাইবার জন্য এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শুধু কনখলেই এই আশ্রমের কার্য্য সীমাবদ্ধ নহে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন দূরবর্ত্তী তীর্থস্থানে যখন মেলা হয়, তখন অসম্ভব লোক-সমাগমের জন্য সেই সকল স্থানে নানাবিধ মড়কের প্রাদুর্ভাব হয়। হরিদ্বারে ও এলাহাবাদে ১৯০২ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, তাহাতে হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী সাধুদিগের তপস্যার স্থান হৃষীকেশ ও ত্রিবেণীর ঘাটের নিকট কিছুদিনের জন্য শাখাসেবাশ্রম খোলা হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণসঞ্চারিণী বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং স্বর্গীয় স্বামী স্বরূপানন্দের উৎসাহ ও সহায়তায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই আশ্রম স্থাপন করেন। সেই অবধি তিনি প্রাণ দিয়া উক্ত সেবাশ্রমের কার্য্য করিতেছেন। সাধারণের নিকট উক্ত কার্য্যের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সেই অবধি সাধারণের সাহায্যে উক্ত সেবাশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক সহৃদয় ভদ্র মহোদয় আশ্রমের অধিকাংশ খাইখরচ বহন করিয়া আসিতেছেন। তজ্জন্য তিনি মিশনের এবং সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। অন্যান্য অনেক মহোদয় ব্যক্তিগণও নানা উপায়ে উহার সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ সামান্যভাবে ভাড়াটে বাড়ীতে কার্য্য আরম্ভ হইয়া এক্ষণে আশ্রমভুক্ত রোগী ও সেবকগণের জন্য দুইটী স্থায়ী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটী নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বাবু ভজনলাল লোহিয়া ৫০০০৲ টাকা ও বাবু হর্ সৈমল শুকদেব দাস ১০১৭৲ টাকা দিয়াছেন। মিশন ইঁহাদের সহৃদয় দানের জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

যক্ষ্মারোগীর জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটীর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। কিন্তু এই রোগ সংক্রামক বলিয়া অন্যান্য রোগীর সহিত এই রোগীকে রাখিতে পারা যায় না। কনখলের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেক যক্ষ্মারোগী এখানে ভাগ্যপরীক্ষার্থ আসিয়া থাকেন। এই রোগে দীর্ঘকাল যাঁহারা ভুগিতেছেন, তাঁহাদের স্বভাবতই ইচ্ছা হয় যে, জীবনের শেষ কয়টা দিন এইরূপ কোন তীর্থস্থানে বাস করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করেন। অনেক সময় অনেক যক্ষ্মাপীড়িত সাধু এই সেবাশ্রমে আশ্রয় ও

সহানুভূতি লাভের জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে বিদায় দিতে হইয়াছে। তাঁহাদের জন্য একটী পৃথক্ হাঁসপাতাল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সেবাশ্রমের সেবকগণের কতবারই না প্রাণের আগ্রহ হইয়াছে। ইহার জন্য প্রায় ৪০০০৲ টাকার প্রয়োজন। সম্প্রতি একজন সহৃদয় ভদ্রমহোদয়—উক্তকার্য্যের জন্য ১০০০৲ দিয়াছেন। আশা করি, অন্যান্য মহোদয়গণ ইঁহার মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে সেবাশ্রমের কার্য্যের দিন দিন প্রসার হইতেছে। দিন দিন আশ্রমভুক্ত রোগীর সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু উহাতে যে স্থান আছে, তাহাতে সঙ্কুলান হইতেছে না। সুতরাং গৃহ বাড়াইবার এবং আশ্রমের একটী স্থায়ী ফণ্ডের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩৯০ ব্যক্তিকে সেবা করা হয়—তন্মধ্যে ৩৩৭১ জন পুরুষ ও ১০১৯ জন স্ত্রী। ১৪৫৯ জন সাধু ও ১৯১২ জন গৃহস্থ। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ১০ জন সাধু ও ১০০৯ জন গৃহস্থ। জাতি হিসাবে দেখা যায়, সেবাশ্রমে ১০ জন খ্রীষ্টিয়ান ও ২৫৩ জন মুসলমানকেও সেবা করা হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এখানে সেবা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্রমে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭ জনকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষের পূর্ব্ববর্ষের জের লইয়া এই বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ জমা ২৫৩৮/০ ৪½ পাই—সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ৯৭৬/০ ৯½ পাই। আলোচ্য-বর্ষের শেষে হস্তে স্থিত ১৬০৬৸৴৭ পাই। ইহার মধ্যে ১০০০৲ টাকা পূর্ব্বোক্ত যক্ষ্মারোগীর হাঁসপাতালের জন্য প্রদত্ত। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল (সাহারণপুর) বা সম্পাদক, প্রবুদ্ধ-ভারত, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা ঋষিকবি।

(শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।)

সে আজ অনেক দিনের কথা যখন কাব্যপাঠ করিতে আরম্ভ করি; তখন যৌবনের প্রথম উন্মেষ, যৌবনের প্রথম প্রভাতে যে অরুণরাগে দিঙ্মণ্ডল

আলোকিত দেখিয়াছিলাম, সে লোহিতাভা এখনও হৃদয়ের অন্ধকারময় প্রদেশকে আলোকিত করিতেছে; আজ স্পষ্ট শুনিতেছি, এক দেবহৃদয় ঋষিকল্প পুরুষ প্রভাতে শিশিরস্নাতপর্ব্বতশিখরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অপূর্ব্ব সত্যের কথা বলিতেছেন, দেখিতেছি—পর্ব্বতগাত্রসংলগ্ন এক উৎসের পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া তাহার অশ্রান্তগীতধ্বনির মধ্যে কোন অজ্ঞাত প্রদেশের কাহিনী শুনিতেছেন। এই মহাত্মা বিদেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেও সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভাবাপন্ন। ইঁহার নাম কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ চেতনাত্মিকা প্রকৃতির সেবক, আমাদের প্রকৃতি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি সৌন্দর্য্য উপভোগের পার্থক্য অনেক। আমাদের প্রকৃতি পাষাণপ্রতিমা, মৃন্ময়ী; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি চিন্ময়ী। আমাদের প্রকৃতি আমাদের সহিত কথা কহেন না, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সর্ব্বদা জননীর অভয় বাণী শুনিতেছেন ও উৎসাহপ্রদীপ্ত মুখে চরণকমলে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির নিকট শুদ্ধাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারীর ন্যায় দণ্ডায়মান এবং ভক্তিবিহ্বলকণ্ঠে বলেন, "জননি! শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং"। এই জন্য তাঁহার কবিতার মধ্যে আমরা যৌবনের আবেগপ্রখর, ফেনিলোচ্ছল মদিরস্রোত বা রূপজমোহ দেখিনা; দেখি এক কঠোর সংযম।

কবি প্রকৃতির নিকট শিক্ষা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া দণ্ডায়মান এবং প্রকৃতিকে শিক্ষয়িত্রীর পদে অভিষিক্তা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

"And hark! how blithe the throstle sings;
He, too, is no mean preacher;
Come forth into the light of things,—
Let Nature be your teacher.
One impulse of a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evils and of good
Than all the sages can."

অনেক কবি প্রকৃতিদেবীর চক্ষে আপনার সুখদুঃখের প্রতিচ্ছবি দেখেন, প্রকৃতি যেন তাঁহাদের ইঙ্গিতানুসরণ করেন; তাঁহাদের অন্তরে যখন আনন্দের প্রবাহ, তখন প্রকৃতির অন্তরে আনন্দ, বিষাদের সময় তিনিও বিষণ্ণা।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিদেবীকে এভাবে দেখেননা। তিনি বলেন, "আমার আর কি আছে দেবী, আমাকে তোমার ভাবে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত কর"।

অনেক কবি প্রকৃতির লাবণ্যশ্রী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট ও মর্ম্মস্পর্শিভাবে দেখাইয়াছেন, অনেকে হয়ত তাঁহার প্রতিকৃতি অধিকতর কৌশলের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় কয়জন প্রকৃতির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন? কয়জনকে প্রকৃতিদেবী বলিয়াছেন,

"..............বৎস, জেনো সার
সুখ দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার।"

আর,

"মৃদুস্বরে দিয়া তারে শান্তিমন্ত্রধ্বনি
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা বলে কানে কানে
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে"।

অনেক কবি কবিতার প্রবাহে গা ভাসাইয়া এক অদ্ভুত আবেশে আত্মহারা হয়েন; এ যেন মদিরার নেসা; এ নেসার খেয়ালে কবি বিশ্বের চারিদিকে বিচরণ করেন, তাঁহার গতি অপ্রতিহত বটে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল. সেই জন্যই আমরা আবেগপ্রাচুর্য্য দেখি। আবেগবিবশ কবি তাঁহার মানসী দেবীর দ্বারদেশে আসিয়া বলেন,

"———খোল দ্বার, খোল দ্বার!
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্য্য সভায়! নন্দনবনের মাঝে
নির্জ্জন মন্দির খানি,—সেথায় বিরাজে
একটী কুসুম শয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী. জ্যোতির্ম্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা!"

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতার আবেশে বিবশ এবং আত্মহারা না হইয়া আত্মস্থ হয়েন; অধ্যাত্মজগতের কত অন্ধকারময় প্রদেশকে দিব্যজ্যোতিতে প্রদীপ্ত করেন; কবি মানুষের সুখদুঃখের ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে সুখদুঃখাতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উপস্থিত হয়েন।

অন্যান্য কবিরা (বাইরণ্ প্রভৃতি) জাগতিক দুঃখ দেখিয়া হয়ত জ্বালাময়ী ভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্গার করেন, সেস্থলে আমাদের বরেণ্য কবি দুঃখের ভিতরে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য দেখিয়া অবাক্; তাই কবি বলিতেছেন, "Sorrow, that is not sorrow, but delight." তাই কবি ধ্যান করেন,

"The soothing thought that spring
Out of human suffering ;"

আমরা এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার এক্সকারসান (Excursion) হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব :—

"————————; thus feeds
A calm, a beautiful and silent fire
umbrances of m
sappoint
From error, disappointment—nay, from guilt,
And sometimes, so relenting justice wills,
From palpable oppressions of despair."

যেমন শুভ্র আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ করিলে সপ্তধা বিভক্ত বিচিত্র বর্ণপেটকের (Solar spectrum) সৃষ্টি হয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিকট তদ্রূপ সুখ দুঃখ মূল কারণে বিশ্লিষ্ট হইয়া এক বিচিত্র এবং অভিনব সত্য দেখাইয়া দেয়। এই অন্তর্দৃষ্টি বা আধ্যাত্মিকতা কয়জন কবির আছে? দুঃখকে দুঃখের পরিচ্ছদে দেখান কঠিন নহে; কিন্তু দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত দেখান সামান্য কৌশলের কথা নহে; কৌশল কথাটী বলিলেও যেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিত্বের একটু অপহানি করা হয়; কেননা ইহা তাঁহার কষ্টকল্পনা নহে; ইহা রক্ত মাংসের ন্যায় তাঁহার নিজস্ব এবং ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় যৌবনের প্রমত্ত আবেগ দেখা যায় না। তাঁহার কবিতা প্রশান্তগম্ভীর; কোমলকান্তপদাবলী নহে। এই কারণেই জনসাধারণের নিকট কবি তত আদৃত নহেন। কিন্তু সব জিনিষেরই ত একটা অন্ত আছে। মত্ত আবেগেরও অবসাদ আছে; সময়ে সময়ে ঝাত্যাবিক্ষুব্ধ, ফেনিলোচ্ছ্বল বারিধিও সে রুদ্রভৈরব মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে বেলাভূমি চুম্বন করে; তখন তাহার তাণ্ডব নৃত্য ও অট্টহাস, মৃত্যু-

শয্যা ও করুণ ক্রন্দনে পরিণত হয়; আমাদের জীবনও সেইরূপ। জীবনের প্রতিপদে ঘাত প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব। জীবনসংগ্রামে আঘাত পাইয়া যখন আমাদের সকল অভিমান চূর্ণীকৃত হয় এবং পৃথিবীর চাঞ্চল্য আর ভাল লাগেনা, তখন মানুষ বহির্দৃষ্টি ভিতরে প্রসারিত করে; সেই সময়ই বিশ্বের জটিল প্রশ্নগুলি তাহার দৃষ্টির গতিরোধ করে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় এই বাধাগুলি অতিক্রম করিতে পারা যায়। তখন তাহার দৃষ্টির গতি অব্যাহত ও অনন্তের দিকে প্রসারিত।

বাস্তবিক ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাপাঠে আমরা ভূমার আভাস পাই এবং ভূমার আভাস পাই বলিয়াই উহা আমাদের হৃদয়কে দ্রব করে, কেননা "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"। ধ্যানস্তিমিতলোচন কবি শ্যামল প্রান্তরে, কলনাদিনী স্রোতস্বতীতে, অভ্রভেদী পর্ব্বতমালায়, আকাশের নীলিমায়, তরুর মর্ম্মরধ্বনিতে, কুসুমসুষমার মধ্যে [illegible] অস্তিত্ব দেখিতেছেন। তাহা[illegible]ছ সে সময় বিশ্বে[illegible]কেনা, কিম্বা কোন সংশয়ও থাকেনা; সে অবস্থা অনির্ব্বচনীয়। ইহা তাঁহারই ভাষায়

"..............................That blessed mood
In which the burden of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligent world
Is lightened—that serene and blessed mood;"

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাটের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন; ইংরাজী সাহিত্য সমালোচক ইহাকে প্যান্থিইজম্ (Pantheism) বলিয়া ঘৃণা করিলেও আমরা ইহাতে আর্য্যভাবের সাদৃশ্য দেখি। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও বলিতেছেন,

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ!!

এইস্থলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দৃঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ।

দীনতা (HUMILITY)

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন এবং তাহাদের ভিত্তিস্থানীয় অতি প্রাচীন শ্রুতিনিবহের অধ্যয়নে অবগত হওয়া যায়, এক মাত্র আত্মাই সনাতন পদার্থ, যাঁহার উপরে এই ভূতভৌতিক অনন্ত শক্তিসঙ্ঘাতের দ্বন্দ্বতরঙ্গ প্রতিনিয়ত উত্থিত হইয়া সেই অনন্ত সত্তাসমুদ্রেই লীন হইতেছে। আত্মাভিন্ন পদার্থান্তরের অভাব সূচিত হওয়ায় ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, ব্যবহারিক জ্ঞান ও যদবলম্বনে এই ব্যবহারিক নানাত্বাবভাস উপস্থিত হইতেছে, সেই রূপরসাদি পদার্থ ও তাহার গ্রাহক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমস্তই পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," প্রভৃতি মহাবাক্যের আপ্ততায় সন্দেহ না থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে, নানাত্বজ্ঞানে ব্যামোহগত জীবের ব্যবহারিক জ্ঞান একত্বজ্ঞানের প্রতিরোধক এবং আলো অন্ধকারের ন্যায় একান্ত বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" হে সৌম্য, বিকাশভূত উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সদাত্মাই বর্ত্তমান ছিলেন, এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ কিছুই ছিলনা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি আত্মার আধ্যাসিক বিকারে এরূপ ইতরেতর জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে সেই আত্মা নিশ্চয়ই নিজে দ্রষ্টা ও দৃশ্য রূপে পরিণত হইয়াছেন, নতুবা দ্বৈত জ্ঞান ও তদানুষঙ্গিক নানাত্বজ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে? জ্ঞানজননী শ্রুতি বলিতেছেন, ঊর্ণনাভ যেমন নিজেই নাভি হইতে সূত্র বাহির করিয়া উপাদান কারণরূপে জালে অবস্থিত হয়, আর জাল গ্রন্থনে সে যেমন নিজেই তাহার নিমিত্ত কারণ হইয়া জালকেন্দ্রে অবস্থিতি করে, সেইরূপ সেই সর্ব্বভেদরহিত আত্মা নিজ শক্তি মায়া সহায়ে এই সূক্ষ্মস্থূল প্রপঞ্চে পরিণত হইয়া তাহাতেই অবস্থান করিতেছেন। নিজেই এই বিচিত্র জগজ্জাল রচনার নিমিত্তোপাদন কারণ হইয়া একত্বরূপ স্বস্বরূপেই অবস্থিত আছেন। নামরূপাদি আধ্যাসিক উপাধি নিগমে এক সৎবস্তুই স্বয়ংপ্রভরূপে অবস্থিত আছেন। সুতরাং নানাত্বজ্ঞান ব্যবহারিকরূপে সত্য হইয়াও মহাতেজস্বভাব আত্মার মহিমায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে।

শ্রুতি বলিতেছেন, সেই ভূমা আত্মা যিনি সর্ব্বব্যাপক, সত্তাবভাসক ও সর্ব্ব-

ব্যবহারের ভিত্তিভূমি, যাঁহার মহিমায় কোটী কোটি সৃষ্টিতরঙ্গ—মহাম্বুধিতে জলগলগুলা উত্থিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা তাঁহারি অচিন্ত্যশক্তি মায়া সাহায্যে অহমিকাভাব প্রাপ্ত হইয়া একভাগ দ্রষ্টা ও অন্যভাগ দৃশ্যরূপে পরিণত হওত জগতের ব্যবহারিক বিচিত্রতা উৎপাদন করিতেছে। অন্যশাস্ত্রাদির কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানরত্নগর্ভা শ্রুতিও এই ব্রহ্মের দ্বৈতবম পরিণমনরূপরহস্যভেদে নতমুখী হইয়া তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়া বলিতেছেন,— "লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যং" ব্রহ্মের এই দ্বৈতকল্প দ্রষ্টাদৃশ্যরূপ পরিণমন কেবল লীলা বা খেলামাত্র। যে মায়াশক্তি সহায়ে ব্রহ্মের এই আধ্যাসিক পরিণতি, বেদান্ত শাস্ত্রে তাহা অব্যক্ত বা মায়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যাদিস্মৃতিশাস্ত্রে তাহা প্রকৃতি, অজ্ঞান, অবিদ্যা; পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে তাহা মহাশক্তি, কালী, সীতা ও রাধা প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। মায়াসহায় আত্মার প্রথম পরিণাম মহদাখ্য অহমিকাবুদ্ধি। তাহার উপরে মন, বুদ্ধি, ভূততন্মাত্রাদি, স্থূল প্রপঞ্চ, স্থূল জগতাদির বিচিত্র সোপানমালা শোভা পাই-তেছে। সমষ্টি পক্ষে এই ব্রহ্মের অহমিকাবুদ্ধিই সৃষ্টিবীজ, যাহা ঈশ্বরাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ব্যষ্টি পক্ষেও অহমিকাবুদ্ধি অবলম্বনেই জীবের সৃষ্টি হইতেছে। জীবের এই অহংজ্ঞান ভূতভৌতিক সংমিশ্রণোৎপন্ন দেহে অধ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া জগতের সমস্ত ব্যবহারিক সত্তা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। জীব মাত্রেই "আমি" "আমি" করিতেছে, জীবের এই অহমিকা বুদ্ধির আশ্রয় দেহ জন্মিতেছে ও কালে লীন হইয়া যাইতেছে। তথাপি আমৃত্যু এই অহমিকার অধ্যাস নিরস্ত হইতেছে না। ভগবান্ রামকৃষ্ণ জীবের এই দেহাধ্যস্ত আমিত্বকে কাঁচা আমি এবং দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ও অহমিকাতীত সৎস্বরূপাবস্থানকে পাকা আমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

কাঁচা আমি এই ভূতবিকার দেহকে আমিত্বের কেন্দ্র করিয়া তদবলম্বনে অন্যান্য আধ্যাসিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছেন। পাকা আমি এই স্থূল বিকারের, মন বুদ্ধি অহমিকার অতীত দেশে সন্মাত্রাবস্থিত হইয়া জগদিন্দ্রজালের গূঢ়রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মায়াসমাশ্রয়ে ব্রহ্মের বিরাট্ জগজ্জাল কল্পনা, অথবা অবিদ্যা সহায়ে জীবের স্থূল বা মানসিক কল্পনা উভয়ই কাঁচা আমিত্বের সম্প্রসারণ মাত্র। উপাধিশূন্য পাকা আমিত্বে জীব সৎস্বরূপাবস্থিত হইয়া তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের জীবত্মানুভূতির সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাকে।

এক বস্তুতে অন্য বস্তুর মিথ্যা আরোপ করার নাম অধ্যাস। শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান অধ্যাসবাদের উদাহরণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। স্থাবরাদিমনান্ত সকলই জড়রূপে অবস্থিত। জড়চৈতন্যের অন্যোন্যাধ্যাস সমগ্র ব্যবহারের কারণ রূপে বর্ত্তমান ও দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বন্ধনের একমাত্র কারণ। যে চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, তাহা অহমিকাবুদ্ধির আশ্রয়ে খণ্ডিতের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া জীবকে ব্রহ্ম পদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে বোধ করাইতেছে। এই ভেদজ্ঞানের নিঃশেষ নিরাসই মুক্তি বলিয়া শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

যে কোন সাধনা দ্বারা এই খণ্ডিতা অহমিকা বুদ্ধি ব্রহ্মাবগাহিনী করাইতে পারিলে নানাত্ব জ্ঞান নিরাকৃত হইয়া জীব স্বরূপাবস্থিত হয়। সেই আদিম একত্ব যাহা জীবের প্রকৃতস্বরূপ (birth right) তাহা পুনর্লাভ করাই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ও সর্ব্বলোকের চিন্তা, চেষ্টা ও তপস্যা প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে সেই একত্বানুভূতি লাভে প্রতিনিয়ত ধাবমান হইতেছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতভৌতিক পদার্থ সেই অনাদ্যনন্ত চিৎসমুদ্রের তরঙ্গবুদ্বুদ মাত্র, তাহাতে উঠিয়া তাহাতেই নিজাস্তিত্ব ডুবাইতে ব্যস্ত রহিয়াছে। পরোক্ষে কি প্রত্যক্ষে জীবমাত্রেই আপনার হৃত রাজ্য সংস্বরূপ লাভের জন্য অপার সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে।

এই একত্বাবগাহিনী চেষ্টা জীবে দ্বিবিধ ভাবে স্ফুরিতা দৃষ্ট হয়। যাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রখরা নহে, যাহারা জগৎকে একবারে ভ্রম বলিতে ভীত হয়, যাহারা সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বভাব রহিত নির্ব্বাণ মুক্তির গরিষ্ঠ শেখরে উঠিতে সাহসী নহে, তাহারা অহমিকা বুদ্ধির আশ্রয়ে আপনাকে ব্রহ্মের অংশাংশরূপে গ্রহণ করিয়া অহং অতিরিক্ত যাবতীয় স্ফুরণকে ভগবৎসত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। জগতের অধিকাংশ জীবই এই পন্থাবলম্বী। পক্ষান্তরে যাহারা জন্মান্তরীয় সুকৃতিবশাৎ মার্জ্জিতসংস্কার, বিবেক-বৈরাগ্যবান্, বেদবেদান্তাদিশাস্ত্রার্থদর্শী ও গুরুনিষ্ঠ, তাহারা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্ঞাত হইয়া "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী",—মহাবলোদৃপ্ত সিংহবৎ জগজ্জাল ভেদ করিয়া নির্গত হয়।

আমি ভিন্ন যাবতীয় স্ফুরণ ভগবৎসত্তা, এ ধারণাও জীবের অনায়াস-সাধ্য নহে। এই ধারণা আনিবার জন্য জীবকে কোন প্রতীকাবলম্বনে

সাধনতৎপর হইতে হয়। মানুষ মানুষপ্রতীকে যেমন সহজে প্রীতি লাভ করে, যেমন সহজে আদর্শ লাভ চেষ্টায় সফলকাম হয়, অন্য কোন রূপে তেমনটী হইতে দেখা যায় না। এই জন্য এই সকল ভাবপ্রবণ জীব, ভক্তি ভজনাদি মার্গে নিজ নিজ আদর্শ লাভে অগ্রসর হইতে থাকে। বিচারপ্রবণ জ্ঞানপ্রধান জীবও আত্মতত্ত্ব হৃদস্থ করিতে শ্রবণমননাদি সহায়ে অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করে। উভয়ের উদ্দেশ্য একই। উপায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্র।

জ্ঞানীর চেষ্টা—এই ক্ষুদ্র আমিত্ব যাহা দেহাদি উপাধি-বশতঃ খণ্ডিতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহাকে বিচারবলে পূর্ণ আমিত্বে পরিণত করা সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ব্রহ্মত্বে পরিণত হইলে জীবমাত্রে তাহার শিবজ্ঞান হয়। সে তখন সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি বশতঃ কাহাকে উচ্চ কাহাকে নীচ, কাহাকে ধার্ম্মিক কাহাকে অধার্ম্মিক, কাহাকে পাপী কাহাকে পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বত্র সমদর্শীর আমিত্বাভিমান একেবারে [illegible] হইয়া গেলে, দেহে আত্মবুদ্ধির অভাব বশতঃ তাহার অহমিকা ধ্বংস [illegible] বুদ্ধির উৎখাতন হ[illegible]। জ্ঞানীর এই অবস্থাকে আমি দীনতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

পক্ষান্তরে যাহারা আপ[illegible]নাকে চিৎসত্তার অংশজ্ঞান করিয়া প্রতীকাদি অবলম্বনে কেবল সেবাবুদ্ধিতে সেবাপর হয়, তাহারাও আপনাদিগকে দীনাতিদীন জ্ঞানে, ইহা সকলি ভগবানের বিভূতি জানিয়া দেহাদি-বুদ্ধ্যাভিমানে মুগ্ধচিত্ত হয় না। তাহারা—"নাহং" "নাহং" বলিতে বলিতে অহমিকার উচ্ছেদ সাধন করত যে অবস্থা লাভ করে, তাহাকেও আমি দীনতা বলিয়া সিদ্ধান্তিত করিতেছি।

পূর্ব্বকথিত অংশে ইহাই বলা হইয়াছে যে, দেহাত্মবুদ্ধির নির্ম্মূলন জন্য এই জ্ঞান ও ভক্তি পন্থাদ্বয় স্বস্বপ্রধান। "কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দুনো পাল্লা ভারি"। এইজন্য ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, পরাভক্তি বা পরাজ্ঞানের চরমাবস্থা একই।

যাঁহারা প্রাগ্‌জন্মসংস্কারবশতঃ বেদোক্ত বামদেবাদি ঋষির ন্যায় জন্ম হইতেই সংসারে অনাস্থাপর, যাঁহারা প্রত্যক্ চৈতন্যে বাহ্য জগৎ মরুমরীচিকার ন্যায় ভাসমান দেখিতে পান, তাঁহারাই নামরূপাত্মক জগৎপ্রলোভনে মুগ্ধ হন না। পক্ষান্তরে যাহারা মলিনসত্ত্ব-প্রাবল্যে তাদৃক্ ধারণাশীল নহে,

তাহারাই ভজনমার্গে এই অহমিকাজ্ঞান দূরীকরণে চেষ্টাপর হইয়া থাকে। গীতামুখে ভগবান্ বলিতেছেন,—ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ যাহাদের দেহেতে অহমিকাবুদ্ধি, তাহাদের অব্যক্তাগতিলাভ অতি দুঃখে সাধিত হয়। জগতে জীবমাত্রেই বোধ হয় নিজদেহে অহমিকার অধ্যাস নিরাকরণে অসক্ত। কারণ এসংসারে জন্মগ্রহণই দ্বৈতপর—"Birth is a condition of duality" জন্মিয়াই জীব আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক্ মনে করে। সুতরাং সাধারণতঃ লোকে প্রত্যক্ষ জগৎকে উপেক্ষা করিতে পারেনা। ইহারা প্রথমতঃ বৈধী ও রাগভক্তিপথে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অন্বেষণে উন্মুখ হয়; নানা তীর্থপর্য্যটন, নানা সাধনা অবলম্বন ও নানাসাধুসঙ্গে নির্ম্মলচিত্ত এই জীবগণ ব্যক্তিভূত ঈশ্বরের চিন্তা অতিক্রমণে ক্রমে জগদ্রূপী বিরাটে, তৎপরে মহদাখ্য হিরণ্যগর্ভ বিরাটে, ক্রমে পরব্রহ্মের সত্তায় উপস্থিত হইয়া আত্মহারা হয়। তখন জীব দেখিতে পায়, ভগবান্ বলিয়া এতদিন যাহার জন্য উধাও হইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, সে ভগবান্ তাহার নির্ম্মলবুদ্ধিতে অবস্থিত। সাধনপথে আরও অগ্রসর হইলে অনুভূত হয় যে, বুদ্ধ্যুপহিত চেতনই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। তখন সে বুঝিতে পারে, আমিই সেই। তত্ত্বমসি—'তিনিই তুমি।'

প্রাথমিক এই সেব্যসেবক ভাব, সাধ্য সাধক ভাব যাহা জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক, তাহাতেই জ্ঞানের প্রথমোন্মেষণ পরিদৃষ্ট হয়। তাই দেখিতে পাই, পূতচরিত্র আর্য্যঋষিগণ অগ্নিপ্রতীকে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" বলিয়া প্রথমে আহুতি প্রদান করিতেছেন; "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং" বলিয়া সূর্য্যপ্রতীকে অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। কখন বা ইন্দ্র, মরুৎ, বরুণ, দিক্‌পাল, ঊষা প্রভৃতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া দ্বৈতভাবাবলম্বনে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে কখনো বা বলিতেছেন, "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। এক সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কেই আমরা ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণন করিতেছি। এই প্রতীকসাধনা বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিতা হইয়া উপনিষদ্‌দেশে অদ্বৈতমহাসমুদ্রাবগাহিনী হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, দ্বৈতভাবাবলম্বনে অগ্রসর হওয়াই সাধারণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে পথেই অগ্রসর হওনা কেন, তোমার আত্মানুভূতিরূপ চরম সাধনার ফল অহমিকাবুদ্ধির উচ্ছেদ বা দীনতা লাভ।

দীনতাভক্তি বা জ্ঞান সাধনার চরম ফল। সুতরাং দীনতার পরিমাণ দেখিয়াই ভক্তি বা জ্ঞান সাধনার উন্নতির পরিমাণ অনুমিত হয়। দ্বৈতপর সাধক নিষ্ঠার পরিপক্কাবস্থায় দেখিতে পায়, এই বিশ্বসৃষ্টি সকলি ভগবৎসত্তার বিরাট্ বিভূতি। আব্রহ্মকীটাণু সকলি সেই ভগবানের লীলাবিচিত্রতা প্রকাশ করিতেছে। তাই তাহার মস্তক সর্ব্বত্রই অবনত। অশ্রুবিপ্লুত-কণ্ঠে ভক্ত বলিতেছেন, "নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতস্তে। নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥ অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং। সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ হে অনন্তবীর্য্য, হে সর্ব্বস্বরূপ, আমি তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে, তোমার চতুর্দ্দিকেই প্রণাম করিতেছি। তুমি অমিতবীর্য্য, তুমিই জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান্, এইজন্য তুমি সর্ব্ব নামে অভিহিত হও। তখন "যথা যথা নেত্র পড়ে, তথা তথা ইষ্ট স্ফুরে।" এই ভাবোন্মত্ত সাধকের অহমিকার আলম্বন কোথায় থাকিতে পারে? যাঁহারা এই ভক্তিপথে গসর নহেন, এমন কি। যাঁহারা ঈশ্বরাস্তিত্বেও সন্দেহাত্মা, তাঁহাদিগকে অ [illegible] আসমাসমুদ্র [illegible] কলাকৌশলবিমান, ঐ জিজ্ঞাসা কার, [illegible] নক্ষত্রখচিত [illegible] অমৃতনিস্যন্দিনী সাগরান্তমিলিতা কলনাদিনী কল্লোলিনীকুল, এই সহস্র-পোতবক্ষ উত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্কুল বিশাল মহাম্বুধি, এই কোটি-কোটি-জীব-জন্তু-কীট-পতঙ্গ-মনুষ্য-সমাকুলিত ধনধান্যশোভিত ভূপৃষ্ঠ, এই অনন্ত সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বাদ্যাসের উদ্দামতাণ্ডবনৃত্য, ঐ জন্ম মৃত্যুর দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা, এই বিশ্ববিধ্বংসী দুর্নিবার কালচক্রনেমির গভীর নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া "আমি কোথায়!" এ চিন্তায় ক্ষণতরেও কে না অভিভূত হয়? অনন্ত সৃষ্টি-সমুদ্রের ক্ষুদ্র বারিবিন্দুসম এই পৃথিবী যাহাতে আমরা কোটি কোটি প্রাণী অবস্থান করিতেছি, সেই জগতে আমার অস্তিত্ব কোথায়? এই রেতোরক্তসংঘাত, অনন্ত আধি ব্যাধির লীলাভূমি, শীতাতপ সুখদুঃখ দ্বন্দ্বাঘাতে বিতাড়িত, প্রতিনিয়ত ধ্বংসপথে নীয়মান দেহ, যাহা আমার আমিত্বের কেন্দ্রস্থল, তাহার নিয়ত পরিণতির বিষয় ভাবিলে আমার অস্তিত্ব কোথায় পাওয়া যায়? শতজ্বালা-লেলিহান-জিহ্ব শ্মশানাগ্নির ভীষণ ব্যাদানে আমার আমিত্ব কোথায়? জন্ম জরা মৃত্যুর দুর্নিবার নিষ্পেষণে দেহকেন্দ্রাবস্থিত আমিত্বের সম্প্রসার কোথায়? হে জীব! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইলে বুঝিব, তুমি আত্মচিন্তাবিমুখ মহাপরাধী আত্মঘাতী। তোমার মুখ-দর্শনে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইতে হয়। এই দুর্ল্লভ শরীর ধারণ করিয়া যদি এই

আমিত্বের মীমাংসা না হইল, ধিক্ তোমার বিদ্যায়, ধিক্ তোমার বুদ্ধিতে, ধিক্ তোমার কুলশীলে, ধিক্ তোমার ধনেজনে। হইতে পার তুমি বিদ্বান্, মেধাবী, যশস্বী, নির্জ্জিতশত্রু, পরাক্রম, শতসহস্রসৈন্যসহায় পরদেশলুণ্ঠনকারী, বাহ্বাস্ফোটনশীল প্রবলপ্রতাপান্বিত। কিন্তু যদি তুমি আত্মচিন্তাবিমুখ, যদি তুমি কেবল জড়মাংসপিণ্ডভারবাহী হও, তবে তোমার বিজ্ঞানে, তোমার তড়িৎসহায়ে জগতের অদ্ভুত সুখস্বচ্ছন্দবিধাননিপুণতায় তত্ত্বজ্ঞের মনে কেবল হাসির হিন্দোল উঠে। কারণ, অনাত্মজ্ঞ তুমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছ। তাই বলিতেছিলাম, স্থূল বা সূক্ষ্ম যে দিকেই কেন চিন্তাবৃত্তি প্রবাহিত করনা, দেখিবে—তোমার ক্ষুদ্র আমিত্বের দাঁড়াইবার স্থান তিলমাত্র এ সংসারে নাই। নতমুখে ক্রন্দন করিয়া বল, হে ভগবন্, আমি ত তোমার সৃষ্টিরহস্যের তিলমাত্র বুঝিতে পারিলাম না আমায়। দয়া করিয়া তত্ত্বজ্ঞান দেও; আমার কাঁচা আমিত্বের বাঁধ ভেঙ্গে দেও। আমি আপনার স্বরূপ আপনি দেখে এই নরজন্ম ধন্য করিয়া তোমার রঙ্গভূমি হইতে জন্মের মত নিষ্ক্রান্ত হই। আমি তৃণাদপি সুনীচ হইয়া আমার আমিত্বের ধ্বংস সাধন করি।

নারদীয় ভক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"ওঁ ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ চ" অর্থাৎ ভগবান্ও অভিমানীকে দ্বেষ ও দীনহীনকে প্রেম করিয়া থাকেন। Imitation of Christ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—God bestows great grace upon the humble and after one's humiliation he raises one to glory. অর্থাৎ দীনের প্রতি ভগবানের সমধিক কৃপা হয়; দীনতালাভের পর দীননাথ ভগবান্ দীনভক্তকে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত করেন। বস্তুতঃ দীনের কাতরোক্তিতে ভগবানের সিংহাসন টলিয়া থাকে। দীনভক্তের বিপদে ভগবানকে ছুটিয়া আসিতে হয়। সর্ব্বদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার শতশঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডীয় কবি বলিয়াছেন, Resignation gently slopes the way, His heaven commences ere he passes away অর্থাৎ ভগবানে নির্ভরতা স্বর্লোক প্রাপ্তির পন্থা প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং জীবিতাবস্থায়ই তাহার স্বর্গসুখ অনুভূতি হয়। Thomas a Kempis তাঁহার Imitation of Christ গ্রন্থে বলিতেছেন,—"Dying to self and living eternally to me" অর্থাৎ আমিত্ব-অভিমান মৃত হইলে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে,

অহমিকার একান্ত উচ্ছেদ হইলে দীনভক্তও অনন্ত জীবন লাভ করে বা ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

দীনতা মানবচরিত্রের অত্যুজ্জ্বল অলঙ্কার। সংসারজীবনেও ইহার অদ্ভুত প্রভাব দৃষ্ট হয়। অভিমানীকে সকলেই দ্বেষ করে। দীনতা সর্ব্বত্র জয় লাভ করে। আচণ্ডাল সকলে তাহার দীন চরিত্রে মোহিত হয়। ধর্ম্ম-জগতের ত কথাই নাই। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মূলে দীনতা ও তৎসহচারী সৎসাহস ও নির্ভরতাই রাজত্ব করিতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতনিয়ামক হইয়াও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ মহম্মদ একচ্ছত্রী সম্রাট্ হইয়াও নিজকে কূপজলোত্তোলনরূপ দাস্যকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও দীনহীন সন্ন্যাসীর বেশ ধারিয়া জগতের পূজ্য হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের দীনাতিদীনতা ও অভিমানশূন্যতা আজিও আবঙ্গ-উৎকলে বিঘোষিত হইতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দীনতার সাধনা তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছে।

দীনতা ভক্তি সাধনার প্রধান অঙ্গ। অথবা দীনতা ভক্তি সাধনার পরিপক্ক ফল। দীনভক্ত যে ঈশ্বরানুগৃহীত, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এই যে, জীবমাত্রই তাহাকে প্রেম করে। দীনভক্তের পদচালনে পৃথিবী পবিত্রা হয়, সাধারণ স্থল মহাতীর্থে পরিণত হয়; তাঁহার সঙ্গিগণ নব জীবন প্রাপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডলের কুভাবতরঙ্গ প্রশমিত করিয়া তিনি শান্তির মৃদুমন্দসমীরণ প্রবাহিত করেন। তাঁহার চিত্তাকর্ষক চরিত্রে জীবমাত্রেই বশীভূত হইয়া পড়ে। তাঁহার সকলের প্রতি সমদৃষ্টিতে, তাঁহার চরিত্রের মধুরতায়, তাঁহার মিষ্টবাক্যে ও বিনম্রদৃষ্টিতে কুপথগামী জনগণ নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আপনারা মনে রাখিবেন, দীনতা ও ক্লীবতায় অনেক প্রভেদ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রারম্ভে অর্জ্জুনের দৈন্যভাবে ক্লীবতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কুরুবাহিনীর উদ্দাম কল্লোল, ভীষ্ম দ্রোণাদির অপরিমিত শৌর্য্য ও রণ-পাণ্ডিত্য স্মরণ করিয়া অর্জ্জুনের মনে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যে অবসাদ, বিষণ্ণতা ও পরাজয়ভীতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দীনতাদ্যোতক নহে—তাহা বরং ক্লৈব্যকলঙ্কিত হতাশের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতত্ত্বয্যুপ-

পদ্যতে" হে পৃথুবংশজাত মহাবীর! এ সময় তোমার এ ক্লীবতা সাজে না। যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। দীন সাধক কাপুরুষ নহে। দীন-সাধকের বাহ্য দীন বেশের মধ্যে সিংহসাহসিকতা এবং অমানুষী বিক্রম লুক্কায়িত থাকে। প্রকৃত দীনসাধককে কুসুমকোমলতা দেখিয়া এমন কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহাতে ক্লীবতা অবস্থান করে। সময়বিশেষে দীন-সাধকের তেজস্বিতায় বিশ্ব স্তম্ভিত হয়, সুমেরু বিচলিত হইতে দেখা যায়। ভগবান্ মহম্মদের জীবনচরিত্রালোচনায় দৃষ্ট হয় যে, ধর্ম্মপ্রচারকালে তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তা একদিন মহম্মদকে নিহত করিবার উদ্দেশে ডারথার (Darther) নামক একজন অশ্বারোহী যোদ্ধাকে গোপনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন মহম্মদ কোন বৃক্ষতলে নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। অস্ত্রধারী অশ্বারোহী নিজ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়া নিদ্রোত্থিত সিংহবিক্রম মহম্মদের আল্লা আল্লা গভীর গর্জ্জনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ধর্ম্মবীর নিরীহ থিয়োডোর পারকার্ লক্ষ বিরোধী শত্রু-সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এই আমি থিয়োডোর, এখানেই রহিয়াছি, কে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিবে?" তাঁহার অমানুষিক তেজ দেখিয়া শত্রু-গণ ভয়ে জড় সড় হইয়া আর তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করিল না। ওরগাঁয়ের ডাঙ্গার মাঠে শক্তিসাধক কমলাকান্ত ডাকাতের হাতে পড়িয়া যে অকুতোভয়তা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশবাসী সকলেই তাহা অবগত আছেন। দীনাতিদীন ভাবাবলম্বনে অবস্থিত ভগবান্ রাম-কৃষ্ণের মৃদুমন্দ শ্লেষোক্তিতে কত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ গণ্যমান্য আত্মম্ভরিগণের হৃদয়ে যে কত ধিক্কার জন্মিত, তাহারা যে কতদূর হতপ্রভ হইত, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি তৎকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের অবিদিত নাই। কৌপীনসম্বল দীনবেশ-ধারী মমগুরুদেব পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারোপলক্ষে অবস্থানকালে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াও সৎসাহসরহিত হইয়া কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই। পরন্তু সেই তেজস্বিতায় লক্ষ লক্ষ নর নারী মেষশাবকযূথের ন্যায় তাঁহারি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রাম্যমান হইত। সুতরাং দীনাতিদীন হইলেও যে তাহাতে প্রাকৃত জীবের ভীরুতা ও কাপুরুষতা অবস্থান করিবে, একথা তিল মাত্র হৃদয়ে স্থান দিবেন না।

যাঁহারা জ্ঞানপথে অগ্রসর, যাঁহারা বিচারের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে জগদ্ব্যাপার তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া একমাত্র আত্মচিন্তাপর, যাঁহাদিগকে ত্রিসংসারে জ্ঞানী

আখ্যা প্রদান করে, তাঁহাদের দীনতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মহা-পণ্ডিত Newton কে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার সমক্ষে বহুমানদান কালে Newton বলিয়াছিলেন, আমি মহাজ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া দুএকটী উপল খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের প্রপিতামহ সক্রেটিসকে একজন Sophist জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনাকে Athens এর লোকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলে কেন? তদুত্তরে সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে, এতকাল অনুরাগভরে প্রকৃতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াও যে তিনি কিছুমাত্র জগদ্রহস্য বুঝিতে পারেন নাই, ইহা তিনি অনুভব করিয়াছেন। বোধ হয় অন্যে তেমন অনুভব করেন নাই, তাই তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ বলা হয়। শ্রুতি বলিতেছেন,—"মতং যস্য ন বেদ সঃ", যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানি বলিয়া বোধ করে, সে তাঁহার স্বরূপ ঠিক জানেনা। জ্ঞানরাজ্যে যে যত অগ্রসর, তাহার দীনাতিদীনতা ততই পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। তাই বলিতেছিলাম, চাই বিচারপথে যাও, চাই ভগবচ্চরণে আপনাকে বিক্রীত করিতেই শেখ, উভয়ের উৎকর্ষতায়ই দীনতা তোমাকে অলঙ্কৃত করিবে। এই দীনতা না আসিলে বুঝিব যে, তোমার জ্ঞান বা ভক্তি কথার কথা মাত্র, অন্তরে কিছু মাত্র অনুভূতি হয় নাই। সুতরাং এই আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম, প্রকৃত দীনতায় যেমন সাধকের সৎসাহস ও প্রতিভার হানি করে না, প্রকৃত জ্ঞানস্ফুরণও তেমনি দীনতার প্রতিরোধক হয় না।

আমরা শাস্ত্রমুখে দীনতার লীলাভূমি অনেক মহাপুরুষের বিষয় অবগত আছি। সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপ শত শত আলোকস্তম্ভরূপী মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে। শুধু ঐ সকল শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত পড়িয়া কিন্তু প্রাণের ভিতর তেমন ছাপ পড়েনা। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, পাঁজি নিঙ্ড়াইলে একবিন্দু জলও পাওয়া যায় না; যদিও তাতে লিখা থাকে যে এবার ২০ আড়া জল হইবে। যাঁহারা প্রকৃত দীন সাধকের দর্শন পান, তাঁহারাই ঠিক্ ঠিক্ দীনতা কি, তাহা বুঝিতে পারেন এবং নিজ জীবনে তাহার রং কতকটা ফলাইতে চেষ্টা করিয়াও থাকেন। আমার পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যফলে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের একজন দীন ভক্ত সন্তানের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। এই দীনাবতার মহাপুরুষ নাগ মহাশয়কে অনেকে দর্শন করিয়াছেন, অনেকে তাঁহাকে না দেখিয়াও তাঁহার সর্ব্বংসহা প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মহাশয় আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাঙ্গোপাঙ্গগণ মধ্যেই এরূপ চরিত্রবান্ দীনতার অবতারের জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। আমার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড হইতে প্রথমবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাগবাজারস্থ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বসিয়া নাগ মহাশয় সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর-নাগ ত্বং খলু কৃতী"। আমরা কেবল তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে করিতেই হত হইলাম। আমাদের মধ্যে মধুকর নাগ মহাশয়ই ঠাকুরের একমাত্র কৃতী সন্তান। এই মহাপুরুষকে যাঁহারা দিনেকের তরেও দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, দীনতা কি। মনুষ্যদেহে এর চেয়ে দৈন্যভাব আর যে হইতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। বিড়াল ইন্দুর ধরিয়া যেমন তাহাকে বার বার ছাড়িয়া দেয় আবার বার বার কামড়াইয়া ধরে এবং অব-শেষে তাহার বধ সাধন করে, নাগ মহাশয় ঠিক্ সেইরূপে অহমিকাবুদ্ধিকে বার বার নির্য্যাতন করিয়া যেন অবশেষে তাহার নিঃশেষ প্রাণবধ সাধন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পবিত্রতার জ্বলন্তমূর্ত্তি দীনতা অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ-ভূষিত নাগমহাশয়কে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব তাঁহার মহাসমন্বয় কার্য্যে জগদ্বাসীর নিকট অন্যতম মহামূল্য দায়স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভাব অঙ্কনে আমার বিদ্যাবুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়। জীবনের প্রথমপথ-প্রদর্শক এই মহাপুরুষের দেহবুদ্ধি আদৌ ছিল না। এত দয়া, এত প্রেম, এত স্নেহ, এত ভক্তি, এত দীনতার একত্রাবস্থান বর্ণনা করিতে বোধ হয় অনেকেই সমর্থ হননা। বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিতে দেখিলে যাঁহার অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইত, সামান্য পিপীলিকা মরিবে বলিয়া যিনি প্রতিপদ-ক্ষেপে দেখিয়া দেখিয়া পথ চলিতেন, জীবমাত্রেই যাঁহার ঠিক্ ঠিক্ ভগবদ্বুদ্ধির প্রস্ফুরণ নয়নগোচর করিয়াছি, মরিবার অগ্রেই যিনি সংসার-সম্বন্ধে মরিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র একসত্তানুভূতির পর্য্যাপ্ত সীমায় গমন করিয়াও যিনি সর্ব্বদাই "নাহং" "নাহং" "তুঁহু" "তুঁহু" করিতেন, ঈদৃশ মহাপুরুষ চরিত্রালোচনার জন্যই আমার এই প্রবন্ধের সূচনা। তাঁহার দীনতা স্মরণে স্বতই দীনতার ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সেই জলচ্চক্ষু উদ্ভাসিত প্রফুল্ল মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া মনে হয়, শাস্ত্রবাক্য সবি সত্য, শাস্ত্রকার-গণ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত বর্ণনা করেন নাই।

এত দীনতা সত্ত্বেও মহাপুরুষ নাগ মহাশয়ে ক্লৈব্য দেখিতে পাই নাই। শুনি-

য়াছি, তাঁহার দর্শনার্থী কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দেওভোগে তাঁহার বাসস্থানে বসিয়া পরমহংসদেব সম্বন্ধে কি শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন। তিনি করযোড়ে তাঁহাকে ঐরূপ প্রসঙ্গ করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। অগত্যা সিংহ গর্জ্জনে পাদুকাঘাতে তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, হায় হায়, গৃহে বসিয়া ঠাকুরের নিন্দা শুনিতে হইল, ধিক্— এ গৃহস্থাশ্রমকে!! শুনিতে পাই, সেই ভদ্রলোকটী রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নাগ মহাশয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই স্থলে কোন অতিরঞ্জিত কথার অবতারণা হয় নাই, একথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্য, অপরিসীম তিতিক্ষা, অপরিমেয় মনস্বিতা এবং আশ্চর্য্য দীনতায়, মানুষ ত তুচ্ছ, দেওভোগগ্রামের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত যেন প্রেমশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া গিয়াছিল। বন্য পক্ষী তাঁহার হাত থেকে খাবার নিত, আমার একথা শুনা আছে। তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট বংশশীর্ষ কাহারো কাটিবার সাধ্য হয় নাই। কেহ কাটিতে গেলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার উদ্ভাসিত চক্ষে যেন সে অধীরতার চিহ্ন স্পষ্ট প্রতিভাত হইত। রুদ্ধকণ্ঠে জোড়হাতে বলিছেন, আহা ঐ বংশকর্ত্তনে ভগবানের অঙ্গে আঘাত লাগিবে। এত কোমলতা মানুষে কল্পনা করিতে পারেন কি? এইত এত কোমল—এই আবার গুরুনিন্দা শুনিয়া বজ্রদপি কঠোর। সাধক! এই আশ্চর্য্য সম্মিলন দেখিয়া তুমি অলক্ষ্যেও কি মুগ্ধ হইবে না? তুমি কি এখনও বলিতে চাও, দীনসাধক কাপুরুষ হয়?

স্বয়ং সম্মার্জ্জনী দন্তে ধারণ করিয়া মহা অপবিত্র স্থান সংমার্জ্জন করা, তৃণাদপি লঘু হইয়া অগ্রেই সকলকে প্রণাম করা, উচ্ছিষ্ট পত্র মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা, সরল ও উদার বুদ্ধিতে ব্যক্তিবিশেষকে মালীরূপে ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দেওয়া, প্রভৃতি শতশঃ দৃষ্টান্তের স্থল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমানুষিক দীনতার বিষয় সমাগত সকলেই বিশেষ বিদিত আছেন। শিশুর সরলতা, কুসুমের কোমলতা, সাগরের গভীরতা, আকাশের বিশালতা, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, ভক্তির স্নিগ্ধতার একত্র সমাবেশ ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রসঙ্গে যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সর্ব্বমতসমদর্শিনী দীনতাই সূচিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জগতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-প্রচারের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। এ সময় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধবাদ,

তীব্রসমালোচনা ও শ্লেষোক্তি আমাদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে। দীনতার অভেদ্য কবচে দেহাবৃত করিয়া আমাদিগকে সকল মত সকল পথের লোকদিগের সঙ্গে মিশিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন কাহারো ভাব নষ্ট না করিয়া সকল মত সকল পথকে সমান চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক মতবাদের নির্মূল সাধনে তাঁহার অলৌকিক দীনাতিদীনতা যেমন মহতী কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাঁহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকেও তেমনি অসাম্প্রদায়িক হইতে হইবে; নিরভিমান হইয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে হইবে; তবেই জানিব তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করা সফল হইয়াছে! নতুবা বহু সম্প্রদায় পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে আর একটী নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া কি ফল হইবে? যদি পার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী অভয়-বাণী সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শুনাইয়া চিরকলহকোলাহলের শান্তি কর। সে কার্য্য সাধনে প্রচারকগণের একমাত্র দীনতার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই।

বেলুড় মঠ মন্দির স্থাপিত হইবার কতিপয় দিবস পরে আমি গুরুদেবের সঙ্গে একদিন মাঠে বেড়াইতেছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, "তোদের দেশে কি কাজ কর্‌বো বল্! কেউ কাকে মানে না, সকলেই হুকুম্ কর্‌বে, হুকুম তামিল কর্‌বার কেউ নাই। বড় বড় কাজ কর্‌তে হলে, একজন নেতার কথা মেনে চল্‌তে হবে।" আরও বলিতেছিলেন, "এই দেখ্ না, আমার মঠের গুরুভাইরা যদি আমায় এখন বলে যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল আমাকে ঠাকুর বাড়ীর নর্দ্দামা সাফ্ করিয়া খাইতে হইবে, তাহা জান্‌বি আমাকে বিনা উক্তিতে এখনি করিতে হইবে। সেই Great commander হইতে পারে, যে সাধারণের উপকারে বিনা বাক্যব্যয়ে obey করিতে জানে।" এই দীনতাদ্যোতক কথা শুনিয়া আমি নির্ব্বাক্ হইয়া স্বামীজির মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

যিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জন্মের মত বিদায় দিয়া মাত্র পরার্থে দেহভার বহন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রতিপাদক্ষেপ পরহিতের নিমিত্ত কল্পিত হইত, যিনি অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির নিয়ামক হইয়াও দীনাতিদীন ভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন, আমার দীনজীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই দীনশরণ গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাদৃষ্টি দেহাত্মবুদ্ধির হেয়তা উপলব্ধি করিতে, দীনতাশিক্ষা করিতে আমাদিগকে উপযুক্ত করুক।* ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

* এই প্রবন্ধ ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা বিবেকানন্দসমিতির অধিবেশনে পঠিত হয়।

দৈব ও কর্ম্ম।

(শ্রীহরিপদ মিত্র লিখিত ।)

আমরা এমন অনেক কথা ব্যবহার করিয়া থাকি, যাহাদের যথার্থ অর্থ আমরা বুঝি না বা যাহাদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন লোকে স্ব স্ব বুদ্ধি বা অভিরুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বুঝিয়া থাকেন। এইরূপ বুঝিবার বিভিন্নতা হেতুই বাদানুবাদ ও মতভেদ এবং তাহার ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িকতা ও কলহের উৎপত্তি। দৈব ও কর্ম্ম এই দুইটী শব্দেরও অর্থ না বুঝিয়াই আমি দৈববাদী, তুমি কর্ম্মবাদী, অন্যে অদৃষ্টবাদী, এইরূপ বিভিন্ন কাল্পনিক ভেদ রচনা করিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকি। আমরা সাধারণতঃ "দৈব" তাহাকেই বলি, যাহা "আমি" বা "আমার কৃত কর্ম্ম" হইতে বিভিন্ন, দৃষ্টান্ত—যেমন আমি কোন স্থানে আম্রের বীজ রোপণ করিলাম কিন্তু উহা আম্র গাছ না হইয়া কাঁঠাল গাছ হইয়া উঠিল। আম গাছের বীজে কিরূপে কাঁঠাল গাছ হইল, ইহা না বুঝিতে পারিয়া বা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা আমাদের অজ্ঞতার উপর জ্ঞানের মোলামা চড়াইবার জন্য স্থির করিলাম যে, ইহাই "ঈশ্বরের ইচ্ছা" বা আমার "অদৃষ্ট" কিম্বা আমার "গ্রহবৈগুণ্য" কিন্তু এই সকল শব্দের যথার্থ অর্থ কিছুই বুঝিলাম না।

"কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতেছে"—আমরা সাধারণতঃ এরূপ কখনই দেখিতে পাই না। পুরাণাদি গ্রন্থে কালমাহাত্ম্যের কথা উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু কালের কর্ত্তৃত্ব কোথাও দেখা যায় না। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া "অচেতন কাল" কি কখনও কিছু করিতে পারে? সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, কতক কারণ অবিলম্বেই কার্য্য প্রসব করে আর কোন কোন কারণ কার্য্যে পরিণত হইতে সময়ের আবশ্যকতা হয়। ধান গাছ চার মাসে, কলা গাছ দুই বৎসরে, আম গাছ ৬ বৎসরে ও আকরোট গাছ ২৫ বৎসরের পর ফলিয়া থাকে। জলন্ত অগ্নিতে হাত দিলে তৎক্ষণাৎই চর্ম্ম দগ্ধ হইয়া কষ্ট বোধ হয়, বিষ পান করিলে দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাহার পরিণাম বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন, অসত্যপ্রিয়, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, চরিত্রবিহীন হইলে তাহার বাহ্য ফল ভোগ করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে। কর্ম্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, 'দৈব বলিয়া কোনই পৃথক্ কর্ত্তা নাই। সকল

কার্য্যেরই কারণ তোমার কৃতকর্ম্ম, তাহা দুইমাস, দুই বৎসর, বা দুই চারি জন্ম পূর্ব্বে অবশ্যই তুমি করিয়া থাকিবে, এখন তাহা তোমার স্মরণ হইতেছে না। কারণ, ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়া উহা যে তোমার নিজের কর্ম্মফল তাহা বুঝিতে পারিতেছ না বা বুঝিয়াও, অপ্রিয় বলিয়া, উহা তোমার কৃত কার্য্যের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে, অজ্ঞান অবস্থায় লোকে অপরকে তাহার সুখ দুঃখের কারণ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে, একটু জ্ঞানের বিকাশ হইলেই সে বুঝিতে পারে যে, সকল সুখ দুঃখের কারণ সে নিজেই, অন্যে নহে আর পূর্ণ জ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পায় যে, সুখ দুঃখের কারণ কেহই নহে, সুখ দুঃখ কেবল কল্পনা মাত্র।

সকল ধর্ম্মেই কোন না কোন আকারে কর্ম্মবাদ স্বীকার করিয়া থাকে। খৃষ্ট-ধর্ম্ম বলেন,যাহা বপন করিবে, তাহাই পাইবে। মুসলমান ধর্ম্মও বলেন, যাহারা মহম্মদকে বিশ্বাস করিবে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহারা স্বর্গে অপ্সরা লাভ করিবে ও সুখে থাকিবে। ঐ সকল ধর্ম্মে পুনর্জ্জন্মবাদ মানে না, কাজেই জন্মান্ধতা, বুদ্ধিবিভিন্নতা প্রভৃতির কারণ অন্বেষণে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণের অন্বেষণ কেবল দেশ কাল পাত্র, পিতা মাতা অথবা কে জানে কোন্ সুদূর প্রদেশে অবস্থিত ঈশ্বর নামধেয় এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের উপরই যাইয়া পড়ে। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানিয়া ও কর্ম্মফল স্বীকার করিয়াও দৈবেরও কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব আছে কি না এইরূপ সংশয় জালে জড়াইয়া পড়েন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন যে, কর্ম্মই সকল কার্য্যের মূল স্বীকার করিলে দৈব মানিবার আর আবশ্যকতা হইবে না।

পুনর্জ্জন্মবিশ্বাসী কর্ম্মবাদিগণের দৈব শক্তি ও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচা-রের আবশ্যকতা নাই। অমিশ্র দৈববাদিগণ পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর অযথা স্বেচ্ছাচারিত্বের আরোপ করিতে বাধ্য হন। যাঁহার ইচ্ছার উপর তোমার সুখদুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে, তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বা খাম-খেয়ালী ভিন্ন অন্য কি বলা যায়? কোন কোন মতাবলম্বিগণ বলেন যে, ঈশ্বর প্রাণিগণের সদসৎকর্ম্মানুযায়ী দণ্ড ও পুরস্কার রূপে দুঃখ ও সুখ দিয়া থাকেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ কি করিয়া বলা যায় আর এইরূপ বিশ্বাস করা এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মবাদী হওয়াও একই কথা। অতএব দৈব বলিয়া কোন শক্তির উপর বিশ্বাস বা নির্ভরের

কোনই প্রয়োজন নাই। কর্ম্মফল দ্বারা সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে।

আশঙ্কা করিতে পার যে, সকল সময়ে আমাদের চেষ্টা ত সফল হয় না, আমরা করিতে যাই এক, হইয়া বসে আর। যদি আমিই আমার কার্য্যের জন্য দায়ী, তবে এরূপ হইবার কারণ কি? সাধারণতঃ দেখিলে বোধ হয়, যেন আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর ন্যায়, আমাদের কোনই স্বাধীনতা নাই। একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা সকল মুহূর্ত্তেই বাস্তবিক স্বাধীন, কিন্তু কৃত কার্য্যের ফল অনিবার্য্য। বন্দুক ছুড়িবার পূর্ব্বে ছোড়া না ছোড়া সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সত্য কিন্তু একবার ছুড়িলে গুলি যথাস্থানে প্রকৃতির নিয়মানুসারে অবশ্যই যাইবে। তখন তাহা বন্ধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বাল্যকালে চরিত্র গঠনে যত্নবান্ না হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণ উপার্জ্জনের কিছু মাত্র চেষ্টা না করিয়া প্রৌঢ়ে যখন সংসারতাড়নায় বিতাড়িত হই, তখন ইচ্ছা করি যে, সুখী হইব। কিন্তু কর্ম্মফল ভোগ অনিবার্য্য, তখন তাহা হইতে পরিত্রাণ কি করিয়া পাওয়া যাইবে? এই জন্য একটু দূরদৃষ্টি আবশ্যক। দূর হইতে বিপদ্ জানিতে পারিলে পরিত্রাণের উপায় আছে কিন্তু যখন কোন বিপদে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছি, তখন কৃত কর্ম্মের ফল অনিবার্য্য জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহা সহ্য করাই কর্ত্তব্য। আমরা বহু কালের কর্ম্মের বোঝা লইয়া জন্মগ্রহণ করি। প্রত্যেক জন্মে সকল কর্ম্মের ফল প্রসবের সুবিধা হয় না তজ্জন্য ধনী হইয়াও দুঃখী, সুন্দর হইয়াও রোগী, জ্ঞানী হইয়াও ভীরুপ্রভৃতি অসামঞ্জস্যের উদাহরণ আমরা যথেষ্ট দেখিতে পাই।

আমরা নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি ইহা সত্য কিন্তু আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বস্তু নহি, আমরা সৃষ্টির অংশ মাত্র। এজন্য বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যেমন শরীরের কোন অংশ পীড়িত হইলে সর্ব্ব শরীরে তজ্জনিত কষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে, সেই রূপ সৃষ্টিমধ্যে কোথাও দুঃখ বা কষ্ট থাকিলে আমাদের সুখী হওয়া অসম্ভব। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ অতি সূক্ষ্ম বা অতি বৃহৎ বস্তুর অনুভব করিতে পারে না বলিয়া আমরা সকল সময়ে তাহা বুঝিতে সক্ষম হই না কিন্তু যখন ঐ সকল বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়ায়ত্ত হয়, তখনই উহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারি। যাহাহউক, বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিচার

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে. সুতরাং এক্ষণে কর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা আলোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমরা আমাদের কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি, তবে কি আমাদের এখন আর স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই? তাহা নহে। আমরা সকল সময়েই স্বাধীন, আমাদের পরমাত্মা কখনও কিছু করেন না, জীবাত্মাও সর্ব্ব সময়ে স্বাধীন কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফল নিবারণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যেমন যৌবনে ইন্দ্রিয়সুখে রত হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিলে প্রৌঢে ও বৃদ্ধাবস্থায় নীরোগী হওয়া অসম্ভব ও যেমন কোন স্থানে আম কিম্বা কাঁঠাল গাছ রোপণ করা আমাদের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে কিন্তু কাঁঠাল গাছ রোপণ করিয়া তাহাতে আম্র ফল প্রত্যাশা করা বৃথা, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অনিবার্য্য কিন্তু তাহাতে অভিভূত হওয়া না হওয়া আমাদের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এখন আর এক বিষম সমস্যা ও কঠিন প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহা এই যে, কেহই ত জগতে দুঃখী হইতে ইচ্ছুক নহে, সুখের জন্য সকলেই লালায়িত, তবে সকলেই সুখী হয় না কেন? কোন সময়ে এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, মনুষ্যজীবন বাঞ্ছনীয় কিনা (Is life worth living?) তাহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, এত লোক জীবিত রহিয়াছে—ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, জীবন বাঞ্ছনীয় নতুবা আত্মঘাতের (যাহা অতি সহজ) ধুম পড়িয়া যাইত; পরমহংসদেব বলিতেন, আত্মঘাত করিতে একটা কাঁটা যথেষ্ট, কিন্তু অন্যকে হত্যা করিতে খাঁড়া বা বন্দুকের প্রয়োজন হয়। আমরা বিবেচনা করি, মানুষ মাত্রেই সুখী, তবে সুখ ও দুঃখ কখনও অমিশ্র থাকিতে পারে না; যেমন বস্তু ও বস্তুর ছায়া। মায়ারূপ আলোকের কাছে বস্তুর ছায়া পড়িবেই পড়িবে তবে বস্তুর ঘনত্ব তরলত্বের উপর এবং আলোকের ন্যূনাধিক্যের উপর যেমন ছায়ার ঘনত্ব লঘুত্ব নির্ভর করে, সেইরূপ কোথাও বা কোন সময়ে সুখের মাত্রা বেশী, কোথাও বা দুঃখের মাত্রা বেশী। যেমন বনেদ, তাহার উপরিস্থ ইমারতও সেইরূপ অর্থাৎ যেমন উত্তালতরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রবক্ষে জাহাজের স্থির থাকা অসম্ভব, সেইরূপ অনিত্য বস্তুর উপর নির্ভরজনিত যে সুখ, তাহা কখনও নিত্য হইতে পারে না। আমরা প্রায়ই বিবেচনাশূন্য, তাই জমাল বলিয়াছেন.—"কেঁও ডরে কেঁও মনমে পস্তায়? পেরে তো ঝাড় বাবুরকি আম কাঁহাসে খায়?"

মৃত্যু।

(শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত।)

শিশু মৃত্যুর কিছুই জানেনা ; বালক মৃত্যুকে ভয় করে, বৃদ্ধ মৃত্যুর চিন্তায় পাপপুণ্যের খাতা মিলাইয়া দেখে এবং পাপের পরিমাণের আধিক্য দেখিয়া ভয়ত্রস্তচিত্তে জীবনের খরস্রোতা নদীতে উজান বহিয়া যাইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। উদ্ধত যৌবনের নিকট মৃত্যুর ভীষণতা নাই ; বৃদ্ধের নিকট মৃত্যুর চক্ষু কোটরগত জ্যোতিহীন ; যুবার নিকট তাহা স্নেহ ও প্রীতিপ্রদীপ্ত।

যৌবনের রাজ্যে অন্ধকার নাই ; বৃদ্ধের কাছে যাহা মহা অন্ধকার, যৌবনের নিকট সে আঁধার জ্যোতির্বিদ্ধ, তাহা আলো ও আঁধারের মিশ্রণ এবং আলো ও আঁধারের মিশ্রণ বলিয়াই স্নিগ্ধ। ছায়াময়ী গোধূলিতে তরুচ্ছায়াঘন শ্যামল প্রান্তরে প্রাসাদধ্বংস যেমন সুন্দর দেখায়, যৌবনের নিকট মৃত্যুর চিন্তা তাহাই।

কবি মৃত্যুকে "শয়নসুন্দর" বলিয়াছেন। বাস্তবিক যখন দুর্জ্জয় জীবন-সংগ্রামে শ্রান্তমানব অশ্রুসজলনয়নে বেদনাবিবশহৃদয়ের একটু বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা করে, তখন মৃত্যু মধুর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তখন স্মরণ থাকে না যে, এ চিরনিদ্রা। আর যখন মানব সমস্ত মায়াপাশ ছিন্ন করে, তখন তাহার এই দেহপিঞ্জর ভাল লাগে না ; সে তখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধবিমানে উঠিতে চাহে। তখন মায়াতীত মানব বলেন,—

" এস মৃত্যু ভেঙ্গে দাও সোণার শিকল,
অমৃতত্ব লভি পেয়ে পরশ কোমল"।

মৃত্যু তাঁহার কাছে বিশ্বের পরপারে যাইবার একমাত্র সেতু।

কিন্তু আমরা—ক্ষণিক সুখদুঃখাবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান আমরা—মৃত্যুকে ভয় করি, কেননা মৃত্যু যে চিরবিস্মৃতি। মৃত্যুর গাঢ়-তিমির-গম্ভীর-মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়বিহ্বল হই, কেননা মৃত্যুর পরে জীবনের যবনিকা উঠিলেও পূর্ব্বাভিনয়-স্মৃতি একেবারে মুছিয়া যাইবে, অথবা জীবনের যবনিকা উঠিবে কি না, তাহাই বা কে জানে ?

আমরা জানি যে, শক্তিসাতত্য বা Conservation of force অনুসারে কিছুরই ধ্বংস নাই, সমস্তই বিশ্বের বিরাট্ জঠরে বর্ত্তমান, কখন বা প্রচ্ছন্ন, কখন বা ব্যক্ত। বায়ুতে ভ্রাম্যমাণ চক্ষুর অগোচর সামান্য ধূলিকণা, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, কিম্বা খদ্যোতের ক্ষীণদীপ্তি, সমস্তই বিশ্বসংস্থানে সযত্নে সংরক্ষিত; ধ্বংস নাই, রূপান্তর মাত্র সংসাধিত হয়। কিন্তু মানবের নিকট রূপান্তরের সহিত স্মৃতির লোপ অসহ্য। শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভোগজ্ঞানের স্মৃতি যেন অনন্তকাল ধরিয়া থাকে, ইহাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আমরা যতই কেন কষ্ট পাই না, তথাপি ক্ষণিক উত্তেজনা ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে ভাবিলে কোন কারণেই মরিতে চাহিনা। ইহার কারণ মানব জীবনে কখনই অবিমিশ্রকষ্ট পায়না; সুখের আস্বাদ পাইয়া থাকেই; এবং সুখের আস্বাদ আছে বলিয়াই কষ্ট অনুভব করিবার সামর্থ্য আছে সুতরাং কষ্টের বৃশ্চিক দংশনের মধ্যে সুখস্মৃতির ক্ষণিক প্রলেপ সুখদায়ক। আমাদের জীবন দুঃখতমসাচ্ছন্ন হইলেও মাঝে মাঝে সুখসৌদামিনীর ক্ষীণ-দীপ্তি অন্ধকারে পথ দেখাইয়া দেয়। সারাজীবনই কি বরষার ঘনমেঘাচ্ছন্ন নিশীথের ন্যায় গাঢ়তিমিরাবৃত? কোন কালে বসন্তপূর্ণিমায় শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত হয় নাই? সকলের সুখের আদর্শ সমান নহে স্বীকার করি, কিন্তু প্রত্যেকেরই আপন আপন এক একটা সুখস্মৃতি আছে। এই সুখস্মৃতিই জীবনাবর্ত্তে একমাত্র আশ্রয়দণ্ড, ইহাই জীবনসাগরে একমাত্র ধ্রুবতারা।

মরিতে ভয় হয় আর এক কারণে। মৃত্যু কি এবং মৃত্যুর পশ্চাতে কি, তাহা মানবের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। মৃত্যুর পরের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অনাবিষ্কৃত। সেখানকার বার্ত্তা লইয়া কেহ ফেরে নাই। সে দেশ এমনই বিশাল যে, অনন্তকাল ধরিয়া জীবগণ তথায় যাইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, তথাপি আরও অনন্তকাল ব্যাপিয়া জীবের বাসস্থান আছে। এই অপরিজ্ঞাত দেশের কথা ভাবিয়াই ত হ্যামলেটের আত্মহত্যা করিবার সংকল্প শিথিল হইয়াছিল। তিনি বলিতেছেন,—

"But that the dread of something after death,
The undiscovered country, from whose bourne
No traveller returns, puzzles the will."

সেই অজ্ঞাত রাজ্যের বহিঃসীমা হইতে কোন যাত্রীকে আর ফিরিতে হয় নাই! সুতরাং সেখানকার সংবাদ আর কে দিবে? এই সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া অনেক দার্শনিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। কত কত শতাব্দী ব্যাপিয়া এই সকল সিদ্ধান্ত মানবের যুক্তি ও তর্কের মধ্য দিয়া আসিয়া পূর্ব্বেরই অনিশ্চিত অবস্থায় বিদ্যমান। এ রহস্য কে ভেদ করিবে!! অনেক দার্শনিক আবার রহস্যের সমাধান করিতে না পারিয়া ইহাকে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বলিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা এই প্রহেলিকাসমাধানপ্রয়াসী নরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—

ভাবিয়াছ, একি বিড়ম্বনা,
কুশাঙ্কুর বুদ্ধি মাত্র লয়ে
সৃজন রহস্য, পরিণাম
জানা যাবে তাঁরে ফাঁকি দিয়ে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে কেন বল
ব্যগ্র তুমি বাঁধিবারে সেতু;
অসম্ভব সম্ভব কি হয়,
বৃথা তবে চেষ্টা কিবা হেতু!
আমি জানি বৃথা চক্ষু মুদে
অনন্তের ধারণা ও ধ্যান,
বৃথা তর্ক, আলোচনা আর—
লয়ে জ্ঞান কণা পরিমাণ!!

ক্রমবিবর্ত্তন অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইয়া মানব যখন চিন্তা করিবার উপযোগী হইল, তখন বোধ হয়, প্রথমেই জন্ম মৃত্যুর চিন্তা তাহার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়াছিল; আর আজ মানব সভ্যতার চরমশিখরে আরূঢ়; সেইদিন হইতে সেই একই প্রশ্ন পল্লবায়িত ও শাখাপ্রশাখাসমন্বিত হইয়া একই প্রহেলিকা রূপে বর্ত্তমান। কি আশ্চর্য্য, একই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে বিপরীত সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হইয়াছে!

চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ এবং দৈহিক পরিণামবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধের সর্ব্বশূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, ক্রাইষ্ট বা চৈতন্যের ভক্তিবাদ ইত্যাদি একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা, কিন্তু এসব মীমাংসায় প্রভেদ কত! একজন হয়ত

বলিতেছেন,—সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ জড়সংজ্ঞক; আত্মার অস্তিত্ব নাই; স্বপ্রকাশ নিরালম্ব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা। মানব-জীবন চুম্বকের আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণের ন্যায় একটি ভৌতিক ঘটনা (Phenomenon), অতএব মৃত্যুর পর বর্ত্তমানের কিছুই থাকে না—পুনর্জ্জন্ম ত পরের কথা। এই শ্রেণীর কেহ বলেন,—"Man is a machine so made as to think chiefly by means of phosphorus."*

আবার একজন বলেন—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী"॥

অথবা "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"।

আবার কেহ বলেন, মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, আত্মা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন,

"যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়
জল হয়ে সে মিশায় জলে"; অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। "যৎ (আনন্দং) প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম"।

মৃত্যুর পরে যাহাই হউক, কেহই মৃত্যুর গতিরোধ করিতে পারেনা; ইহার গতি যেমন অপ্রতিহত, তেমনি অলক্ষিত; সহসা আসিয়া আমাদের চমক ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহার মৃদুস্পর্শে আমাদের সজাগস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, অতীতের স্মৃতি মানসপটে সুন্দররূপে চিত্রিত প্রতীয়মান হয়।

প্রকৃতিদেবীর মত ক্রূর পরিহাসরসিকা কে আছেন! তুমি হয়ত ক্ষণিক উন্নতিতে গর্ব্ববিস্ফারিতলোচনে স্ফীতবক্ষে পাদচারণা করিতেছ, কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে মৃত্যু আসিয়া তোমার গতিরোধ করিল এবং তোমাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে গর্ব্বমণ্ডিতশিরোদেশ মৃত্যুর পদচুম্বন করিতে লাগিল। তুমি হয়ত কোন বসন্তপূর্ণিমায় শীকরসম্পৃক্তকুসুমসুরভি-সমাকুল পবনে জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া তোমার প্রণয়িণীসহ প্রেমালাপে স্বপ্নাবেশবিহ্বল হইয়া আছ, সহসা আকাশে মেঘসঞ্চার হইয়া বিদ্যুৎপাত হইল এবং অধরের মিলন, ব্যবধানে পর্য্যবসিত হইয়া প্রাণবায়ুর শেষ

* Molschott নামা একজন জর্ম্মান্ দার্শনিক ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

হইল। ইহাই প্রকৃতির পরিহাস!! এ পরিহাসের মূল্য হৃদয়ের শোণিত, ইহার যন্ত্র মৃত্যু।

ইহা কি প্রকৃতির পরিহাস, না চিরহিতৈষিণী জননীর সন্তানের মঙ্গলার্থ স্নেহসতর্ক কৌশল? পুত্রের সম্মুখে মৃত্যুর নিখিলসংহারক মূর্ত্তি রাখিলে তাহার চিত্তের স্ফূর্ত্তি হইবে কি প্রকারে? সৃষ্টি রক্ষা পায় কি প্রকারে? আবেগের পরিবর্ত্তে চিরঅবসাদ জীবনকে ম্লানযূথিকার ন্যায় বিষণ্ণ করিবেনা? ইহাই বোধ হয় এ কৌশলের সমীচীন ব্যাখ্যা।

মৃত্যু যতই আমাদের অপ্রিয় হউক না, ইহারই জন্য জীবনে সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। অদূরে গাত্রদাহকারী প্রখর সূর্য্যকিরণ রহিয়াছে বলিয়াই না বৃক্ষের ছায়াতল এবং তৃণশয্যা সুখদায়ক বোধ হয়? ঝটিকাভীষণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীতে, উন্মুক্তদ্বার গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ কম্পমান সামান্য প্রদীপশিখাও কেমন স্নিগ্ধ বোধ হয়। জীবন অনন্ত হইলে ইহা কখনই সুখের হইত না; চিরকাল বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিলে কেহ কখন যশোগৌরবমণ্ডিত ও বিজয়মাল্যভূষিত হইবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করিতনা; নিশ্চেষ্ট জীবন পূতিগন্ধময়, আবিল, স্রোতোবিহীন জলাশয়ের ন্যায়। সমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়াই আমরা সমস্তই দৃঢ়মুষ্টিতে গ্রহণ করি। বিসর্জ্জন আছে বলিয়াই আবাহনের প্রভাতী সঙ্গীত শ্রুতিমধুর বোধ হয়। রাত্রি আসিবে বলিয়াই ত "লজ্জানম্র বধূসম" গোধূলির রুচির কান্তি মনোজ্ঞ বোধ হয়। যে সুখের সহিত দুঃখ বা বিপদ্ জড়িত, সে সুখ অতিশয় মধুর; যে সুখ অবসানপ্রায়, সে সুখের স্মৃতি দুরপনেয়; পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরস্থায়ী। এই কারণেই হেমকান্তি ঊষা অপেক্ষা গোধূলির ম্লান কান্তি হৃদয় এত দ্রব করে; ভৈরবীর উত্তেজনা অপেক্ষা উদাসপুরবীর বিষাদময় স্বরলহরীতে হৃদয় আকৃষ্ট। মৃত্যুর সহিত জড়িত বলিয়াই আমাদের নিকট জীবন এত প্রিয়, আমাদের এত বাঁচিবার সাধ।

মৃত্যুর আরও গুণ আছে। যেমন তিমিরমন্দিরে গমন করিবার পূর্ব্বে প্রখরকিরণোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন গোধূলির লাবণ্যচ্ছটায় দিগন্ত স্নিগ্ধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া যায়, তেমনি মৃত্যুর পূর্ব্বে মানব নিজ ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে সকলের মন দ্রব করে। মরণের সীমাপ্রান্তে দাঁড়াইলে মানবের চক্ষে যে দিব্য জ্যোতির লহরী খেলিতে থাকে, তাহা জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে কোথায়? পুণ্যময় জীবনের পবিত্রতা চিরকালই সুন্দর স্বীকার

করি, কিন্তু তাহা প্রখর ; চক্ষু ঝলসিয়া যায়। পুণ্যময় জীবন হীরকের ন্যায় কঠিন এবং উজ্জ্বল, কিন্তু মরণঝটিকাবিক্ষুব্ধ বেপমান ক্ষুদ্র হৃদয় পুষ্পপেলব এবং ইহার সুষমা স্নিগ্ধোজ্জ্বল। মানুষ যতই হীন ও অপরাধী হউক না, মরণের সময় তাহার অশ্রুসিক্ত নয়নের করুণ দৃষ্টি দেখিয়া, কোন্ পুরুষহৃদয় স্থির থাকিতে পারে ? জীবনে মুখমণ্ডল যতই চিন্তাক্লিষ্ট হউক না, মরণের দ্বারে তাহা "অমররশ্মিরেখা" সম্পাতে দিব্যোজ্জ্বল হইয়া উঠে।

তোমার আমার বা আর কাহারও মৃত্যুতে প্রকৃতির কিছুই আসিয়া যায় না। নদীর স্রোতে এ পারে তীর ভাঙ্গিয়া যায় আবার পরপারে গঠিত হয়। অতীত ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান, আবার বর্ত্তমান ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যৎ ; এইরূপে একটা প্রবাহ অবিরামগতিতে চলিতে থাকে। এ প্রবাহ যে কোন্ গোমুখী-নিঃসৃত এবং কোন্ সাগরসঙ্গমে ধাবিত, তাহা কেহই জানে না ! ! *

৺কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাটি নির্ম্মাণার্থে এককালীন দান [জুলাই ১৯০৬ সাল হইতে এপ্রেল ১৯০৭ পর্য্যন্ত]

নাম	ঠিকানা	টাকা
বাবু হীরালাল বর্ম্মন্	কলিকাতা	৫০০৲
(তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ডাক্তার এস, কে, বর্ম্মনের স্মরণার্থে)		
মিঃ থিয়োডোর স্প্রিংম্যান,	জর্ম্মাণি	১৮২৸৵০
অনাঃ রায় বিপিন কৃষ্ণ বসু বাহাদুর সি, আই, ই,	নাগপুর	১৫০৲
বাবু অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বেনারস্ সিটি	১০০৲
শ্রীমতী প্রফুল্ল বালা দেবী	" "	১০০৲
বাবু রাধিকা নাথ গোস্বামী	শ্রীরামপুর	১০০৲
" নিবারণ চন্দ্র দত্ত	চোরবাগান, কলিকাতা	১০০৲
" গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর	জোড়াসাঁকো "	১০০৲
এইচ্, এইচ্, দি মহারাজা অফ্ দ্বারভাঙ্গা,	দ্বারভাঙ্গা	১০০৲

* এই প্রবন্ধসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। উঃ সম্পাদক।

শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী	কলিকাতা	১০০৲
মিঃ ক্যামিল ব্রেঞ্জ্যাক ও মিঃ কে, ওয়েন্‌বার্জ, অষ্ট্রিয়া		৬০৲
বাবু যদুপতি চট্টোপাধ্যায়	সিলিগুড়ি	৫০৲
„ কানাই লাল সিংহ	হাটখোলা, কলিকাতা	৫০৲
(তাঁহার স্বর্গীয় পিতা বাবু চণ্ডীলাল সিংহ মহাশয়ের স্মরণার্থে)		
„ পূর্ণ চন্দ্র শেট	বাঁশতলা, কলিকাতা	৫০৲
ডাঃ নিতাই চরণ হালদার	পাথুরিয়াঘাটা, „	৫০৲
জনৈক বন্ধু	কলিকাতা	৫০৲
বাবু শশী কুমার মজুমদার	লাহোর	৪৮৲
(প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে)		
বাবু যতীন্দ্রমোহন দাস (ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিক্রয়ের দঃ)		৩০৲
„ নবগোপাল ঘোষ	রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া	২৫৲
মিঃ মেলুহুন্সাল্‌	হায়দরাবাদ (সিন্ধুদেশ)	২৫৲
রায় হরেরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর, বাঁশতলা, কলিকাতা		২৫৲
ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর সি, আই, ই, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা		২৫৲
বাবু প্রমথনাথ প্রামাণিক, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা		২৫৲
„ মেসার্স ব্যানার্জ্জী মল্লিক এণ্ড কোং, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা		২৫৲
„ মন্মথ নাথ মুখো	মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৫৲
„ জয়কিষণ দাস	আরমাণী ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২০৲
„ গুরুদাস সরকার	ঢাকা	২০৲
শ্রীমতী শিবাণী দেবী	কলিকাতা	২০৲
"লক্ষ্মীনিবাস"	বাগবাজার, কলিকাতা (প্রথম দফা)	২০৲
বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া	১৫৲
„ নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ	রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া	১৫৲
„ বিনোদবিহারী দে	ছুতোরপাড়া, কলিকাতা	১৫৲
		২১২০৸৶০

* স্থানাভাবে এবার সমুদয় প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে পারা গেল না। আগামী বারে অবশিষ্টাংশটা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত *

(পরিশিষ্ট।)

বরাহনগরের প্রথম মঠ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্রের পূর্ব্বকথা। নরেন্দ্রের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ

আজ শুক্রবার, ২৫ মার্চ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ—মাষ্টার মঠের ভাই করিতে আসিয়াছেন। দেবেন্দ্রও আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রায় দর্শন করিতে আসেন ও কখন কখন থাকিয়া যান। গত শনিবারে আসিয়া শনি, রবি ও সোম তিন দিন ছিলেন। মঠের ভাইদের বিশেষতঃ নরেন্দ্রের এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই তিনি উৎসুক হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে আসেন।

রাত্রি হইয়াছে। আজ রাত্রে মাষ্টার থাকিবেন।

সন্ধ্যার পর শশী মধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুর ঘরে আলো জ্বালিলেন ও ধুনা দিলেন। সেই ধুনা লইয়া যত ঘরের যত পট আছে, প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রণাম করিতেছেন।

এইবার আরতি হইতেছে। শশী আরতি করিতেছেন। মঠের ভাইরা, মাষ্টার ও দেবেন্দ্র সকলে হাত জোড় করিয়া আরতি দেখিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আরতির স্তব গাইতেছেন—

'জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার!
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব!
হর হর হর মহাদেব!!'

নরেন্দ্র ও মাষ্টার দুইজনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি অনেক পূর্ব্বকথা মাষ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্রের এখন বয়স ২৪ বৎসর ২ মাস হইবে।

"প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন এক দিন ভাবে বল্লেন, 'তুই এসেছিস!'

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ; সপ্তম।

"আমি ভাবলাম, কি আশ্চর্য্য! ইনি যেন আমায় অনেক দিন থেকে চেনেন।

"তার পর তিনি বল্‌লেন, 'তুই কি একটা জ্যোতি দেখ্‌তে পাস?'

"আমি বল্‌লাম, আজ্ঞা হাঁ। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি যেন একটী জ্যোতি ঘুরতে থাকে।

মাষ্টার। এখনও কি দেখো?

নরেন্দ্র। আগে খুব দেখ্‌তাম।

"যদু মল্লিকের রান্নাবাড়ীতে একদিন আমায় স্পর্শ করে কি মনে মনে বল্লেন, অমনি অজ্ঞান হয়ে গেলুম! সেই নেশায় অমন এক মাস ছিলুম।

"আমার বিবাহ হবে শুনে মা কালীর পা ধরে কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলেছিলেন, মা ও সব ঘুরিয়ে দে মা! নরেন্দ্র যেন ডুবে না।

"যখন বাবা মরে গেলেন, মা ভাইরা খেতে পাচ্ছে না,—তখন এক দিন অন্নদা গুহর সঙ্গে গিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

"তিনি অন্নদা গুহকে বল্লেন, 'নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধু বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।'

"অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বক্‌তে লাগলাম। বল্লাম, কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বল্লেন?

"তিনি তিরস্কৃত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ও বল্লেন, 'ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি!'

"তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি বলেন?

মাষ্টার। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ওঁর অহেতুক ভালবাসা।

নরেন্দ্র। আমায় এক দিন একলা একটী কথা বলেন। আর কেহ ছিল না। এ কথা আপনি আর কারুকে বলবেন না?

মাষ্টার। না!

নরেন্দ্র। তিনি বল্লেন, আমার ত সিদ্ধাই করবার যো নাই। তোর ভিতর দিয়ে করব, কি বলিস?

"আমি বল্লাম—না, তা হবে না।

"ওঁর কথা উড়িয়ে দিতাম;—ওঁর কাছে শুনেছেন। ঈশ্বরের রূপদর্শন করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ও সব মনের ভুল।

"তিনি বল্লেন, 'ওরে, আমি কুটীর উপর চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কোথায়

কে ভক্ত আছিস আয়, তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়। মা বলে-ছিলেন, 'ভক্তেরা সব আসবে', তা দেখ্, সব ত মিলছে!

"আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম

(নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর।)

"এক দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন্দ্রবাবু ও গিরীশবাবুকে আমার বিষয় বলেছিলেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখ্‌বে না'।

মাষ্টার। হাঁ, শুনেছি। আর আমাদের কাছেও অনেক বার বলেছেন। কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অবস্থা হয়েছিল; না?

নরেন্দ্র। সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটী দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে ঐ অবস্থাটী হল।

"আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, 'আমার কি হল!'

"বুড়ো গোপাল ঠাকুরের কাছে—উপরে গিয়ে বল্লেন, 'নরেন্দ্র কাঁদছে।'

"তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি বল্লেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল!'

"আমি বল্লাম, আমার কি হল!

"তিনি অন্য অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ও আপনাকে জানতে পারলে, দেহ রাখবে না। আমি ভুলিয়ে রেখেছি।

"এক দিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখ্‌তে পাস।

"আমি বল্লাম, আমি কিষ্টফিষ্ট মানি না (মাষ্টার ও নরেন্দ্রের হাস্য)।

"আর একটা দেখেছি, এক একটী জায়গা, জিনিষ বা মানুষ দেখ্‌লে, বোধ হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখেছি। যেন চেনা চেনা। Amherst Streetএ যখন শরতের বাড়ীতে গেলাম, শরৎকে একেবারে বল্লাম, এ বাড়ী যেন আমার সব জানা। বাড়ীর ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।

"আমি নিজের মতে কাজ কর্ত্তাম, তিনি (ঠাকুর) কিছু বলতেন না। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Member হয়েছিলাম, জানেন তো?

মাষ্টার। হাঁ, তা জানি।

নরেন্দ্র। তিনি জানতেন, ওখানে মেয়ে মানুষরা যায়। মেয়ে মানুষদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না; তাই তিনি নিন্দা করতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না। এক দিন শুধু বললেন, রাখালকে ও সব কথা কিছু বলিস নি,—যে তুই সমাজের Member হয়েছিস। ওর'ও তা হলে হতে ইচ্ছে যাবে।

মাষ্টার। তোমার বেশী মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই।

নরেন্দ্র। অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাষ্টার মশাই, আপনি দুঃখ কষ্ট পান নাই তাই—মানি দুঃখ কষ্ট না পেলে Resignation (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না—Absolute dependence on God.

(নরেন্দ্রের 'অহঙ্কার।')

নরেন্দ্র। আচ্ছা, * * এত নম্র ও নিরহঙ্কার; কত বিনয়! আমায় বলতে পারেন, কিসে বিনয় হয়?

মাষ্টার। তিনি বলেছেন, তোমার অহঙ্কার সম্বন্ধে,—এ 'অহং' কার?

নরেন্দ্র। এর মানে কি?

মাষ্টার। অর্থাৎ রাধিকাকে এক জন সখী বলেছিলেন, তোর অহঙ্কার হয়েছে, তাই কৃষ্ণকে অপমান করলি।

"আর এক সখী তার উত্তর দিছিল, হাঁ, অহঙ্কার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ 'অহং'-কার? অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার পতি এই অহঙ্কার;—কৃষ্ণই এই 'অহং' রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে এই,—ঈশ্বরই এই অহঙ্কার তোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন; অনেক কাজ করিয়ে নেবেন এই জন্য।

নরেন্দ্র। কিন্তু হাঁকডেকে বোলে আমার দুঃখ নাই।

মাষ্টার। (সহাস্যে)। তবে সখ করে হাঁক ডাক করো।

(উভয়ের হাস্য)।

এই বার অন্য অন্য ভক্তদের কথা পড়িল—বিজয় গোস্বামী, রামবাবু ইত্যাদি।

নরেন্দ্র। তিনি (ঠাকুর) বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, 'দ্বারে ঘা দিচ্চে'।

মাষ্টার। অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করতে পারেন নাই।

"কিন্তু শ্যামপুকুরের বাটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি; এই শরীরে!' তুমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলে।

নরেন্দ্র। দেবেন্দ্রবাবু, রামবাবু, এরা সব সংসার ত্যাগ করবে—খুব চেষ্টা করছে। রামবাবু privately বলেছে, দুই বছর পরে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার। দুই বৎসর পরে? মেয়েছেলেদের বন্দোবস্ত হলে বুঝি?

নরেন্দ্র। ও বাড়ীটা ভাড়া দেবে। আর একটা ছোট বাড়ী কিনবে। মেয়ের বিয়ে ওরা বুঝবে।

মাষ্টার। গোপালের বেশ অবস্থা; না?

নরেন্দ্র। কি অবস্থা!

মাষ্টার। এত ভাব, হরি নামে অশ্রু রোমাঞ্চ।

নরেন্দ্র। ভাব হলেই কি বড় লোক হয়ে গেল!

"কালী, শরৎ, শশী, সারদা এরা গোপালের চেয়ে কত বড় লোক! এদের ত্যাগ কত! গোপাল তাঁকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কৈ?

মাষ্টার। তিনি বলেছিলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে তো খুব ভক্তি করতেন দেখেছি।

নরেন্দ্র। কি দেখেছেন?

মাষ্টার। যখন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুরের ঘরের ভক্তদের দরবার ভেঙ্গে গেলে পর ঘরের বাহিরে এসে এক দিন দেখ্‌লাম—গোপাল হাঁটু গেড়ে বাগানের লাল শুরকির পথে হাত জোড় করে আছেন—ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খুব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরে যে বারাণ্ডাটী আছে, তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল সুরকির রাস্তা। সেখানে আর কেউ ছিল না। বোধ হল যেন গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন।

নরেন্দ্র। আমি দেখি নাই।

মাষ্টার। আর মাঝে মাঝে বলতেন, ওর পরমহংস অবস্থা। তবে এও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাঁকে মেয়েমানুষ ভক্তদের কাছে আনাগোনা করতে বারণ করেছিলেন। অনেকবার সাবধান করে দিছলেন।

নরেন্দ্র। আর তিনি আমার কাছে বলেছেন—ওর যদি পরমহংস অবস্থা

—তবে টাকা কেন! আর বলেছেন, ও এখানকার লোক নহে। যারা আমার আপনার লোক তারা এখানে সর্ব্বদা আসবে।

"তাইত—বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন। সে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকত বলে; আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না।

"আমায় বলেছিলেন, গোপাল সিদ্ধ,—'হঠাৎ সিদ্ধ'; ও এখানকার লোক নয়। যদি আপনার হত, ওকে দেখবার জন্য আমি কাঁদি নাই কেন?

"কেউ কেউ ওঁকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করছেন। কিন্তু তিনি (ঠাকুর) কতবার বলেছেন, আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মঠে কালী তপস্বীর ঘরে দুইটী ভক্ত বসিয়া আছেন। একটী ত্যাগী ও একটী গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪।২৫ হইবে। তাঁহারা দুইজনে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাকিবেন মানস করিয়া আসিয়াছেন।

আজ গুডফ্রাইডে (Good-Friday); ৮ই এপ্রেল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ; শুক্রবার। এখন বেলা ৮টা হইবে। মাষ্টার আসিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তৎপরে নরেন্দ্র রাখাল ইত্যাদি ভক্তদের সহিত দেখা করিয়া ক্রমে এই ঘরে আসিয়া বসিলেন; ও ঐ দুইটী ভক্তকে সম্ভাষণ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। গৃহী ভক্তটীর ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করেন। মঠের ভাইটি তাঁহাকে বুঝাচ্চেন, যাতে সে সংসার ত্যাগ না করে।

ত্যাগী ভক্ত। কিছু কর্ম্ম যা আছে—করে ফেলনা। একটু করলেই তার পর শেষ হয়ে যাবে।

"এক জন শুনেছিল, তার নরক হবে। সে এক জন বন্ধুকে বললে, নরক কি রকম গা? বন্ধুটী একটু খড়ি লইয়া নরক আঁকিতে লাগিলেন। নরক যেই আঁকা হয়েছে, অমনি ঐ লোকটি তাতে গড়াগড়ি দিয়ে ফেললে। আর বললে, এইবার আমার নরক হয়ে গেল।

গৃহীভক্ত। আমার ভাল লাগে না; আহা, তোমরা কেমন আছ!

ত্যাগী ভক্ত। তুই অত বকিস্ কেন? বেরিয়ে যাবি যাস। কেন, একবার সক্ করে ভোগ করে নে না।

নয়টার পর ঠাকুরঘরে শশী পূজা করিলেন।

প্রায় এগারটা বাজিল। মঠের ভাইরা ক্রমে ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। স্নানের পর শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রত্যেকে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। মাষ্টারও সেই সঙ্গে প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের ঘরে রাখাল শশী বুড়োগোপাল ও হরিশ বসিয়া আছেন। মাষ্টারও আছেন। রাখাল ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন।

রাখাল (শশী ইত্যাদির প্রতি)। আমি এক দিন তাঁর জল খাবার আগে খেয়েছিলাম। তিনি দেখে বল্‌লেন, "তোর দিকে চাইতে পার্‌চি না! তুই কেন এমন কর্ম্ম কর্‌লি?" আমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম।

বুড়ো গোপাল। আমি কাশীপুরে তাঁর খাবারের উপর জোরে নিশ্বাস ফেলেছিলুম, তখন তিনি বলিলেন, "ও খাবার থাক্"।

বারাণ্ডার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র। আমি ত কিছুই মান্‌তুম না জানেন।

মাষ্টার। কি, রূপ টুপ?

নরেন্দ্র। তিনি যা যা বল্‌তেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মান্‌তুম না। এক দিন তিনি বলেছিলেন, তবে আসিস্ কেন?

"আমি বললাম, 'আপনাকে দেখ্‌তে আসি; কথা শুন্‌তে নয়।'

মাষ্টার। তিনি কি বল্‌লেন?

নরেন্দ্র। তিনি খুব খুসী হলেন।

তাহার পর দিন শনিবার। ৯ই এপ্রেল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামও করিয়াছেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে, তাহার একটী গাছতলায় বসিয়া নির্জ্জনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর যত পূর্ব্ব কথা বলিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স ২৪ বৎসর; মাষ্টারের বয়স ৩২ বৎসর।

মাষ্টার। প্রথম দেখার দিনটী তোমার বেশ স্মরণ পড়ে?

নরেন্দ্র। সে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। তাঁহারই ঘরে। সেই দিনে এই দুইটী গান গেয়েছিলাম।

১ম গান।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে॥
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শমদম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ নিবাসী জনে;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

২য় গান।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয় কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥

মাষ্টার। গান শুনে কি বললেন?

নরেন্দ্র। তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছেলেটী কে? আহা কি গান!' আমায় আবার আসতে বললেন।

মাষ্টার। তার পর কোথায় দেখা হলো?

নরেন্দ্র। তার পর রাজমোহনের বাড়ী। তার পর আবার দক্ষিণেশ্বরে। সেবার আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব করে বলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ।'

"কিন্তু এ কথা গুলি কাহাকেও বলবেন না ।

মাষ্টার । আর কি বললেন ?

নরেন্দ্র । 'তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ । যাকে বলেছিলাম, মা আমি কি যেতে পারি ! গেলে কার সঙ্গে কথা কব ! মা, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব !' বললেন, তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, আমি এসেছি । আমি কিন্তু কিছু জানি না ; কলকাতার বাড়ীতে তোফা ঘুম মারছি ।

মাষ্টার । অর্থাৎ তুমি এক সময়ে Presentও বটে, Absentও বটে ; যেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন ।

নরেন্দ্র । কিন্তু এ কথা কারুকে বলবেন না ।

(নরেন্দ্রের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ ।)

"কাশীপুরে তিনি শক্তিসঞ্চার করে দিলেন ।"

মাষ্টার । যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনী জেলে বসতে ; না ?

নরেন্দ্র । হাঁ । কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি । কালী বললে, 'কি একটা Shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল ।'

"একথা কারুকেও বলবেন না – Promise করুন ।

মাষ্টার । তোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে ; তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে । এক দিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে ।'

নরেন্দ্র । আমি বলেছিলাম, 'আমি ও সব পারব না ।'

"তিনি বললেন 'তোর হাড় করবে ।'

"শরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন । ও এখন ব্যাকুল হয়েছে । ওর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে ।

মাষ্টার । এখন পাতা না জমে । ঠাকুর বলতেন, বোধ হয় মনে আছে যে, পুকুরের ভিতর মাছের গাড়ি হয় অর্থাৎ গর্ত্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে । যে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে মাছ এসে জমে না ।

(নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর।)

নরেন্দ্র। নারায়ণ বলতেন।

মাষ্টার। তোমায় "নারায়ণ" বলতেন তা জানি।

নরেন্দ্র। তাঁর ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন না।

"কাশীপুরে বললেন, চাবি আমার কাছে রইলো; ও আপনাকে জান্‌তে পারলে দেহ ত্যাগ করবে।

মাষ্টার। যখন তোমার এক দিন সেই অবস্থা হয়েছিল; না?

নরেন্দ্র। সেই সময় বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই, কেবল মুখটী আছে।

"বাড়ীতে আইন পড়্‌ছিলুম, একজামিন দেবো বলে। তখন হঠাৎ মনে হলো, কি করছি!

মাষ্টার। যখন ঠাকুর কাশীপুরে আছেন?

নরেন্দ্র। হাঁ! পাগলের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'তুই কি চাস?' আমি বললাম, 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তিনি বললেন, 'তুই ত বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা। সমাধি ত তুচ্ছ কথা!'

মাষ্টার। হাঁ, তিনি বলতেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা করা।

নরেন্দ্র। কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কতক্ষণে হয়? আগে ভক্তি পাকুক। আবার তারকবাবুকে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, ভাব ভক্তি কিছু শেষ নয়।

মাষ্টার। তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল।

নরেন্দ্র। আমার কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, 'আপনি রূপ টুপ যা দেখেন ও সব মনের ভুল, তখন মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, নরেন্দ্র এই কথা বলছে, তবে এ সব কি ভুল?' তার পর আমাকে বললেন, 'মা বল্লে ও সব সত্য।'

মাষ্টার। তার পর?

নরেন্দ্র। বলতেন বোধ হয় মনে আছে, 'তোর গান শুনলে (বুকে

হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।

"কিন্তু, মাষ্টার মশায়, এত তিনি বললেন, কই আমার কি হলো!

মাষ্টার। এখন শিব সেজেছ, পয়সা নোবার যো নাই। ঠাকুরের গল্প তো মনে আছে।

নরেন্দ্র। কি, বলুন না একবার।

মাষ্টার। বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ী গিছলো, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল; সে নেয় নি। বাড়ী থেকে হাত পা ধুয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ীর লোকেরা বললে, 'তখন যে নিলে না?' সে বললে, 'তখন শিব সেজেছিলাম, টাকা ছোঁবার যো নাই।'

এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

মাষ্টার। তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে।

নরেন্দ্র। সাধন টাধন যা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। কিন্তু strange (আশ্চর্য্যের বিষয়) এই যে, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। রামবাবু বলেন, 'তাঁকে দর্শন করেছি, আর সাধন কি?'

মাষ্টার। যার বিশ্বাস সে না হয় তাই করুক।

নরেন্দ্র। আমাদের যে তিনি সাধন কর্ত্তে বলেছেন!

নরেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার কথা আবার বলছেন।

নরেন্দ্র। আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন। যখন খেতে পাচ্চি না,—বাবার কাল হয়েচে—বাড়ীতে খুব কষ্ট—তখন আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন।

মাষ্টার। তা জানি; তোমার কাছে শুনেছিলাম।

নরেন্দ্র। টাকা হলোনা। তিনি বললেন, মা বলেছেন মোটা ভাত মোটা কাপড় হবে।

"এতো আমাকে ভালবাসা কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন।

"অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না; খানিকটা

হাত উঠে আর উঠলো না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্য্যন্ত উঠে আর উঠলো না; বললেন, তোর এখনও হয় নাই।

"এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুরামদের বাড়ীতে কিছু নাই বোধ হলো। যেন ঈশ্বর টীশ্বর কিছুই নাই!

মাষ্টার। ঠাকুর তো বলতেন, তাঁরও এরূপ অবস্থা এক এক বার হতো।

"ধন্য তোমরা! রাতদিন তাঁকে চিন্তা করছো!

নরেন্দ্র। কই? তাঁকে দেখতে পাচ্চি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই?

রাত্রি হইয়াছে। নিরঞ্জন ৺পুরীধাম হইতে কিয়ৎক্ষণ ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মঠের ভাইরা ও মাষ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি পুরী যাত্রার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের এখন বয়স ২৫।২৬ হইবে।

সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন ফিরিয়াছেন বলিয়া অনেকে বড় ঘরে ("দানাদের" ঘরে) আসিয়া বসিলেন ও সদালাপ করিতে লাগিলেন।

রাত ৯টার পর শশী ৺ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

মঠের ভাইরা নিরঞ্জনকে লইয়া রাত্রের আহার করিতে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে রুটী, একটা তরকারী ও একটু গুড়; আর ঠাকুরের যৎকিঞ্চিৎ সুজীর পায়সাদি প্রসাদ।

কর্ম্মবীর ৺নফরচন্দ্র।

[বিগত জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বমঞ্জরী হইতে সঙ্কলিত।]

সংবাদপত্রের পাঠকগণ অনেকেই অবগত আছেন, বিগত ২৯ শে বৈশাখ, ১২ইমে রবিবার ভবানীপুরে ড্রেনের ম্যানহোল হইতে দুইজন মুসলমান কুলির প্রাণরক্ষা করিতে যাইয়া নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামক জনৈক যুবক ২৬বর্ষ মাত্র বয়সে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তিনিই বাড়ীর মধ্যে একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন—বাটীতে বৃদ্ধপিতা এখনও বর্ত্তমান, তদ্ব্যতীত দুইটী কনিষ্ঠ সহোদর,

স্ত্রী এবং একটী তিন বছরের মেয়ে আছে। এই নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য এবং নফরচন্দ্রের কোনরূপ উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইতেছে এবং এতদুপলক্ষে চাঁদাসংগ্রহের জন্য অনেক সভাসমিতিও হইতেছে। এই কর্ত্তব্যকার্য্যে উদ্বোধন পাঠকগণকে আহ্বান করা আমাদের ইতিপূর্ব্বেই কর্ত্তব্য ছিল—নানা কারণে তাহা পারি নাই। এক্ষণে জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্বমঞ্জরীতে তাঁহার সম্বন্ধে একটী অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহা সমগ্রটীই উদ্ধৃত করিব, মনে করিয়াছিলাম—স্থানাভাবে সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। আশা করি, পাঠকবর্গ নফরচন্দ্রের বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই তাঁহার দরিদ্র পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবেন এবং যাঁহার যাহা সাধ্য, সম্পাদক, ইটালী রামকৃষ্ণ মিশন, ২০নং পদ্মপুকুর লেন, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইয়া—আপনাদিগকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিবেন।

ভবানীপুরের বকুলবাগানে নফরচন্দ্রের বাস ছিল। পিতা শ্রীউমেশচন্দ্র কুণ্ডু; জননী পরলোকগতা। দৃঢ়চিত্ততা অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভিতর বিকাশ পাইয়াছিল ও দিন দিন উহার বৃদ্ধিই হইতেছিল। কালীঘাট এণ্ট্রান্স-স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া নফরচন্দ্র সাংসারিক অবস্থাবিপর্য্যয়ে চাকরী স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

তিনি বাথগেট কোম্পানির আফিসে ২০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন এবং উক্ত কোম্পানির প্যাকিং বক্স ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া আরও কিছু উপার্জ্জন করিতেন। তাহাতেই তাঁহার সংসারযাত্রা কোনরূপে অতিবাহিত হইত। বলা বাহুল্য, ২০৲ টাকা মাহিনার চাকরী করিয়া কেহ কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারে না। এক্ষণে নফরচন্দ্রের পরিবারবর্গের কি অবস্থা, পাঠকবর্গ একবার ভাবিয়া দেখুন।

ইটালি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহে ভবানীপুরের কয়েকটী যুবক অনাথ অনাথার সাহায্যকল্পে ১৯০৫খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন ভবানীপুরে একটী সাহায্যভাণ্ডার খুলেন। তাঁহারা প্রতি রবিবারে গৃহস্থের বাটী হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া প্রতিমাসের শেষে একদিন অনাথ অনাথাগণকে উক্ত চাউল বিভাগ করিয়া দিতেন।

নফরচন্দ্র এই সময়ে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যহ গীতাপাঠ করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মযোগের অধ্যায়টীই তাঁহার ভাল লাগিত।

তাঁহার জনৈক বন্ধু রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ভবানীপুরে দরিদ্রগণের সাহায্যকল্পে উক্ত সদনুষ্ঠানের বিষয় অবগত হইয়া তিনি সোৎসাহে উহাতে (আগষ্ট মাস হইতে) যোগদান করেন। সেই অবধি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রতি রবিবারে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী দরিদ্রগণের জন্য ভিক্ষা করিয়াছেন।

এই কার্য্যে যোগদানের অব্যবহিত পরে ইটালী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের সহিত নফরচন্দ্রের সাক্ষাৎ এবং কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হয়। প্রসঙ্গতঃ সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন, হিসাবী বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না। মনে কর একটী বালক কোন পুকুরে পড়িয়া গিয়া ডুবিতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় তুমি যদি ঐ পুকুরে কত জল, আমি তুলিতে পারিব কি না, যদি তুলিতে গিয়া নিজে ডুবিয়া যাই, এই সকল হিসাব নিকাশ লইয়া সময় নষ্ট কর, তবে ততক্ষণ সেই বালক হাবুডুবু খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যদি অবিচারিত চিত্তে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পার, তবে তোমার দ্বারা সেই বালকের জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে।" কথাগুলি নফরচন্দ্রের হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

নফরচন্দ্র প্রাণপণে সকলের সেবা করিতেন। একদা এক চাষীর কন্যা বিবিধদ্রব্যের একটী মোট মাথায় করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পায়ে আঘাত লাগিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। নফরচন্দ্র সেই স্থল দিয়া যাইতেছিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, স্বীয় পরিধানবস্ত্রের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া তাহার পায়ে জড়াইয়া দিলেন এবং পরিধান বস্ত্র ভিজাইয়া আনিয়া সেই ক্ষতস্থানে জলধারা সেচন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সে একটু সুস্থ হইলে নিজে তাহার মোট মস্তকে বহন করিয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া তাহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

আর একদিন ভবানীপুরের সকল ভক্তগণ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে আয়োজন করিয়া বেলা ৯টায় বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় নফরচন্দ্র শুনিলেন যে, জনৈক মুটের কলেরা হইয়াছে, তাহাকে দেখিবার বা শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। নফরচন্দ্রের আর সেইদিন যোগোদ্যানে যাওয়া হইল না। অপর সকলকে বিদায় দিয়া

তিনি তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তাহাকে ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলেন এবং তাহার দেশের আপন লোক কেহ আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, প্রায় ক্রোশাধিক দূরে তাহার একজন আত্মীয় মুটে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া তাহাদের বাসায় যাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছিল।

একদিন আফিস হইতে যাইতে যাইতে শুনিলেন, তাঁহার একজন আলাপী লোকের জ্বর হইয়াছে। তিনি অমনি তাহার বাটীতে গেলেন এবং অপরাহ্ণ ৬টা হইতে প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। জ্বরে উক্ত ব্যক্তির অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু নফর এরূপ ভাবে সেবা করিয়াছিলেন যে, তাহার যন্ত্রণার লাঘব হইয়া অবশেষে সুনিদ্রার সঞ্চার হইয়াছিল।

আমরা এই তিনটী ঘটনা দিলাম। তদ্ব্যতীত এই মহাত্মার জীবনে কত কত এইরূপ ঘটনা ঘটয়াছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? ক্রমশঃ নফরচন্দ্রের জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময় আসিল। ঐ দিবস প্রাতে বেলা ৯টার সময় নফরচন্দ্র কোন কার্য্যোপলক্ষে ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। কিছুদুর গিয়া দেখেন, অনেকগুলি লোক একস্থানে জড় হইয়া বলাবলি করিতেছে—হায় হায়! বোধ হয় দুটাই মোলো, দুটাই মোলো। নফরচন্দ্র অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন, ড্রেন পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখের ম্যানহোল গর্ত্তে একজন মুসলমান মজুর নামিবার জন্য উহার ঢাকা খুলিয়া যেমন তন্মধ্যে উঁকি মারিয়াছে, অমনি সে উহার মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর একটি মুসলমান মজুর তাহাকে তুলিবার জন্য উহার মধ্যে নামিয়াছে, কিন্তু সেও আর উঠে নাই।

শুনিবামাত্র নফরচন্দ্র জুতা খুলিলেন—লোকে অনেক বারণ করিল। নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও নফরচন্দ্র, যদি উহাদিগকে বাঁচাইতে পারি, এই আশায় লোকের বাধা না মানিয়া 'জয় গুরু' বলিয়া উহার মধ্যে নামিয়া গেলেন—কিন্তু আর উঠিলেন না!

কর্ম্মবীর নফর! তোমার নশ্বর দেহ পূতিগন্ধময় ড্রেনে পড়িয়া নষ্ট হইল বটে, কিন্তু তোমার আত্মা আজ ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় দিব্যলোকে

উঠিয়াছে—যথায় কেহ নিজের জন্য ভাবে না, যথায় সকলেই পরের জন্য উন্মত্ত। ধন্য তুমি, তোমার কথা লিখিয়া আজ লেখনী পবিত্র হইল, পাঠকগণও তোমার অপূর্ব্ব জীবনী পাঠ করিয়া ধন্য হইলেন।

'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥'

কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাটী নির্ম্মাণার্থ এককালীন দান।

(জুলাই ১৯০৬ হইতে এপ্রেল ১৯০৭ পর্য্যন্ত)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্রথম পক্ষ আষাঢ়ের উদ্বোধনে স্বীকৃত — ২২২০৮৶৹

বাবু দ্বারকা নাথ দাস	ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা	১০৲
,, সুরেন্দ্র নাথ পাল	হুগলি	১০৲
মিসেস্ সি, ই, সেভিয়র	মায়াবতী	১০৲
বাবু প্রিয় নাথ সেন	বাগবাজার, কলিকাতা	১০৲
ডাঃ জে, এন্, কাঞ্জিলাল এম, বি	সিমুলিয়া, কলিকাতা	১০৲
বাবু শচীন্দ্র নাথ বসু বি, এ	মির্জাপুর ষ্ট্রীট ,,	১০৲
দি অন্ মিঃ পি, এস, শিবস্বামী আয়ার	মান্দ্রাজ	১০৲
বাবু শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ	হাওড়া	১০৲
এ, জি,	,,	১০৲
বাবু রামকৃষ্ণ বসু বি, এ,	কোঠার, উড়িষ্যা	১০৲
রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক ভৃত্য	কলিকাতা	১০৲
বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল	আহিরিটোলা ,,	১০৲
,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ,,	,, ,,	১০৲
,, গোঁসাই দাস দত্ত	হ্যারিসন্ রোড ,,	১০৲
,, শরৎ চন্দ্র সিংহ	বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ,,	১০৲
,, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত	কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ,,	১০৲
,, গোষ্ঠ বিহারী বসু	মির্জাপুর ,, ,,	১০৲
,, বিপিন বিহারী দে	ছুতোরপাড়া ,,	১০৲
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান মোট		৮৯৲

সর্ব্বশুদ্ধ মোট ২৫০৪৮৶৹

চারু চন্দ্র দাস।
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

ঠাকুর বাগবাজারের একটী শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ী আসিয়াছেন। বাড়ীটী পুরাতন, ইষ্টকনির্ম্মিত। বাড়ী প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে গোয়াল-ঘর। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাতার দিয়া কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন। সকলেই উৎসুক—কখন ঠাকুরকে দেখিবেন।

ব্রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী; দুই জনেই বিধবা। বাটীতে এঁদের ভাইয়েরাও সপরিবারে থাকেন। ব্রাহ্মণীর একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করাতে তিনি যার পর নাই শোকাতুরা হইয়া আছেন। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছিলেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে ছিলেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন,—কখন তিনি আসেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ বোসের বাটী হইতে আসিয়া তাঁহার বাটীতে আসিবেন। বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন, তবে বুঝি ঠাকুর আসিবেন না।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়া ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। কাছে মাদুরের উপর মাষ্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, যোগীন; কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন ইত্যাদি অনেক ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন।

ব্রাহ্মণীর বিধবা ভগ্নী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—'দিদি এই গেলেন—নন্দবোসের বাড়ী—খবর নিতে, কেন এত দেরি হচ্ছে;—এত ক্ষণে ফিরবেন।'

নীচে একটী শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন,—'ঐ দিদি আসিতেছেন'।

এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩য় ভাগ যন্ত্রস্থ। Gospel of Sri Ramakrishna in English, to be shortly out.

ঠাকুর সাহাস্য বদন, ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন।

মাষ্টার (দেবেন্দ্রের প্রতি)। কি চমৎকার দৃশ্য! ছেলে বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে,-- কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সকলে কত উৎসুক—এঁকে দেখ্‌বার জন্য আর এঁর কথা শোনবার জন্য!

দেবেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মাষ্টার মশাই বল্‌ছেন যে, এ জায়গাটী নন্দ বোসের চেয়ে ভাল জায়গা।—এদের কি ভক্তি।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।

এইবার ব্রাহ্মণীর ভগ্নী বলিতেছেন, 'ঐ দিদি আসছেন'!—

ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

ব্রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেন,—'ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো!—তোমরা সব বলগো আমি কেমন করে বাঁচি!—ওগো আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সেপাই শান্ত্রী সঙ্গে করে আর রাস্তায় তাহারা পাহারা দিচ্ছিল, তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো!—ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই।—মনে করেছিলাম, তিনি (ঠাকুর) যেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্লুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব;—আর ওঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ কোরবো না,—যেখানে আসবেন, সেখানে একবার যাব,—অন্তর থেকে দেখব,—দেখে চলে আসব।

'যাই,—সকলকে বলি আয়রে আমার সুখ দেখে যা!—যাই,—যোগীনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা!

ব্রাহ্মণী আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন,—ওগো খেলাতে (lottery) একটা টাকা দিয়ে মুটে একলাখ টাকা পেয়েছিল;—সে যাই শুনলে, একলাখ টাকা পেয়িছি, অম্‌নি আহ্লাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে গিছল!—ওগো আমার যে তাই হলো গো!—তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব।

মণি ব্রাহ্মণীর আর্ত্তি ও ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে গেলেন।

ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, 'সে কি গো'!—এই বলিয়া তিনি মণিকে প্রতি-প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী ভক্তেরা আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন আর বলিতে-

ছেন,—'তোমরা সব এসেছ;—ছোট নরেনকে এনেছি;—বলি, তা না হলে হাসবে কে!'

ব্রাহ্মণী এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় উঁহার ভগ্নী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দিদি এসো না! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকিলে কি হয়? নীচে এসো! আমরা কি একলা পারি!

ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন, তাঁদের ছেড়ে যেতে আর পারেন না।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলেন। ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া সকলে মিষ্টমুখ করিলেন।

রাত প্রায় ৮টা হইল, ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। নীচের তলা ঘরের কোলে বারাণ্ডা সেই বারাণ্ডা, দিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া উঠানে আসিতে হয়, তাহার পর গোয়াল ঘর ডানদিকে রাখিয়া সদর দরজায় আসিতে হয়।

ঠাকুর যখন বারাণ্ডা দিয়া ভক্তসঙ্গে সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন, 'ও বৌ শীঘ পায়ের ধূলা নিবি আয়।'

বৌ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণীর একটী ভাই আসিয়াও প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আর একটী ভাই;—মুখ্যু।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন "না না সব ভাল মানুষ"।

একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ ধরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতে এক জায়গায় তেমন আলো হইল না।

ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর! মনে কোরো না যে, পিদ্দিম ধরা ফুরিয়ে গেল (সকলের হাস্য)।"

এইবার গোয়াল ঘর। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আমার গোয়াল ঘর।

গোয়াল ঘরের সাম্নে ঠাকুর একবার দাঁড়াইলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ। মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও পায়ের ধূলা লইতেছেন।

এইবার ঠাকুর গনুর মার বাড়ী যাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গন্থুর মার বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

গন্থুর মার বাড়ীর বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঘরটী একতলায়; ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর ঐক্যতান বাদ্যের (Concert) আকড়া আছে। ছোকরারা বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে বাজাইতেছিল।

রাত সাড়ে আটটা হইল। আজ আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি। চাঁদের আলোতে আকাশ গৃহ রাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা আসিয়া ঐ ঘরে আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি একবার বাড়ীর ভিতর যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। পাড়ার কতকগুলি ছোকরা বৈঠকখানার জানালার উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

ছোট নরেন জানালার উপর ছেলেরা উঠিয়াছে দেখিয়া বলিতেছেন,—ওরে তোরা ওখানে কেন? যা, যা, বাড়ী যা। শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বলিতেছেন, না, থাক্‌না থাক্‌না!

ঠাকুর আবার মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "হরি ওঁ! হরি ওঁ।"

সতরঞ্চের উপর একখান আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়াছেন। ঐক্যতানবাদ্যের ছোকরাদের গান গাহিতে বলা হইল। তাহাদের বসিবার সুবিধা হইতেছে না; ঠাকুর তাঁহার নিকটে সতরঞ্চির উপর বসিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "এর উপরেই বস না। এই আমি নিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি আসন গুটাইয়া লইলেন। ছোকরারা গান গাহিতেছে।

গান।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।

ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা
রাধিকা হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধন ধারণ, বনকুসুমভূষণ
দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাসরসবিহারী।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।

গান।

এস মা জীবন উমা ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, আহা কি গান!—কেমন বেহালা!—কেমন বাজনা!

একটী ছোকরা ফ্লুট বাজাইতেছিলেন; তাঁহার দিকে ও অপর আর একটী ছোকরার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ইনি ওঁর যেন জোড়।"

এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা হইতে লাগিল। বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন,—"বা! কি চমৎকার!"

একটী ছোকরাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "এঁর সব (সব রকম বাজনা) জানা আছে।"

ঠাকুর মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "এঁরা সব বেশ লোক।"

ছোকরাদের গান বাজনার পর তাহারা ভক্তদের বলিতেছে—"আপনারা কিছু গান।" ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দোরের কাছ থেকে বলিলেন,—গান এরা কেউ জানে না।— এক মহিন বাবু বুঝি জানেন, তা ওঁর সাম্নে উনি গাইবেন না।

একজন ছোকরা। কেন? বাবার সুমুখে আমি গাইতে পারি।

ছোটনরেন (উচ্চহাস্য করিয়া)। অত দূর উনি এগোন নি। (সকলের হাস্য)।

কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন,—"আপনি বাড়ীর ভিতরে আসুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন গো!

ব্রাহ্মণী। সেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে; যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এইখানেই এনে দাও না।

ব্রাহ্মণী। গনুর মা বলেছেন, ঘরটায় একবার পায়ের ধূলা দিন;—তা হলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে,—ঘরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণী ও বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ভক্তেরা চাঁদের আলোতে বেড়াইতে লাগিলেন। মাষ্টার ও বিনোদ বাটীর দক্ষিণদিকে সদর রাস্তার উপর গল্প করিতে করিতে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[গুহ্য কথা।]

বলরামের বাড়ীর বৈটকখানার পশ্চিমপার্শ্বের ঘরে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন; নিদ্রা যাইবেন।

গনুর মার বাড়ী হইতে ঠাকুরের ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। রাত পৌনে এগারটা হইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন, "যোগীন, একটু পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।" কাছে মণি বসিয়া আছেন।

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিলেন, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, একটু সুজি খাবো।

ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর ভাইটি বেশ বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে আবার দেখিয়া বলিতেছেন, এবার নরেন্দ্র এলে কি আর কোন গাইয়ে লোক এলে ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই হবে।

ঠাকুর একটু সুজি খাইলেন। ক্রমে যোগীন ইত্যাদি ভক্তেরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন, ঠাকুর তাঁর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ!

মণি। কি আশ্চর্য্য, যীশু খ্রীষ্টের সময় ঠিক্ এই রকম হয়েছিল। তারাও দুটি মেয়েমানুষ ভক্ত, দুই ভগ্নী। *

* Martha and Mary.

শ্রীরামকৃষ্ণ (উৎসুক হইয়া)। তাদের গল্প কি বলত।

মণি। যীশু খ্রীষ্ট তাঁদের বাড়ীতে ঠিক ভক্ত সঙ্গে এই রকম করে গিয়েছিলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। যেমন গৌরের গানে আছে,—

"ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো।
গৌর রূপ সাগরে সাঁতার ভূলে,
তলিয়ে গেল আমার মন॥"

"আর একটী বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ করছিল। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ করলে, 'প্রভু দেখুন দেখি দিদির কি অন্যায়! উনি এখানে একলা চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব উদ্যোগ করছি।'

"তখন যীশু বল্লেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা—প্রেম) তা ওঁর হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তোমার এ সব দেখে কি বোধ হয়?

মণি। আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু।—যীশু খ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি এক ব্যক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **এক এক। এক বই কি!** তিনি (ঈশ্বর),—দেখ্‌ছনা—যেন এর উপর এমন করে রয়েছেন!

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন,—যেন বল্‌ছেন, ঈশ্বর তাঁর শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে রয়েছেন।

মণি। সে দিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটী বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বল দেখি।

মণি। যেন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে ধূধূ কোর্‌ছে, সম্মুখে পাঁচীল রয়েছে বলে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না;—সেই পাঁচিলে কেবল একটী গোল ফাঁক আছে!—সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বল দেখি সে ফাঁকটী কি?

মণি। সে ফাঁকটি আপনি।—আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়;—সেই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মণির গা চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌লেন। আর বলিলেন, 'তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ।— বেশ হয়েছে।

মণি। ঐটে শক্ত কিনা;—পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে ঐটুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন, ঐটী বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তারে কেউ চিনলি নারে।
ও সে পাগলের বেশে
(দীন হীন কাঙ্গালের বেশে)
ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।

মণি। আর আপনি বলেছিলেন, যীশুর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি, কি?

মণি। যদু মল্লিকের বাগানে যীশুর ছবি দেখে আপনার ভাব সমাধি হয়েছিল। আপনি দেখলেন যে, যীশুর মূর্ত্তি ছবি থেকে এসে আপনার ভিতর মিশিয়ে গেল।

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। তারপর আবার মণিকে বলিতেছেন,—

"এই যে গলায় এইটে হয়েছে, ওর হয়ত মানে আছে—সব লোকের কাছে পাছে হালকামী করি।—না হলে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া তো হয়ে যেত।

ঠাকুর দ্বিজর কথা কহিতেছেন। তিনি বলিলেন, দ্বিজ এল না?

মণি। বলেছিলাম আসতে। আজ আসবার কথা ছিল; কিন্তু কেন এল না, বলতে পারিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার খুব অনুরাগ। আচ্ছা, ও এখানকার একটা কেউ হবে; (অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজন হবে) না?

মণি। আজ্ঞে হাঁ, তাই হবে, তা না হলে এত অনুরাগ!

মণি ঠাকুরকে মশারীর ভিতর গিয়া বাতাস করিতেছেন।

ঠাকুর একটু পাশ ফেরার পর আবার কথা কহিতেছেন। মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ঐ ঘর। আমারও আগে রূপ দর্শন হোত না, এমন অবস্থা গিয়েছে। এখনও দেখছনা; আবার রূপ কম পড়ছে।

মণি। লীলার মধ্যে নরলীলা বেশ ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হলেই হল ;—আর আমাকে দেখছ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে,আমার ভিতর ঈশ্বর নররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন ?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

আলমোড়া,
১লা জুন, ১৮৯৭।

প্রিয়——,

তুমি বেদসম্বন্ধে যে আপত্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছ, সেগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যাইত, যদি 'বেদ' শব্দে কেবল সংহিতা বুঝাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ব্ববাদিসম্মত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্—এই তিনটীর সমষ্টিই বেদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া এখন একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল উপনিষদ্‌কেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

কেবল সংহিতা অংশটীই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ভিতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই।

স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, সংহিতার নূতন ধরণের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি একটী পূর্ব্বাপরসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করিবেন ; কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালীতে গোল কিছু মিটিল

না; এইটুকু হইল যে, তিনি সংহিতার ভিতর যে অসামঞ্জস্য নিবারণের চেষ্টা করিলেন, সেই অসামঞ্জস্য, সেই গোলযোগ 'ব্রাহ্মণে'র উপর গিয়া পড়িল। আর তাঁহার প্রক্ষিপ্তবাদ ও অন্যান্য নানা ব্যাখ্যাপ্রণালীসত্ত্বেও এখনও এমন অনেক স্থল আছে, যাহার ভিতরের গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি রহিয়াছে।

এক্ষণে যদি ইহা সম্ভব হয় যে, সংহিতার উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটী ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইতে পারে, তবে উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে আরও অধিক পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম্ম স্থাপন করা যাইতে পারে, ইহা সহস্র গুণে অধিক নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্ব্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাইতে হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্য্যই তোমার দিকে হইবেন আর নূতন নূতন ভাব আনিবারও যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে।

গীতা নিঃসন্দেহই এত দিনে হিন্দুধর্ম্মের বাইবেলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ সম্মানের উপযুক্ত বটে. কিন্তু কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে এমন অনেক অনিশ্চিত বিষয় জড়িত হইয়া তাঁহার মূল চরিত্রকে এরূপ কুজ্‌ঝটিকাবৃত করিয়াছে যে, তাঁহার জীবন হইতে জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্ত্তমান কালে অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে নূতন নূতন চিন্তাপ্রণালী ও নূতন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় মৎপ্রদর্শিত পথে চিন্তার সাহায্য করিবে। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমারই বিবেকানন্দ।

জীবন্মুক্ত গীতা।

হে বিরাট্, প্রণমি তোমায়—
তুমি জড় তুমি জীব, তুমি দেব শিবাশিব
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি লয়

তুমি সাধু, তুমি হে তস্কর!
তুমি দেব, সাধ্বী সতী, তুমি বেশ্যা ঘৃণ্য অতি,
তুমি নারী, তুমি দেব নর।

আত্মীয়তা হল তোমা সনে—
ঘুচে গেল ভেদাভেদ, বৃথা দ্বন্দ্ব খেদাখেদ,
আনন্দ আনন্দ শুধু মনে।

নাহি মোর পিতা মাতা জায়া
নাহি দেশ জন্মভূমি, নাহি দেহ—সবি তুমি
কেটে গেল ঘোর মোহমায়া।

যেদিকে ফিরাই এবে আঁখি
কি ভূপৃষ্ঠ কিবা শূন্য, সবি যে আত্মীয়পূর্ণ,
কোন দিকে নাহি দেখি বাকি।

এ ত কভু নহেক কল্পনা—
এ ত নহে ভুলভ্রান্তি— এ ত শান্তি মহাশান্তি
দূরে গেছে সকল বাসনা।

প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে হৃদি—
উদার—অম্বর প্রায়, বেড়ে যায় বেড়ে যায়,
চায় সারা বিশ্বে বুকে পুরি নিরবধি।

হল আজি জনম সফল—
পেয়েছি যা পাইবার, দেখেছি যা দেখিবার—
আর মন—কভু হতে দেব না চঞ্চল।

সম্পদ্ বিপদ্ দুই ভাই
যার ইচ্ছা আয় ভাই, হেসে খেলে চলে যাই,
যারে পাই তারে আমি চাই।

যথা ইচ্ছা উর মহেশ্বরী;
ছিন্নমস্তা কালী তারা, ধূমাবতী বৃদ্ধাকারা,
ভৈরবী কমলাত্মিকা রাজরাজেশ্বরী।

সবরূপে দিই আমি পূজা—
জানি আমি তুমি মাতা, জানি আমি তুমি পিতা
দশভুজা তুমি গো দ্বিভুজা।

আনন্দে আনন্দে মাত প্রাণ
নরকেও মহানন্দ, স্বরগেও মহানন্দ
যথা ইচ্ছা কর অধিষ্ঠান।

"শু"—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শিবাচার্য্য ঠাকুর। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২০১ নং, কর্ণ-ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'বহুদিন পূর্ব্বে কোন বিশিষ্ট তান্ত্রিকের মুখে শিবাচার্য্য ঠাকুরের কাহিনী ও কৌলধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা অবগত হইয়াছিলাম, তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছি, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন। যদি যথার্থই শিবাচার্য্য ঠাকুর নামে কোন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি জনসাধারণে প্রচারিত হইল, আর যদি না হইয়া থাকে, একটী কাব্যোপন্যাস হইল।'

এই নূতন কাব্যখানি প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—সাত সর্গে বিভক্ত। আমরা ইহার অনেক স্থান পাঠ করিয়াছি—পাঠ করিতে করিতে একাধারে মধুর প্রাঞ্জল কবিতা, উপন্যাস, ধর্ম্ম ও দর্শন পাঠের আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। শিবাচার্য্য ঠাকুরের শবসাধনা, দেবীদর্শন, দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া

মহাভীতি, তাঁহাকে মোহিনীরূপে দেখা দিবার জন্য প্রার্থনা, মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মোহ এবং সেই মোহবশে যোগভ্রষ্ট হইয়া কিরাতকন্যার সহিত পরিণয়, বনিতার মৃত্যু, শোকে উন্মত্তপ্রায় হওন, পরিশেষে উত্তরসাধক বিরূপাক্ষের উপদেশে মোহভঙ্গ, পুনরায় ধ্যানযোগে দেবীর বিরাট মূর্ত্তি দর্শন এবং জীবন্মুক্ত হইয়া লোকহিতব্রতে দীক্ষিত হওন প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত বিষয়গুলি অতীব প্রীতিপ্রদ ও কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা সর্ব্বসাধারণকে একবার এই কাব্যখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা পাঠ করিলে সকলেই বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিবেন।

শিবাচার্য্য ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। তিনি গৃহিগণকে আলস্য ত্যাগ করিয়া নিজ অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে উপদেশ করিয়াছেন—অর্থোপার্জ্জন কর, মদ্য ও বেশ্যাসঙ্গ পরিহার করিয়া স্বদারে নিরত থাক, ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করিও না, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের সেবাশুশ্রূষা কর, অনাসক্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ হও, অসাম্প্রদায়িক ও উদার হও,—বেশ কথা। কিন্তু জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহার অতিথি হইয়া তৎপ্রচারিত 'যোগ ও ভোগ একত্রে অনুষ্ঠেয়'—এই তত্ত্ব বুঝিতে না পারায় আচার্য্যের মহাক্রুদ্ধ হওয়াটা কিরূপ, আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সন্দেহ হয়—এস্থলে গ্রন্থকারের নিজ মনের ছায়া বিশিষ্টরূপে পড়িয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণেই বলিতেন,—' বাঙ্গালা দেশের লোকে ত্যাগের আদর্শ একরূপ বুঝে না বলিলেই হয়। ভোগের দিকে তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।'

যাহা হউক, গ্রন্থখানি একটু বেশ নূতন ধরণের হইয়াছে—পড়িতে ক্লেশ বোধ হয় না—কাব্য হিসাবে স্থানে স্থানে অতি সুন্দর হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

উদ্বোধনের পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন, নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতি নিউইয়র্কে একটী নিজস্ব সমিতিগৃহ ও নিউইয়র্ক হইতে ১০৭ মাইল দূরে

ওয়েষ্টকর্ণওয়ালে (কনেক্‌টিকট) নির্জ্জন সাধনের জন্য একটী আশ্রম ক্রয় করিয়াছেন। সমিতির নূতন ঠিকানা—১৩৫ ওয়েষ্ট ৮০ ষ্ট্রীট। আমেরিকায় বেদান্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল।

কলিকাতা বিবেকানন্দসমিতির সভ্যগণ উৎসাহের সহিত অথচ নিস্তব্ধ-ভাবে কার্য্য করিতেছেন। ২৪নং ঝামাপুকুর লেন, সমিতিগৃহে সমিতির সভ্যগণ প্রতি শনিবার মিলিত হইয়া সদালোচনা করেন, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক ব্যক্তিরও সমাগম হইয়া থাকে। ২৭শে এপ্রিল শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এ 'দীনতা' সম্বন্ধে এবং ৪ঠা মে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন 'স্বামীজি ও তাঁহার দেশের প্রতি ভালবাসা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার মধ্যে প্রথমটী ১লা আষাঢ়ের উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে। ২য়টী আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত যে দিন প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা না হয়, সে দিন কঠোপনিষৎ ও স্বামীজির বক্তৃতাদি পাঠ হয়। কিছু দিন হইতে সভ্যগণ একটি সাধনগৃহ করিয়া ধ্যান ধারণাদি অভ্যাস ও স্তবপাঠাদি করিয়া নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। সভ্যগণ অনেকেই সমিতির এই নব অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন।

মাননীয় বঙ্গের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর—বহুবাজার রামকৃষ্ণ সমিতির অনাথ ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিগৃহে 'বংশানু-বর্ত্তিতা' (Heredity) সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ৭ই এপ্রিল 'মানবীয় ও ঈশ্বরীয় প্রেম' ও ১৪ই 'একাগ্রতাশক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সমিতির নূতন গৃহে ৫ই মে 'আত্মতত্ত্ব-রহস্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

স্বামী বোধানন্দ পিটসবর্গ বেদান্তসমিতির কার্য্য পরিচালনা করিতে-ছিলেন। তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া সম্প্রতি ১লা জুন হইতে কিছু দিনের জন্য কার্য্য বন্ধ রাখিয়াছেন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ লস্ এঞ্জেলিস বেদান্ত সমিতিতে যোগ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যান দিতেছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে তিনি শাণ্ডিল্যসূত্র (ভক্তিযোগ) ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ার রাজধানী স্যানফ্রান্সিকো সহরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ত্রিগুণাতীতের যত্ন ও উদ্যোগে প্রায় ২ বৎসর হইল একটি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা উদ্বোধনের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি উক্ত স্বামীর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যেক উদ্বোধন গ্রাহককে ঐ মন্দিরের একখানি করিয়া চিত্র উপহার দিতে সক্ষম হইলাম।

আজ কাল ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবকে ও তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণকে সাধারণের অনেকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন ও তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত অনেক সাধুকার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। লোকের শ্রীরামকৃষ্ণনামে এই বিশ্বাস জানিয়া অনেক দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নাম করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। এরূপ সংবাদ আমরা প্রায়ই পাইয়া থাকি। সাধারণে প্রতারিত না হন, এই উদ্দেশ্যে আমরা জানাইতেছি, রামকৃষ্ণ মিশনের যে কোন কার্য্যের জন্য যদি কাহারও উপর অর্থ সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়, তাহাকে উক্ত মিশনের প্রেসিডেণ্টের নামের স্বাক্ষরযুক্ত এবং মিশনের ও মঠের শিলমোহর যুক্ত অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। ঐ অনুমতিপত্র কেহ দেখাইতে না পারিলে সাধারণে তাহার সহিত সাবধানে ব্যবহার করিবেন।

৺ কাশীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের

সাধারণ খরচের জন্য এককালীন

অর্থ ও জিনিষপত্রাদি দান।

(জুলাই ১৯০৬ সাল হইতে এপ্রেল ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত।)

এককালীন অর্থদান।

নাম।	ঠিকানা।	
শ্রীমতী কামিনী দাসী	৺ কাশীধাম	১৭৪॥০
এস্, এন্ পণ্ডিত ব্যারিষ্টার	রাজকোট	১৫০্
বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ	গার্ডেনরিচ্, কলিকাতা	৬০্
গণেশ দয়াল চ্যারিটি ফণ্ড	৺ কাশীধাম	৫০্
বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	,,	৫০্
রাজা সতীশচন্দ্র গিরি—(মোহান্ত)	তারকেশ্বর	৫০্
বাবু যদুপতি চট্টোপাধ্যায়	শিলিগুড়ী	২৫্
,, নরেন্দ্রনাথ দত্ত	মজীলপুর, ২৪ পরগণা	২৫্
	সর্ব্বশুদ্ধ	৫৮৪॥০

এককালীন ঔষধাদি দান।

মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং এলোপ্যাথিক ঔষধ মূল্য ৮০্

স্বামী আত্মানন্দ ৺কাশীধাম কুড়িজোড়া কাপড় এবং
এলোপ্যাথিক ঔষধ মূল্য ১৫্

বাবু রাজেন্দ্র লাল বন্দোপাধ্যায় কলিকাতা পাঁচ গ্যালন
ফিনাইল এবং তিনটী থারমোমিটার

ডাঃ এন্, কে, মজুমদার এণ্ড কোং কলিকাতা
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মূল্য ৩০্

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র দাস

বঙ্গের অধিকার।*

প্রথম প্রস্তাব।

(শ্রীশ্রমণক)

ইতিহাস বলেন যে, ভারত যখন স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারতের পূর্ব্বাংশের সমস্ত বাণিজ্য বাঙ্গালিদের হস্তেই ছিল। পশ্চিম ভারতের লোকেরা অধিকাংশই প্রায় ঘরে বসিয়া থাকিতেন, আর গ্রীস, আরব, মিশর, তাতার, পারস্য প্রভৃতি দেশের লোকেরা আপনাদের জাহাজে করিয়া পশ্চিম ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। বাঙ্গালিরা আপনাদের বাণিজ্যপোতযোগে মার্ত্তাবান, যাবা, চীন, জাপান, ও অন্যান্য বহুতর দেশে গমন করিয়া শিল্পজাতদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের বিনিময় করিতেন। কিন্তু কেবল বাণিজ্য করিতেই যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাহা নয়। পূর্ব্ব-আসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণই করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রমাণ আজিও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। কলিকাতার এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ কহিয়াছেন, "যখন আমি আসিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করি, তখন ঐ সকল দেশে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রভাবের চিহ্নসমূহ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হই। চীন জাপানী মন্দির-সমূহের প্রাচীরে 'ওঁ নমঃ' এই মন্ত্রটী লিখিত দেখিয়া যে কতই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, তাহা আপনারা বুঝিয়া লউন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অসীম উৎসাহ ও উদ্যমের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।"।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—বাণিজ্যে আমাদের পুরুষানুক্রমে অধিকার থাকিলেও ধর্ম্মপ্রচারেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম অধিকার। প্রায় পাঁচ শতাব্দী গত হইল, বাঙ্গালীকুলগৌরবরবি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কখন অনশনে, কখন অর্দ্ধাশনে জগতের কল্যাণ হেতু কত শত নগরে, গ্রামে, প্রান্তরে, অরণ্যে, বর্ষায়, শীতে, রৌদ্রে, পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বঙ্গবাসীদের সেই অধিকার পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন। কালসমুদ্রের বীচিমালাবৎ বৎসরের পর বৎসর সেই অধিকার বজ্রনিনাদে ঘোষিত হইতে হইতে অনন্তের আঁধার গর্ভে বিলীন

---

* এই প্রবন্ধ গত ২১এ আষাঢ় বিবেকানন্দ সমিতিতে পঠিত হইয়াছিল।

হইতে লাগিল, কিন্তু বঙ্গের কালনিদ্রা ভাঙ্গিল না। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে আবার সেই দেববাঞ্ছিত অধিকারধ্বজা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরুত্থিত করিলেন, এবং তাহা স্কন্ধে লইয়া পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ সেই বারতা সমগ্র জগতে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ অন্ধ সাজিয়া পথপ্রান্তে কুবেরপ্রদত্ত ধনরাশি যেরূপে ত্যাগ করিয়াছিল, আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া সেই ভগবৎপ্রদত্ত অধিকার তদ্রূপ ত্যাগ করিতে বসিয়াছি। শুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে যে কোন শুভ ফল হইবে না, তাহার প্রধান কারণ—আমাদের জাতীয় ভাবের প্রসারণ তাহাতে ঘটে না। প্রতি বৎসর লক্ষাধিক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হইতেছে। স্থানে স্থানে গ্রামকে গ্রাম ক্রিশ্চান বা মুসলমান হইতেছে। মুসলমান রাজাগণ যখন প্রথমে ভারতনিবাসী সমুদয় হিন্দুর সংখ্যা গণনা করেন, তখন আমরা ৬০ কোটি ছিলাম। এখন আমরা ২০ কোটি! ক্রমান্বয়ে এই যে স্বজাতিক্ষয় হইয়া আসিতেছে, তাহা নিবারণ জন্যই গুরু নানক, শ্রীকবীর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির অভ্যুদয় আমাদের মধ্যে হইয়াছে।

একটা জাতি যে বিধি অবলম্বন করিয়া আপনার অধিকারসমূহ রক্ষা করে, তাহারই নাম politics. আমাদের প্রধান অধিকার স্বরূপ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই এই স্বজাতিক্ষয় নিবারণের জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিপুল শক্তি ও অর্থ ব্যয়ে পঁচিশ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া আমাদের বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, ঐ পথ অবলম্বনে আমরা যে সমস্ত অধিকার প্রাপ্তির আশা করিতেছিলাম, তাহা সুদূরপরাহত। প্রথমতঃ, ইহাতে স্বাবলম্বনের ভাব একেবারে নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে ভিক্ষুকের ভাবই প্রবল। আমাদের জাতীয় ভাবে ঐ পথের সমালোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, কাহারও নিকট প্রতিগ্রহ করিলে যখন প্রতিগ্রহীতার মনের স্বাধীনতা লোপ হয়, তখন দেশশুদ্ধ লোকে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া রাজার নিকট ভিক্ষা মাগিলে আমরা পতিত না হইয়া উন্নত হইব কিরূপে? সুতরাং ইহা ধর্ম্মনীতিসম্মত নহে। একে আমরা মনুষ্যত্বহীন বলিয়াই *আজ হাজার বৎসর ধরিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছি; আবার তাহার উপর উচ্চশিক্ষিতগণ যদি কেবল সেই পথই সকলকে প্রদর্শন করেন, তাহাতে ঐই দাস ভাবের পুষ্টিই হইতে থাকে অথচ এই ভীষণ স্বজাতিক্ষয় নিবারণ হয়

না। আবার নিরপেক্ষ ভাবে, প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে, ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বোক্ত জাতীয় ভাব প্রসারণ দ্বারাই এক সময় অনায়াসে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার লাভ হইয়াছিল। ধর্ম্মাশোকের রাজত্ব কালে দেশের অবস্থাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, "এখন কালমাহাত্ম্যে সে উপায় আর খাটে না।" ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি একরূপ সুনিশ্চিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত। অতএব আমাদের বিশ্বাস—ধর্ম্মাশোকের সময় যে ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল, সেই উপায় অবলম্বন করিলেই এখন জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। অর্থাৎ সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের যে একটা বিশেষ জাতীয় ভাব গঠিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মভাবকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের জাতীয় উন্নতির পত্তন করিতে হইবে। কারণ,স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সেই জাতীয় ভাবের হ্রাসেই আমাদের কর্ম্মঠতা উদ্যম উৎসাহ বল ও বীর্য্য দিন দিন ক্ষীণাৎ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। আরও কিছুদিন যদি এইরূপ চলে—অতীতহীন বংশমর্য্যাদাহীন মস্তিষ্কবিহীন বর্ব্বর জাতির ন্যায় বৈদেশিক অনুকরণে রাজনৈতিক আন্দোলন যদি আরও কিছুদিন চলিতে থাকে, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি না ঘটিয়া মৃত্যুই অনিবার্য্য হইবে।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যখন শনৈঃ শনৈঃ ইংরাজ কবলে কবলিত হইতেছিল এবং রাজ্য-লোলুপ ইংরাজ আত্মপ্রসারণ করিতে করিতে যখন জাপানে যাইয়া অবতীর্ণ হইল, তখন আত্মরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত জাপানী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজের দৃষ্টান্তে বুঝিল যে, একটা জাতির আত্মরক্ষা এবং পরিপুষ্টি তাহার মজ্জাগত ভাবের পূর্ণ বিকাশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জাপানীরা অমনি য়ুরোপ আমেরিকায় ছুটিল। তাহারা কি য়ুরোপী হইতে ছুটিল? না। কেবল তাহাদের জড়বিজ্ঞান এবং কৃতকর্ম্মতা শিক্ষা করিবার জন্য। এই দুইটী দ্বারা তাহাদের হৃদয়কেন্দ্রস্থ যে জাতীয় ভাব, তাহারই পরিপুষ্টি বিকাশ ও প্রসারণ আরম্ভ করিল। য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে তাহারা যাহা আনিল, তাহা জড় যন্ত্র মাত্র, আর তাহাদের অন্তর্নিহিত জাতীয় ভাবই সেই জড় যন্ত্রগুলির পরিচালনী শক্তি। এখন আমাদের কেবল সেই বিদেশীয় যন্ত্রগুলি লাভ করিতে হইবে। বহুকালের দাসত্বে আমাদের জাতীয় ভাব যাহা প্রায় হারাইতে বসিয়াছি, তাহারই পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

নিজ নিজ পুরাবৃত্ত চর্চাই জাতিবিশেষের কেন্দ্রস্থ শক্তি জাগরিত করিবার মুখ্য উপায়। য়ুরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে আমরা কতকগুলি সাধারণ সত্যের শিক্ষা পাই বটে কিন্তু তদ্দারা আমাদের মহাশক্তির জাগরণ অসম্ভব। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্রাদি সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বর্ত্তমান; কতকাংশ পালী, তামিল ইত্যাদি পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে—এবং গ্রীক ও চীন সাহিত্যের মধ্যে কতক প্রাপ্তব্য। সচরাচর আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বালকদিগকে যে ইতিহাস পড়ান হয়, তাহা আমাদের দাসত্বের ইতিহাস। ইহার সহিত বিদেশী ইতিহাস পাঠে স্বভাবতই আমরা বিদেশীয় ভাব অনুকরণ করিতেই শিখিয়াছি। কারণ, নিজেদের জাতীয় মর্য্যাদার কোন একটা নিদর্শন না পাইলে অনুকরণ ব্যতীত আর কি শিক্ষা সম্ভবে? শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভেচ্ছা মানবের প্রকৃতিগত। আবার সেই প্রকৃতি এমন যে, স্বজাতির যাহা গৌরবের বস্তু, তাহা একবার বালককালে মনোমধ্যে প্রবেশ করিলে, আর অন্য জাতির কিছু শ্রেষ্ঠতর বুঝিলেও তল্লাভের ইচ্ছা হয় না। তখন আর 'আপনার সোনা রাং আর পরের রাং সোনা' দেখে না, যাহা আমরা ইস্তনাগাত করিয়া ভূত সাজিয়া বসিয়াছি। তখন আর আপনার ফেলিয়া পরের দ্রব্যে ভিখারির মত লোভ হয় না; বরং আপনার দ্রব্যটী যাহাতে অন্যের অপেক্ষা ভাল হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করে, এবং এই অবলম্বন এই কার্য্য এই উদ্যম জাতীয়তায় পরিণত হইয়া সমস্ত জাতিকে গৌরবের পথে বেগে অগ্রসর করিয়া দেয়। সেই জাতীয় মহাশক্তি ও সেই জাতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াই শ্রীবিবেকানন্দ ত্রিশ বৎসর বয়সে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্ম কাহাকে বলে আর সেই ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য সমগ্র জগৎকে করজোড়ে যে কেবল ভারতের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে হইবে, তাহাও পাশ্চাত্য জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা বঙ্গবাসীর বল-বীর্য্য কোথায়, তাহার প্রসারণ ও প্রয়োগ কি প্রকারে ও কি ভাবে করিতে হইবে, তাহাও বারম্বার আমাদের দেখাইয়াছেন। কলিকাতায় আর এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "সেই আত্মজ্ঞান ও আত্মচিন্তায় আমরা আজি পশ্চাৎপদ। অথচ সেই আধ্যাত্মিকতা আজিও ভারতে এত পরিমাণে রহিয়াছে যে, তাহার বলে আমরা অদ্যাপি পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, এবং যদি পুরাবৃত্ত বিশ্বাস করিতে হয় ত ভারতের সেই পূর্ব্ব গৌরব আবার আবির্ভূত হইবে, এবং তাহার

পুনরাবির্ভাব, হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! তোমাদের দ্বারাই সংঘটিত হইবে।" মুসলমানাধিকারে সেই জাতীয় শক্তির পুনরুদ্ধার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যের এবং ইংরাজ অধিকারে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। এই জন্য বিবেকানন্দ সর্ব্বদা সকলকে বলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক মহাশক্তি। আমাদের জাতীয় শক্তির পূর্ণ আদর্শ তিনি, এবং সেই মহাশক্তির আবির্ভাবেই আজ সমগ্র ইয়ুরোপ আমেরিকা এবং জাপান, হে ভারতের ভবিষ্যদাশা স্বরূপ বঙ্গযুবকবৃন্দ! তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া আছে।

স্বামীজি ও তাঁহার দেশের প্রতি ভালবাসা।*

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।)

মহাপুরুষ ও সাধারণ জীবে প্রভেদ এই যে, মহাপুরুষ যাহা বলেন, তাহা করিতে পারেন ও করেন। মহাপুরুষের উক্তিই তাঁহার যথার্থ জীবনী। সাধারণ জীবে বহু শাস্ত্রাদি পড়িয়া বড় বড় কথা বলিতে পারে, কিন্তু সেগুলি জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারে না। মহাপুরুষ জগতের কল্যাণ সাধনে সদা সচেষ্ট। তিনি মানবের উন্নতির নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করেন। সাধারণ জীবের ন্যায় সুখে দুঃখে, হাসি ও কান্নার মধ্য দিয়া কোন রকমে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারেন না। জীবনের প্রথম অংশে আত্মীয় স্বজনের দুঃখ ও অভাব দেখিয়া তাঁহাকে সদা বিমর্ষ করিয়া তোলে ও জগতেরও ঐ প্রকার অবস্থা কিনা জানিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠেন। তাঁহার বিশাল হৃদয়, বিশালতর হইয়া ক্রমে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যায়—কোন বিশেষ কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এক কথায় তিনি জগতকে আপনার হৃদয় দিয়া ভাল বাসেন, আপনার বলিতে জগৎ ভিন্ন তাঁহার অপর কিছু থাকে না।

স্বামীজিকে মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লইলে কতকগুলি প্রশ্ন মনে উদয় হয়। মহাপুরুষ বিশ্বপ্রেমিক—তাঁহার আবার দেশের প্রতি ভালবাসা কি? যিনি সমগ্র জগৎকে ভালবাসেন, তাঁহার আবার দেশের প্রতি ভালবাসা আছে, এ কথা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক কি? আবার স্বামীজিকে সাধারণ ধর্ম্মপ্রচারক বলিলে বলিতে হয়, ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে দেশের প্রতি

* বিগত ৫ই মে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

ভালবাসার সম্বন্ধ কি। কৈ, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ত এমনভাব কখন শিক্ষা দেন নাই। আমাদের ভারতের ধর্ম্মের মূল বেদবেদান্তাদি। সেখানে ত মহাজ্ঞানের কথা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাই না। সেই একত্ব প্রতিপাদক জ্ঞানের কাছে দেশ কাল ত থাকিতে পারে না। বিশ্বপ্রেমের কাছে ত স্বদেশপ্রেম সঙ্কীর্ণতর ভাব। আর এক কথা, স্বদেশহিতৈষিতা বা Patriotism বলিয়া জিনিষ কি ভারতবর্ষে কখন ছিল? কেবল একটী সংস্কৃত বচন এ সম্বন্ধে শুনা যায়, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। কিন্তু এ জন্মভূমি নিজের জন্মস্থান—গ্রাম বা সহর অথবা সমগ্র দেশকে উদ্দেশ করিয়া লেখা, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ হইতে পারে। Patriotism বা স্বদেশপ্রেম বলিলে আজ কাল যাহা বুঝায়, তাহা যে আমাদের দেশে কখন ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদিতে এ ভাব কুত্রাপি দেখিতে পাই না। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু দেশের জন্য কুত্রাপি নয়। আমার মনে হয়, আধুনিক স্বদেশপ্রেম জাতীয় নহে—এদেশে এ ভাবটি নূতন। অথবা,এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এ ভাবটি 'স্বদেশী'নহে—ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী। তবে কি স্বামীজির স্বদেশপ্রেম বিদেশিতাবাপন্ন? এইরূপ অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ উঠিতে পারে। ঐ সকল সমস্যার মীমাংসার চেষ্টার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ব্যক্তিগত জীবন যেমন নিজ নিজ প্রবৃত্তিরূপ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া গঠিত হয়, জাতীয় জীবন সেইরূপ জাতিগত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া গঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির বিশেষ বিশেষ ভাব আছে—প্রত্যেক জাতির চরিত্র সেই সেই ভাবের মধ্য দিয়া গঠিত হয়। সেই সেই ভাবই প্রত্যেক জাতির জাতীয়ত্ব। আর সেই জাতীয়ত্বের মধ্য দিয়াই প্রত্যেক জাতিকে উন্নতি লাভ করিতে হয়। অন্যথা সে জাতির লোপ অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস ইহার প্রমাণ। ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্ম্মের ইতিহাস। আমাদের আধুনিক ভাবের ইতিহাস নাই। কেমন করিয়া পরস্বাপহরণ করিতে হয়, কেমন করিয়া স্বার্থকেই জগতের একমাত্র আদর্শ জানিয়া, সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধন করিতে হয়, ইহা আমাদের ইতিহাস বলে না। আমাদের রামায়ণ, আমাদের মহাভারত ও আমাদের পুরাণাদিতে একমাত্র ধর্ম্মের ইতিহাস দেখিতে পাই, আমাদের জাতীয় চরিত্র দেখিতে পাই, আর দেখিতে পাই আমাদের জাতীয়ত্ব বা আমাদের প্রাণপাখীটি। ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয়ত্ব। ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই

আমাদের সকল উন্নতির উপায়। ধর্ম্মেই আমাদের সমগ্র শক্তি, জাতীয় একতা নিহিত রহিয়াছে। Politics বা রাজনীতির ভিতর দিয়া যাইলে আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের উন্নতি অসম্ভব। স্বামীজি এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন—স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু, আমরা বলি, অনন্ত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ, অনন্ত অতীতকালের কর্ম্মসমষ্টিই বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ পায় আর আমরা বর্ত্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক দিকে না এক দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথেই তাহাকে যেন চলিতেই হইবে। সেই ভাব অবলম্বন ব্যতীত সে বাঁচিতেই পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতিরও একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে। কখন ছিলও না আর জানিয়া রাখ, কখন হইবেও না। তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই,— সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাধারে রক্ষা করা।" ইত্যাদি।

আর এক স্থানে বলিতেছেন,—

"ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি হওয়া উচিত অথবা রাজনীতি, এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না, তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক মন্দই হউক, ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখন ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পার না। একটা জিনিষ নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিষ বসাইতে পার না। একটী বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অপর স্থানে তৎক্ষণাৎ পুঁতিয়া দিলে উহা যে

তথায় জীবিত অবস্থায় থাকিবে, তাহা তুমি কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক, মন্দই হউক, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্ম্মই জীবনের চরমাদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে; ভালই হউক, মন্দই হউক, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বায়ু ধর্ম্মের মহান্ আদর্শসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে; ভালই হউক, মন্দই হউক, আমরা ধর্ম্মের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি—ঐ প্রভাব এক্ষণে আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হইতেছে, উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনী-শক্তিরূপ দাঁড়াইয়াছে। মহাতেজের বিকাশ না করিয়া, সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া তোমরা কি সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তি-স্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার তাহাকে নূতন পথে প্রধাবিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্ম্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।"

স্বামীজির উক্তি হইতে এইরূপ ক্রমাগত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আমাদের উন্নতির জন্য তিনি কোন্ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলেন। সাধারণ ধর্ম্মপ্রচারকের ন্যায় তিনি কেবল ভক্তি বা জ্ঞান প্রচার করেন নাই। যাঁহারা স্বামীজির পুস্তকাদি পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এই ভারতবর্ষের উন্নতিচিন্তাই তাঁহার জীবনের সকল কার্য্যের নিয়ামক ছিল। এই স্বদেশপ্রেমই তাঁহাকে আমেরিকায় লইয়া যায়—ইহা তাঁহারই কথাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই তাঁহার চিন্তার মূল সূত্র ছিল। দূরে, বহুদূরে প্রবাসে যাইয়া, সেখানকার মহাসুখ, ঐশ্বর্য্য, বিলাসতরঙ্গ দেখিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, তুলনায় স্বদেশে ঐ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া, স্বদেশের দুঃখ দারিদ্র্য ভাবিয়া, সুকোমল বিলাসশয্যায় শুইতে পারেন নাই, সমস্ত রাত্রি মৃত্তিকায় পড়িয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলেন যে, ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণাকে তাঁহার তীর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। এমন

স্বদেশপ্রেম কোথায়? তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসেও যেন স্বদেশ-প্রেম স্ফুরিত হইত। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার স্বমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে,—

"লোকে স্বদেশহিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশ-হিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য্য করিতে হইলে তিনটী জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি—বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটিকোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে?—এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও, তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ! তোমরা অনেকেই জান, আমি আমেরিকায় ধর্ম্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া তথায় যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দ্দশা প্রতীকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কার্য্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়া-

ছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিত, তাহারা অবশ্য একথা জানে। ধর্ম্মমহাসভা ফভা হল না হল, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংসস্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তা দের খবর নেয় কে? ইহাই স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপান।

"মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা প্রতীকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধনমান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার?"

এমন প্রেম, দেশকে এমন করিয়া আপনার বলিয়া জ্ঞান করা, দেশের জন্য এত ভালবাসা আর কোথায়? স্বামীজি স্বদেশ-প্রেমের যে আদর্শ আমাদের সামনে ধরিয়াছেন, সেরূপ আদর্শ আর কোথায়?

পাশ্চাত্য স্বদেশহিতৈষিতা বা Patriotism স্বার্থবিজড়িত—আত্মরক্ষার ভাব হইতে উদ্ভূত। জাতির—স্বজাতির রক্ষা, তাহার ঐহিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন। নতুবা জাতিলোপ আশঙ্কা। যেমন করিয়া পার, আত্মরক্ষা কর। পরস্বাপহরণ কর, অন্য জাতির লোপ হয় হউক—স্বজাতি ব্যতীত অন্য জাতির অস্তিত্ব জগৎ হইতে মুছিয়া যায় যাউক, নিজ জাতির ঐহিক সুখ হইলেই হইল। ভবিষ্যৎ ভাবনার দরকার নাই—সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র, নিজের ও নিজের জাতির উন্নতিলাভে সচেষ্ট হও! ইহাই পাশ্চাত্য জগতের আদর্শ—ইহাই তাহাদের Patriotism। রাজনীতি বা সমাজনীতি ঐ Patriotism রূপ ভাবের উপলব্ধির উপায় মাত্র। যে রাজনীতি বা যে সমাজনীতি তাহাদের ঐ ভাবোপলব্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে তাহারা সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়—তাহাতে যদি সমস্ত জগৎ ধ্বংস

হইয়া যায় আর তাহারা রক্ষা পায়, তাহাও করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইতিহাস —পাশ্চাত্য ইতিহাস ইহার প্রমাণ বারবার দিয়াছে ও দিতেছে।

আমাদের ভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা কর্ম্ম-ক্ষেত্র। ভগবৎপথে যাইতে হইলে এই কর্ম্মক্ষেত্রেই জন্ম লইতে হইবে। দেবতারাও এখানে জন্মগ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ভোগে মুক্তি নাই। ভোগভূমি স্বর্গনিবাসী মুমুক্ষু দেবগণ এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্মক্ষয় করিয়া কৈবল্য লাভ করিতে বাসনা করেন। ভারতভূমিই এই পুণ্যভূমি। স্বামীজি এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন,—

"পূর্ব্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম,—ভারত পুণ্যভূমি—কর্ম্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। এখনে আমি এই সভার সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি,—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্ম্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্য-জাতির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে, যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতভূমি।"

শত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ কেবল ধর্ম্মই প্রসব করিয়াছেন। জগতের কল্যাণপ্রদ চিন্তাসমূহের উৎপত্তিস্থান ভারত ব্যতীত আর কোথায়? ভারতের সমগ্র চেষ্টা, সমস্ত কর্ম্ম মুক্তিপথেই ধাবিত হইয়াছে। ভারত ভিন্ন আর কোথায় মুক্তির বা ভগবান্‌লাভের এত পথ, এত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে? কর্ম্মফল মানিতে হইলে, ধর্ম্মলাভেচ্ছু মানবের এখানে না আসিয়া আর উপায় কি? কর্ম্মক্ষয়ের এ হেন স্থানের কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন আর কি নাম হইতে পারে, পুণ্যভূমি না বলিয়া ইহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? ভারতের সমাজনীতি ঐ ধর্ম্মোপলব্ধির উপায় আবিষ্করণে ব্যস্ত। ভারতের রাজনীতি ঐ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর। পাশ্চাত্য জগতের উপাস্য জন্মভূমি—স্বদেশ। নিজ স্বার্থ-

রক্ষা যে জাতির একমাত্র লক্ষ্য, তাহাদের উপাস্য জড় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই স্বার্থরক্ষাবৃত্তি আজ তাহাদিগের মধ্যে বিষম ভেদ আনিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে একজাতি অপরকে বিশ্বাস করে না। পাশ্চাত্য জগৎ আজ আগ্নেয়গিরির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাশ্চাত্যজাতি মহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা আমাদের নাই, আছে ঐ পাশ্চাত্যজগতে। জড়কে রক্ষা করিবার জন্যই যে জাতি সদা উদ্বিগ্ন, শত শত বৎসর ধরিয়া যে জাতি জড়ের উন্নতিই চিন্তা করিয়াছে, যে জাতির চিন্তার ফলে জড়শক্তিপ্রসূত বিষম মারণ-যন্ত্রাদি, কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে, যে জাতি স্থূল জড়ের উপর আধিপত্য লাভকেই নিজের মনুষ্যত্ব বিকাশের চরম উপায় মনে করে, যে জাতি এতদূর পৌত্তলিক যে, মৃত্যুতেও সমাধি আদি দ্বারা এই শরীরকে রক্ষা করিতে যত্নবান্, সে জাতির উপাস্য জড় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সে জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সে জাতিকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। আর ভারতের ধর্ম্মই, ভারতের আধ্যাত্মিকতাই উহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। স্বামীজি একথা অনেকবার বলিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

বেদমাতা গায়ত্রীর জন্মদাতা ভারত, সাংখ্য পাতঞ্জলের জন্মদাতা ভারত, সেই অনন্ত জ্ঞানময় অদ্বৈতবাদের জন্মদাতা ভারত—যে জ্ঞান কেবল বিশ্ব-ভ্রাতৃভাবের (Universal brotherhood) শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, যে ভারতের জ্ঞান সমগ্র জগতের একত্বই প্রতিপাদন করিয়াছে—যেখানে সমস্ত বিভিন্নতা, সমস্ত বৃত্তি একীভূত হইয়া—

"জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ
নাহি থাকি রবি শশী তারা
সে মহা নির্ব্বাণ, নাহি কর্ম্ম, করণ, কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে
আমি বর্ত্তমান।"

যেখানে "ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্ব্বগুণভেদ
একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্ত্তমান।"

যেখানে এই একত্ব জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই অথবা যে ভাব "অবাঙ্-

মনসোগোচরম্”—বাক্য মনের গোচর নহে, যেখানে বিভিন্নতাময়ী প্রকৃতির মীমাংসা—“একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি”—সেই জ্ঞানের জন্মদাতা ভারত—সেই মহা বিচিত্রতাময় অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়কারী ভারত—সেই মহা অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিত্য নূতন সামঞ্জস্য আবিষ্কারক ভারত, সদাই শুধু আমাদের—তাঁহার ক্রোড়ে পালিত জাতির—মঙ্গলের জন্য নহে—পরন্তু সদাই সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য বারবার আত্মজ জ্ঞান, আত্মজ ধর্ম্ম, আত্মজ প্রেম বিশ্বকে উপহার দিয়াছেন, নিজ অঙ্কে লালিত জাতির উৎপীড়ককেও পরিত্যাগ করেন নাই, সদাই দুর্ব্বলকে, নিপীড়িতকে, তাড়িত নিরাশ্রয়কে রক্ষা করিয়াছেন। ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিয়াছে ও এখনও দিতেছে।

“এইরূপ অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির সম্মিলন ঘটাইয়াছে, চিরস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভারতের যখনই স্বাতন্ত্র্যভঙ্গ করিয়াছে, যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র জগতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে।”

এত উদারতা, জগতের জন্য এত ভাবনা, সমস্ত বিশ্ব এত আপনার বলিয়া গ্রহণ করা, এত অভিন্নতা জ্ঞান আর কোথায়? কোথায় এমন আদর্শ? ভারত পরকে সদা আপনার করিয়া লইতে ব্যস্ত। শুধু আপনার করিয়া লওয়া নয়, নিজ হইতে অভেদ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহার সমস্ত উদ্যম।

কথিত আছে, নারদের প্রেমসঙ্গীতে ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে মুগ্ধ হন। পরে সঙ্গীতের প্রেমলহরী, মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিলে, তাঁহার দেহের প্রত্যেক স্থানে রস সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলে, সঙ্গীতের মাধুরীতে জগৎ সুপ্ত হইবার উপক্রম করিলে, সেই প্রেমসঙ্গীতে ভগবানের দেহ গলিতে আরম্ভ হইল, ক্রমে তাঁহার দেহ প্রেমে গলিয়া গেল—আর সেই প্রেমোদ্ভূত, সেই মহাপ্রেমজাত বারিই আমাদের পূতসলিলা গঙ্গা। ঐ কথা গল্প মনে হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ প্রেমের জন্মদাতা ভারত! যে প্রেমে “তুঁহু নয়ন কি তারা, বয়ানক হাস” ইত্যাদি অর্থাৎ যে প্রেমে বলিতে পারে, “হে প্রভু, তুমি আমার নয়নের তারা, তুমি আমার বদনের হাসি, তুমি আমার নিশ্বাসের বায়ু, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার দুঃখ, তুমিই আমার, আমিই তোমার, তুমিই আমি, আমিই তুমি”, সেই প্রেমের, সেই

অভেদভাবজ্ঞাপক প্রেমের জন্মদাতা ভারত। সেই প্রেমে যমুনা উজান বয়, পাথর গলিয়া যায়, "বিন্দু সিন্ধু" হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন যে, সেই প্রেমসঙ্গীতজাত গঙ্গার নাম করিলেই দেহ মন পবিত্র হইয়া যায়, সেই মহাপ্রেমের লীলাস্থল বলিয়া বৃন্দাবন যমুনা সেই প্রেম বিতরণে সমর্থ আর এই ভারত—যাঁহার ক্রোড়ে শত শত ভক্ত ঐ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত জগৎকে মাতাইয়াছেন, যে প্রেমে ভাবিত হইয়া প্রেমিক নিজের শরীরের দিকেও তাকাইতে চান না, কারণ, "দেখে নিজরূপ, দেখিলে পরের মুখ, তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্বঘটে", নিজেকে প্রেমাস্পদ হইতে অভিন্ন ভাবেন,

"প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।"

এহেন প্রেমভূমি ভারতকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, কি বলিয়া ভাষায় তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন করিব?

ভারত এই জ্ঞান, এই প্রেমের জন্মদাতা, একত্বজ্ঞাপক ভাবসমূহের লীলা-স্থল। ভারতের কর্ম্ম, ভারতের যোগ ঐ একত্বজ্ঞানলাভের এক একটি উপায় মাত্র। আর ভারতলালিত আমাদের উহাই আদর্শ। ঐ একত্ব, ঐ অভেদ-ভাব সাধনাই আমাদের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, আমি এই প্রবন্ধে "ধর্ম্ম" শব্দ উল্লিখিত "একত্ব" অর্থে গ্রহণ করিয়াছি।

এই ভারতকে কি চক্ষে দেখিব, ইঁহাকে কি বলিয়া ডাকিলে আমাদের প্রাণ ভাবে পূর্ণ হইবে, প্রেমে উথলিয়া উঠিবে? যাঁহার যে ভাব, তিনি ইঁহাকে আপন আপন ভাবেই ডাকুন। ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবন। ইঁহাকে—ভারতকে—ধর্ম্মস্বরূপ বলিব, না, ধর্ম্মের উৎপাদক বলিব? জানি না কি বলিব—ইঁনি অবাঙ্‌মনসোগোচর, অখিল বিশ্বের নিয়ন্তা, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। স্বামীজি একস্থানে ইঁহাকে "মা" নামে সম্বোধন করিয়াছেন। নিত্যলীলাময়ী মা আমাদের লীলাচ্ছলে ভ্রষ্টগৌরবা হইয়া সংসারের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে দাঁড়ান, লীলাচ্ছলে নিজেই আবার অবতীর্ণা হইয়া সেই লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করেন। এই খেলা মা আমাদের বরাবর খেলিতেছেন। স্বামীজি এই মার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের প্রাচীনা জননী আবার জাগরিতা হইয়াছেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা ও নবযৌবন-শালিনী হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন।"

লীলাচ্ছলে বহুদিন নিদ্রাচ্ছন্না এই সনাতনী মাকে স্বামীজি আবার জাগরিতা দেখিতেছেন, পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা গৌরবভূষিতা মাকে হাস্যময়ী দেখিতেছেন।

অনন্তজ্ঞানপ্রদায়িনী, বেদপ্রসবিনী এই সনাতনী মাকে দেবীভাগবতে "শক্তি" বলিয়াছেন। দেবীভাগবতে এই মা আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে নিজরূপ দেখাইয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সমস্ত বিশ্বের আধারশক্তি মা আমাদের 'তিনিই ইচ্ছাময়ী' এই ভাব তাঁহাদের দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মত কত দেব ঐ মায়ের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। শক্তি, শক্তি, শক্তিই আমাদের মায়ের স্বরূপ। আর স্বামীজি জগতে কি প্রচার করিয়াছেন? জগৎকে মায়ের এই শক্তিরূপই কি দেখান নাই? Strength is life—স্বামীজিরই কথা। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—তাঁহারই কথা। তাঁহার সমস্ত উক্তিই শক্তিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই, প্রত্যেক কথাতেই যে কি মহাশক্তি লুক্কায়িত, তাহা কি আমরা দেখিতে পাই না?—তাঁহার শক্তির খেলা এখনও ত ফুরায় নাই। "আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াও," "তুমি না পার কি, সমস্ত শক্তি—অনন্ত শক্তি যে তোমারই মধ্যে," "আমরাই আমাদের ভাগ্যের স্রষ্টা, আমরাই তাহার পরিচালক—যাহা আমরাই করিয়াছি, আমরাই তাহার প্রভাব নষ্ট করিতে সমর্থ," "নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিলে দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, একবার ভাব যে—অনন্ত শক্তি তোমার আছে, তবেই তোমার শক্তি বিকশিত হইবে," "দুর্ব্বলতাই মৃত্যু—সর্ব্বথা ইহাকে ত্যাগ কর"—এইরূপ শক্তিময়ী বাণী স্বামীজির প্রত্যেক গ্রন্থে রাশি রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। এই শক্তিই স্বামীজি প্রচার করিয়াছেন। এই সনাতনী মাকেই তিনি প্রচার করিয়াছেন। জগতের কল্যাণের জন্য, আমাদের মঙ্গলের জন্য, তিনি ঐ সনাতনী শক্তিকে ক্রমাগত আহ্বান করিয়াছেন, 'মা' 'মা' করিয়াই আপনার শরীর ক্ষয় করিয়াছেন, 'মা' 'মা' করিয়াই 'মাকে'—লীলাচ্ছলে সুপ্তা মাকে জাগরিতা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা এখন কোন্ পথ ধরিব--কোন্ পথে যাইব? সেই পাশ্চাত্য ভাবে গঠিত, স্বার্থোদ্ভূত আধুনিক স্বদেশহিতৈষিতা (Patriotism) লইব, না এই সনাতনী, চৈতন্যময়ী, শক্তিময়ী মাকে লইব? কি লইব? সেই জড় আদর্শ লইয়া ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইব, না, সেই অনন্তশক্তিময়

আদর্শ লইয়া নবজীবন, নবশক্তি লাভ করিব, আর জগৎকেও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুমুখ হইতে টানিয়া তুলিব ? কি করিব ?

কিয়ৎপরিমাণ জড়া বসুন্ধরাকে 'সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য-শ্যামলা' বলিয়া আমাদের নিজস্ব ভাবে গড়িতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু ইহাই কি আমাদের, সমগ্র ভারতবাসীর আদর্শ ? এ কৃত্রিমতার প্রয়োজন কি ? আর আজ দেশের আমাদের কি ঐ রূপ ? দুর্ভিক্ষ, মহামারী পীড়িতাকে সুজলা সুফলা বলিলে কি হইবে ? মায়ের নিত্যরূপ ছাড়িয়া, এ পরিবর্ত্তন-শীল অনিত্যরূপে আমরা আজ আকৃষ্ট কেন ? পাশ্চাত্যের পৌত্তলিকতা কি আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ করিতে উদ্যত হইয়াছে ? আমরা কি লইব ? মায়ের নিত্যরূপ, না, সদা পরিবর্ত্তনশীল পাশ্চাত্য জড় আদর্শ ? যুগে যুগে মা আমাদের নূতন নূতন রূপ ধরিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন। আজ মা আমাদের নবভাবে সজ্জিতা হইয়া নিজরূপ প্রকাশ করিবার জন্য আমা-দের নিকট দণ্ডায়মানা। আমাদের—পাশ্চাত্য পৌত্তলিকতায় মুগ্ধ আমাদের—চৈতন্য সম্পাদনের জন্য মা আজ করালবদনা মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিতা—আমরা আজ কি করিব ? মাকে ছাড়িয়া পালাইব, মাতৃত্যাগ করিব, না, আমাদের কঙ্কালাবশিষ্ট জাতির বাসভূমিতে, এই প্রেতভূমি চিতা মাঝে মায়ের মন্দির গড়িয়া তাঁহার পূজা করিব ? অথবা সমগ্র জাতি আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব ?

আমাদের মৃত্যুতে মায়ের কি ? কিন্তু সমস্ত জগতের মহা অকল্যাণ, কেন না মায়ের এ নিত্যরূপের ছবি আমরাই চিরকাল ধরিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সঙ্গেই ঐ ছবি নষ্ট হইবে। তাহা হইলে,—

"জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা অন্তর্হিত হইবে, চরিত্রের মহান্ আদর্শ সমূহ নষ্ট হইবে, ধর্ম্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব নষ্ট হইবে, সমুদয় ভাবুকতার লোপ হইবে। তাহাদের স্থানে কাম ও বিলাসিতারূপ দেব দেবীর রাজত্ব হইবে ; অর্থ হইবেন তাহাদের পুরোহিত ; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে তাহাদের পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা হইবেন তাহার বলি।"

আমাদের এই মৃত্যু হইতে রক্ষার বর্ত্তমানে একমাত্র উপায় ঐ শক্তির আরাধনা, ঐ মায়ের পূজা। স্বামীজি যে শক্তিমন্ত্র দিয়াছেন, তাহারই সাধনা করা। আর শক্তিপূজায় বলি চাই,—

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক্ তাহাতে শ্যামা॥"

এই মায়ের পূজার অধিকারী আমরা কিসে হইতে পারি?

পাশ্চাত্য ভাবে মুগ্ধ, পাশ্চাত্য বিলাসতরঙ্গে ক্ষুব্ধ, প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের প্রধান নগরীর নিকটে, অতি নিকটে, সেই পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরে, পবিত্র পঞ্চবটীতলে সেই সৌম্যমূর্ত্তি নিরক্ষর ব্রাহ্মণ দ্বাদশবর্ষ সাধন করিয়া ঐ মাতৃপূজায় অধিকারী হইবার যে উপায় আবিষ্কার করিয়া আজ জগৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা মাত্র দুইটী কথায় সমাপ্ত—"কামিনীকাঞ্চনত্যাগ"। সেই সদা সমাধিযুক্ত, জগতের কল্যাণচিন্তায় সদা উদ্বিগ্নচিত্ত, 'মা' নামে বিভোর পুরুষ কামিনীকে বর্জ্জন করেন নাই, পরন্তু মাতৃভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কাঞ্চন স্পর্শমাত্রেই অঙ্গের বিকলাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, কাঞ্চন-প্রভাবের মধ্য হইতে দূরে যান নাই, কাঞ্চনের যথার্থ ব্যবহার (তাঁহার অনুগত ভক্ত মথুরাদিকে) শিক্ষা দিয়াছেন।

নারীজাতির সহিত পুরুষ আমাদের সম্বন্ধ কি, ইহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। যদি ঐ আদর্শানুযায়ী আমরা ষোল আনা না চলিতে পারি, তাহাতে কি? ঐ আদর্শকেই আমাদের আদর্শ রাখিয়া ঐ আদর্শে সিদ্ধ হইবার আশা কেন না করিব? নারীজাতির পূর্ণত্ব মাতৃত্বে।* এমন স্বার্থ-গন্ধহীন পবিত্র প্রেম আর কোথায়? যার কাছে কোন্ পাষণ্ড অপবিত্র হৃদয়ে দাঁড়াইতে পারে? যদি কোথায়ও সেই প্রেমময়ের মহাপ্রেমের ছায়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মাতৃত্বে—নারী-জাতির এই পূর্ণ পরিণতিতে—সেই অকলঙ্ক প্রেম আছে।

আমাদের জাতির আদর্শ ই ত্যাগ। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—ইহাও সংসার-ক্লিষ্ট জনগণের প্রতি উপদেশ ও আদেশ। আর নারীজাতিকে মাতৃ-ভাবে গ্রহণরূপ সাধনে সিদ্ধ হইবার চেষ্টা অপেক্ষা ঐ ত্যাগব্রত পূর্ণ উদ্-যাপনের শ্রেষ্ঠতর ও সহজতর উপায় আর কি হইতে পারে?

নারীজাতিকে ঐ আদর্শে না লইলেও, তাঁহাদের প্রত্যেককে শক্তির অংশ-সম্ভূতা বলিতে দ্বিধা কি? এই সংসারের যথার্থ অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে? নারী।

* নারীজাতির পূর্ণত্ব যে সন্তানপ্রসবে, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু নারীজাতির হৃদয়ে যে মাতৃত্ব বা বাৎসল্যপ্রেম আছে, তাহাই নারীজাতিকে মহিমাময়ী করিয়াছে।

কে এই সংসারকে চালাইতেছে? এই নারীজাতি। যাহা হউক, নারী-জাতিকে আমাদের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিলে হইবে না। কারণ, তাহা হইলে আমাদের তেজ নষ্ট হইবে, শক্তি চলিয়া যাইবে—আমরা শক্তিমন্ত্র ভুলিয়া যাইব, দুর্ব্বল হইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইব। অতএব, এই শক্তি-পূজায়, এই মাতৃপূজায় কামিনী ত্যাগ চাই—আর ঐ ত্যাগস্বীকার করিতে হইলে মহাবীর্য্য প্রকাশ করা চাই। কামিনী ত্যাগ প্রথমে। দ্বিতীয় কাঞ্চন-ত্যাগ। অথবা আরও পরিষ্কার করিয়া, আমাদের ভাবের ভাষায় বলিতে গেলে—কাম-কাঞ্চন ত্যাগ চাই। কাঞ্চন ঐ মাতৃপূজার একটী সামান্য উপকরণ মাত্র। নতুবা কাঞ্চনও যাহা, মৃত্তিকাও তাহা। প্রথম অতুল বীর্য্য প্রকাশ করা চাই, মনুষ্যত্ব বিকাশ করা চাই—এক কথায় 'মানুষ' হওয়া চাই, কাঞ্চন দাস হইয়া আমাদের পশ্চাতে ঘুরিবে। স্বামীজি বলিতেন, "টাকায় 'মানুষ' করে না, 'মানুষে' টাকা করে।"।

আজ আমরা পাশ্চাত্য পৌত্তলিকতায় মুগ্ধ হইয়া, তাহাদের আদর্শকে আদর্শ করিয়া প্রথমেই অর্থাগমের উপায় খুঁজিতেছি, সেইজন্য পাশ্চাত্য উপায়গুলিও এখানে প্রয়োগ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, 'মানুষ' হইবার উপায়গুলিকে বড় বড় কথামাত্রে পরিণত করিয়া কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতেছি—মাতৃপূজার আয়োজনমাত্র করিতেছি না। আজ এই বিষম দুর্দ্দিনে যেন দেখিতে পাইতেছি, আমাদের স্বামীজি হাত তুলিয়া বলিতেছেন,—

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ের ছায়ামাত্র। ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারত-বাসী আমার ভাই, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার

শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এ প্রবন্ধে স্বামীজির সহিত তাঁহার স্বদেশের সম্বন্ধের কথা বলিতে গিয়া, স্বামীজিকে নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাপকাটিতে মাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তজ্জন্য আপনারা স্বামীজির ভক্তগণ ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আমার ত্রুটিমার্জ্জনা করিবেন—অপরাধ লইবেন না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্যের

আয় ব্যয়।

জমা।

২য় পক্ষ বৈশাখের উদ্বোধনে প্রকাশিত	...	৫১৩২৮৶৬ পাই *
১৮৯৯।১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের তহবিলে বাকি		৫০০৻১০ পাই
হংকং ব্যাঙ্ক হইতে ৩৪০৲ টাকার সুদ (উক্ত ৫০০৲ টাকার মধ্যে)	...	৪২৷৶৩ পাই
প্রেসিডেন্সি কলেজ	...	২০০৲
নিউইয়র্ক চার্টার্ড ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত	...	৮৯৲
রাজা সত্যেন্দ্র দেব রায়	...	৫৯৷৶৬ পাই
মাঃ স্বামী বিমলানন্দ (দফে)	...	৪৯৮৵০
মিঃ জে, এন্ রায়, দিনাজপুর	...	২৫৲
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		২৫৲

---

* উক্ত সংখ্যা উদ্বোধনে মোট ৫১০৭৲১০ স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এক স্থানে ভুলক্রমে ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ১৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৫৲ টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল। এবং যোগে একস্থলে ।০ আনা বেশী হইয়া গিয়াছিল। অতএব এই ৪।০ বাদ দিলে ৫১৩২৮৶৬ পাই মোট হইবে।

অধ্যাপক বিঃ এম্ সরকার	...	১৫৲
বাবু কানাইয়ালাল	...	৫৲
মিঃ ইউ, জি, কৃষ্ণরাও (২য় দফা)	...	৪॥০
মিঃ থিওডোর স্প্রিংম্যান্	...	৩৸৵০
খুচরা জমা	...	৩।৴০
জনৈক মহিলা	...	২৲
শ্রীগঙ্গাধর দাস		২৲
জনৈক বন্ধু, মালদহ	...	২৲
শ্রীঅভয়পদ হাজরা (৩য় দফা)	...	১৲
শ্রীরাধাকৃষ্ণ	...	১৲
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	...	॥০
শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে	.	৶৬ পাই
চাউলের থলে বিক্রয়	...	২৪৵০
বাক্স বিক্রয়	...	২৲
চাউল বিক্রয়	...	।৴০
		মোট—৬১৯০॥৴৭ পাই

খরচ।

১। জিলা ত্রিপুরা (বাবুরহাট ও রামপুরে)

চাউল খরিদ	...	২২।৴০
কুলি	...	১৲
ডাক খরচ	...	৵০
যাতায়াত খরচ	...	১৫৵৬
খাই খরচ	..	১৶৬
আলো	...	৶৬
		মোট—৪০৻৬ পাই

২। জিলা নোয়াখালি (সোনাইমুড়ি ও চরসিদ্ধিতে)

চাউল খরিদ	...	২৩৯১।/৩ পাই
চাউলের রেলভাড়া, গাড়ি ও কুলি খরচ	...	৬২৸৴৬ পাই
নগদ দান	...	১০৩৸৴৬ পাই
ঔষধ দান	...	৩৴৬ পাই
টাকা বা নোট ভাঙ্গাইবার বাট্টা	...	১॥৬ পাই
বস্ত্র	...	৫৻৬ পাই
তার, মণিঅর্ডার ফি ইত্যাদি ডাকখরচ		১৪৸৶০
রেলভাড়া এবং অন্যান্য যাতাযাত খরচ	...	৫৩/০
খাই খরচ	...	৫৯৸৴৯ পাই
আলো	...	২।/৬ পাই
কেন্দ্র সংস্থাপন ও রক্ষণ ব্যয়	...	১৩৸৶৩ পাই
অন্যান্য খুচরা খরচ	...	৫৸/০
		মোট—২৭১৭৸৶৩ পাই

৩। জিলা শ্রীহট্ট (কামারখালে)

চাউল খরিদ	...	১৫৩৯।৴০
চাউলের রেলভাড়া, নৌকা, কুলি খরচ	...	১৩৮॥৶০
নগদ দান	...	৮।০
ঔষধ দান	...	৬/০
জনৈক রোগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়	...	২॥০
বস্ত্র দান	...	২১॥/৯ পাই
তার, মণিঅর্ডার ফি ইত্যাদি ডাকখরচ	...	৪।৴০
যাতায়াত খরচ	...	৫২॥৬ পাই
খাই খরচ	...	৪৩৸৶৯ পাই
আলো	...	৪৸০
কেন্দ্র সংস্থাপন ও রক্ষণ ব্যয়	...	২৪৸০
অন্যান্য খুচরা খরচ	...	১৸/৬ পাই
		মোট ১৮৪৮৸৬ পাই

৪। ডায়মণ্ড হারবার লাইন (চৌকিতলায়) (১)

চাউল খরিদ	...	৬৭৫৶৯ পাই
নগদ দান	...	৶০
বস্ত্র	...	৫॥০
খাই খরচ	...	৩৲
নৌকা, কুলি, রেলভাড়া প্রভৃতি	...	১১৸/৩ পাই
মণিঅর্ডার আদি ডাকখরচ	..	॥/০
কেন্দ্র সংস্থাপন ও রক্ষণ ব্যয়	...	।৶৯ পাই
ঔষধ	..	৩৲
অন্যান্য খুচরা খরচ	...	॥৶৯ পাই

মোট—৭০০।৶৬ পাই

৪। ডায়মণ্ড হারবার লাইন (চৌকিতলায়) (২)

(ষ্টেটসম্যান্ আফিস হইতে প্রাপ্ত ৫০০৲ টাকার হিসাব)

বস্ত্র ও কম্বল খরিদ	...	১৭২৸০
চাউল খরিদ	..	১৪১॥৵০
রাস্তা, পুল ও বাটী মেরামত	...	১৩১৸৶০
ঢেঁকি, মাছ ও মাছ ধরিবার জাল	...	২১।০
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দান	...	১৵০
ঔষধ ও পথ্য	...	৬॥৵০
খুচরা দান	...	।০
রেলের মাশুল, কুলি প্রভৃতি	.	২৶০
রেলভাড়া, নৌকাভাড়া ও খাইখরচ	..	১৮৸/০
খুচরা খরচ	...	১।৶০
শ্রীহট্ট কেন্দ্রে প্রেরিত (একটী বাক্স বিক্রয় করিয়া)		২৲

মোট—৫০০৲

৫। বেলুড় মঠ হইতে।

ধর্ম্মশালা ভূমিকম্প কার্য্যে প্রেরিত	...	১০০
১৮৯৯। ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষ মোচনকার্য্যের রিপোর্ট ছাপান	...	২০৲
কয়েকটী দুঃখী পরিবারকে দান	...	৩৯৶৬ পাই
একজন কর্ম্মচারীকে শ্রীহট্ট কেন্দ্রে প্রেরণ	...	৩০৲
ঔষধ	...	৩
খুচরা খরচ	..	২৲
একজন কর্ম্মচারীর পাথেয়	...	৪/৬ পাই
লগেজের ষ্টিমার ভাড়া	...	৫৲
বস্ত্র	..	২৸/০
বিভিন্ন কেন্দ্রে অর্থ পাঠাইবার ইন্সিওরেন্স মণিঅর্ডার তার প্রভৃতি ডাকখরচ	...	১৯৸/৩ পাই
		মোট—২২৫৸৶৩

৬। প্রবুদ্ধ ভারত কার্য্যালয় হইতে।

মণি অর্ডার ফি	২৶০
	মোট— ২৶০
হস্তে বাকি	১৫৫।৭ পাই
সর্ব্ব শুদ্ধ মোট	৬১৯০॥/৭পাই।

মন্তব্য।

এই যে হিসাব দেওয়া হইল, ইহার জমার দিকে যে ৫০০৲ টাকা ১০ পাই আছে, উহা ১৮। ৯। ১৯০০ সালে রামকৃষ্ণ মিশন হইতে যে দুর্ভিক্ষ মোচন হয়, তাহার হিসাব নিকাশ হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্টের হস্তে জমা ছিল। ঐ টাকা হইতেই উক্ত রিপোর্ট ছাপাইবার এবং পাঠাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় এবং কয়েকটী দুঃস্থ পরিবারকেও উহা হইতে কিছু কিছু সাহায্য করা হয়। অবশিষ্ট টাকা হংকং ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছিল। ধর্ম্মশালা ভূমিকম্পের সময় মিশন হইতে যে কার্য্য হয়, তাহাতেও উহা হইতে ১০০৲ টাকা খরচ হয়। অবশিষ্ট টাকা ও তাহার সুদ আমাদের হস্তে থাকাতে এবার দুর্ভিক্ষ মোচনের সময় অতিশয় কার্য্যে লাগিয়াছিল। এক্ষণে হস্তে যে টাকা অবশিষ্ট রহিল, তাহা হইতে এবারকার রিপোর্ট ছাপাইবার ও পাঠাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি চালের থলে বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে, সেই গুলি বিক্রীত হইয়া গেলে উহাও জমা হইবে। এই আয় ব্যয় পরে প্রকাশিত হইবে। রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া ছাপা হইতেছে। হা হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-মোচনকার্য্যসম্বন্ধীয় আরও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

বঙ্গের অধিকার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(শ্রীশ্রমণক)

আমাদের শিক্ষার দোষে আমরা অজ্ঞাতসারেও বিদেশী অনুকরণ করিতেছি, সেই জন্যই প্রতি কথায় ইংরাজী বা মার্কিনি আদর্শে একটা আন্দোলন করি, কিন্তু মূলে জাতীয়তার অভাবেই তাহার কোনও শুভ ফল ফলে না। সকল প্রকারে ইংরাজের অনুকরণ করিলে আমরা যে কেন উঠিতে পারিব না, তাহার কারণ ইংরাজেরা গ্রীক আদর্শে গঠিত, আ[illegible]সই গ্রীকরা কেবল বলবীর্য্যেরই উপাসনা করিয়া আসিয়াছে। তা[illegible]র মধ্যে দুই দশজন ভিন্ন প্রকারের লোক যে ছিল না, তাহা নহে; [illegible] সাধারণতঃ তাহারা কেবলমাত্র দৈহিক বলবীর্য্যের উৎকর্ষ করিতে করিতে অবশেষে যাহাতে সমগ্র জাতিটা মহাবলশালী হয়, সেই জন্য তাহাদের মধ্যে স্থানবিশেষে দুর্ব্বল শিশু সন্তান জন্মিলে তাহাদের হত্যা করার প্রথা পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে। এই পৈশাচিক ভাব তাহাদের এতই প্রবল ছিল যে, তাহাদের উৎকৃষ্ট শিল্পীরা আদর্শ নারীসৌন্দর্য্যের ভাস্কর্য্যে সেই পাশব বলবীর্য্য প্রকাশ রাখিত muscular—করিত। এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা মানসিক উন্নতি বিশেষভাবে কখনই করিতে পারে নাই। ইংলণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ চরিত্র গঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের বালক ও যুবকবৃন্দকে যে সকল শিক্ষা অদ্যাপি দিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গ্রীকদের এই শিশু হত্যা দ্বারা জাতীয় বলবীর্য্য রক্ষার কথাও উত্থাপন করেন; † এবং খ্রীষ্টিয়ান জগতে এরূপ উদাহরণ দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিতও বোধ করেন না। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের পক্ষে—আর্য্যসন্তানগণের পক্ষে সেই ঋষিবংশধরদের পক্ষে—এই আদর্শটী কেমন মনে হয়? দুর্ব্বল ও কৃশ সন্তান জন্মিলে, পিতা মাতা কি গঙ্গার জলে তাহাকে বিসর্জন দিতে পারেন? আমাদের মধ্যে পাশবপ্রকৃতি, হীন, মূর্খ, মহা দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকদের, যাহাদের ঘরে গণ্ডা গণ্ডা সন্তান

---

* এই প্রবন্ধ গত ২১শে আষাঢ় বিবেকানন্দ সমিতির এক অধিবেশনে পঠিত হয়। ইহার প্রথমাংশ গতবারের উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† Dr. G. B. Moore's "Scientific self-culture.

জন্মায় আর দারিদ্র্যভার ততগুণ বাড়িয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সেই দারিদ্র্যভার লাঘব করিবার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, কি ঐরূপ গ্রীক্ প্রথার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন? না, তাহা পারেন না। ঐ পাশব-প্রকৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা দুই চারি টাকার জন্য আপনার বাপ দাদার গলায় ছুরী দিয়া থাকে এবং তজ্জন্যই শত শত বৎসর ধরিয়া দেশটা পরাধীন রহিয়াছে বটে, তথাপি তাহারা অতটা নির্ম্মম হইতে পারে না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, রাজপুতানায় রাজপুতদের কন্যাসন্তান জন্মিলে তাহাকে হত্যা করিত। এ কথা মানি। কিন্তু সে কয়টা? কেবল অতি উচ্চ বংশে বংশ-মর্য্যাদা খর্ব্ব হইবার ভয়ে, সামাজিক অত্যাচারের ভয়ে। ভয়ে লোকে কি না করিয়া থাকে? তাহাও অতি গোপনে, মহা পাপানুষ্ঠান জানিয়া করিত। কিন্তু গ্রীক্‌দের তাহা নহে, দুর্ব্বল সন্তান ধ্বংস করা পাপ নহে, উহা জাতীয় উন্নতির সোপান; তাহা না হইলে ইংরাজ কেন সেই পাশব গ্রীক্ আদর্শের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের যুবকসম্প্রদায়কে আজিও শিক্ষা দিবেন? পাশ্চাত্যদের ভাবই ঐরূপ, "আপনি খাও দাও ভোগ কর, বেঁচে বর্ত্তে থাক, আর সব উচ্ছন্নে যাগ্, তাতে কোন দোষ নাই।" এবং সেই জন্যই উহারা যেখানে যায়, সেখানকার সকলকে ধ্বংস করিয়া আপনারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসে। আমরা আর্য্য জাতি, আমাদের প্রকৃতি উহার ঠিক্ বিপরীত। আমরা পরের উপকার করিব, সেবা করিব, পরকে আপনার করিয়া লইব।

ইহাই আমাদের সমগ্র জাতির ধাতুগত লক্ষণ। ফাহিয়াং, ফোকোকী প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে,—যখন ইংরাজেরা নরমাংস ভক্ষণ এবং বনে জঙ্গলে উলঙ্গ বাস করিতেন,—ভারতে আসিয়া দেখেন যে, আমাদের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পরোপকার করিবার কেন্দ্র স্বরূপ হাঁস-পাতাল, অবৈতনিক বিদ্যালয়, মঠ, আর দেশশুদ্ধ লোক পরহিতে রত। ইহাই আমাদের জাতিগত অধিকার, ইহারই জন্য আমরা দেবতা নামে আর পাশ্চাত্যেরা তাহাদের রীতি নীতি অনুসারে অসুর নামে অভিহিত। আমাদের এই জাতীয়তার আদর্শ ভাবটী কিন্তু পাশ্চাত্য অনুকরণের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; তদুপরি বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিমিত জাঁক্ জমকের অন্তরালে পড়িয়া উহা উট্‌তি যুবক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

এস্থলে একটী নূতন সমস্যার উদয় হইতেছে। অনেকে হয় ত বলিবেন য়ুরোপীয়েরা এখন আমাদের অপেক্ষা অনেক সভ্য হইয়াছে, আর তাই

এখন তাহাদের অনুকরণ না করিলে আমরা একটা শক্তিমান্ জাতি হইতে পারিব না, নানা জাতির সংঘর্ষে বিনষ্টই হইবে। একথা খুব ঠিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, য়ুরোপীয়দের দুই চারি জনের মস্তিষ্কে প্রকৃত সভ্যতা কি, তাহা প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু সাধারণের মধ্যে পাশব ভাবই বর্ত্তমান। এদিকে আমাদের সমগ্র জাতির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রকৃত সভ্যতার ভাব প্রবিষ্ট আছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ভাব আমাদের ভাবের ঠিক বিপরীত। আমাদের ভাব—ভগবান্ হওয়া, নির্দ্বন্দ্ব হওয়া; য়ুরোপীয়দের ভাব—দুনিয়ার সমস্ত ভোগ্য বস্তু আত্মসাৎ করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বসিয়া থাকা। জীবন সমস্যার মীমাংসা অদ্যাপি তাহারা করিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহাদের সমগ্র জাতির মধ্যে ঐ ভাব প্রবল। আমাদের জীবন সরল, উহাদের জটিল। এই নির্দ্বন্দ্বতারূপ আদর্শ লইয়া আমরা ভগবানের ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে ধাবমান, উহারা আমাদের পরিত্যক্ত পার্থিব দ্বন্দ্বসঙ্কুল অধিকার লাভে ধাবমান। এই আমাদের জাতীয় আদর্শ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কোথাও পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত, কোথাও বা তাহা কেবল আংশিকরূপে ব্যক্ত। অপর জাতির চক্ষে আমাদের এই ভাব কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে এতই উত্তমরূপে পরিলক্ষিত হয়, যে অপর জাতিরা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলে—"Mild Hindu"।

আর এক কথা। অনেকেই বলিবেন যে, এই কোমলপ্রাণতাই আমাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ। এই কথায় একটী গল্প মনে পড়িতেছে। দুই মাতাল একত্র সদালাপ করিতেছিল। একজন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বল্ দেখি, নরম জিনিষ টঁ্যাকসই হয়, না, শক্ত জিনিস বেশী টঁ্যাকে?" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "দূর মূর্খ, একি আবার একটা সমস্যা হল? বালকে জানে যে শক্ত জিনিস টঁ্যাকে নরম জিনিস গোল্লায় যায়।" প্রথম ব্যক্তি কহিল, "তা নয়, নরম জিনিসই স্থায়ী, তার সাক্ষী আমার সব দাঁতগুলো পড়ে গেছে দেখ, কিন্তু জিভটা যেমন তেমনি আছে।" কথাটা কিন্তু মহাসত্য। আমাদের কোমল-প্রাণতাই আমাদের মহাশক্তি। বায়ু কোমল, প্রবল হইলে গিরিশৃঙ্গও চূর্ণ করে। এই জন্য আমাদের শক্তিপূজা স্ত্রীমূর্ত্তিতে। যাঁহারা 'কোমলপ্রাণ' বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করেন, তাহাদের মনের ভাব এই যে, কোমলতা বশতঃ আমরা স্বজাতিরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি না অর্থাৎ আমরা কাপুরুষের জাতি। কিন্তু হিন্দু মরিতে ভয় করে না। বার্দ্ধক্যে, 'আমায় গঙ্গা নিয়ে চল, আমার দিন ফুরায়েছে, আমায় ভগবানের নাম শুনাও,' এ কথা

কিন্তু হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই বলে না। যাহা হউক, এই জাতীয় ভাবের পূর্ণবিকশিত আদর্শ শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ আপন জীবনে কোমলপ্রাণতায় অনন্ত শক্তি দেখাইয়াছেন। এবং এই আদর্শকে বিদেশী জড়বিজ্ঞানের পাশব আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ তাঁহার নিজ জীবনে সেই ভাব বেদান্তের ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ও সেই বৈদিকভিত্তিস্থিত কোমলপ্রাণতা সমুত্থিত মহাশক্তির প্রভাবে য়ুরোপীয় কঠিন, জটিল সভ্যতার পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছেন! অতএব হে বঙ্গীয় যুবকগণ, ইহাই আমাদের জাতীয় আদর্শ কার্য্য—আমাদের কোমলপ্রাণতার তোপে বেদান্তের গোলার দ্বারা আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার পর্ব্বতশ্রেণী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আমাদের আদর্শে গড়িব। আমাদের বঙ্গবাসীদের উপর ইহাই শ্রীভগবানের আদেশ।

হে বঙ্গীয় আর্য্য যুবকগণ! তোমরা এই দেবতার অধিকারচ্যুত হইও না। আমাদের যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার শক্তি সংগ্রহ করিতে হয় ত, আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড, প্রাণ ও একমাত্র বলবীর্য্যের কেন্দ্র সেই মহাদারিদ্র-ভার নিপড়িত নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদের মধ্যে সর্ব্বদুঃখহর বিদ্যা ও ধর্ম্মের ভাব বিস্তার করিতে হইবে। আমাদের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রাণপণে সেবা, আর ধর্ম্মভাব ও জাতীয় শিক্ষা দ্বারা তাহাদের অন্তরে স্বজাতিপ্রিয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জীবনে জটিলতার আবির্ভাব হেতু আমরা কেবল তাহাদের মন্দগুলিই অনুকরণ করিতেছি; তাহাদের ভাল ভাবগুলির প্রতি, যাহার দ্বারা তাহারা স্বজাতির পুষ্টিবিধানে সক্ষম, সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই বলিলেই চলে। তাহাদের একটী অত্যুৎকৃষ্ট রীতি এই যে, কোন ধনী ব্যক্তি যদি দেখেন যে, এক ব্যক্তি কোন মহান্ আবিষ্কারে কি কোন বিশেষ বিদ্যার উৎকর্ষে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার পারিবারিক অভাব হেতু ষোল আনা মন উদ্দিষ্ট কার্য্যে লাগাইতে পারিতেছেন না, তখনি সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার আনুকূল্যে মুক্তহস্ত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তাহার খরচপত্রের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এই স্থলে সেই ধনী ব্যক্তি জাতীয়তার নিয়ম রক্ষা করিয়া নিজের এবং সমগ্র জাতির মহাকল্যাণ সাধন করিলেন। আমাদের দেশের যে সমস্ত লোকের জন্য এক প্রকার অনাহারে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা প্রজাগণ ধনোৎপাদন করিতেছে

তাঁহারা সেই বুভুক্ষিত প্রজাদের প্রতি কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার কার্য্য করেন না। এমন কি, তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা তাঁহাদের মনেও স্থান পায় না। ধর্ম্মানুসারে তাহারা যে তাঁহাদের পুত্রবৎ পোষ্য, তাহার প্রমাণ প্রজাগণের জমিদারের প্রতি পিতৃসম্বোধনেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার আরও বিশেষ প্রমাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ এবং স্বামী বিবেকানন্দ কৃত 'বর্ত্তমান ভারতে' তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

এক সময় মথুরানাথ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা রাণাঘাটের অন্তর্গত জমিদারিতে উপস্থিত হইলেন।

"এই স্থানের লোকগুলি অতীব জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার, রুক্ষকেশ, যেন বহুকালাবধি কখন অর্দ্ধাশনে কখন বা অনশনে দিন যাপন করিতেছে। পরিধানে কাহার এক খণ্ড অতি মলিন শতচ্ছিদ্র বস্ত্র, কাহারও বা তাহাও নাই, কেবল একখণ্ড জীর্ণ মলিন বস্ত্রের কৌপীন। রামকৃষ্ণদেব লোকগুলির এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'মা, তোর একি বিচার মা? কারুর ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই, আবার কেউ বা অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে! মা, তোর রাজ্যে এমন অবিচার কেন মা?' মথুরানাথ তাঁহার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন বাবা, কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?' রামকৃষ্ণদেব সেই দারিদ্র্যনিপীড়িত লোকদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, 'দেখ মথুর, এদের দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! আমি আর এ কষ্ট দেখিতে পাচ্ছিনি! তুমি এদের তেল দেও, কাপড় দেও, আর ভাল খাবার দেও। এরা তেল মেখে স্নান করে সবাই একখানি নূতন কাপড় পরে ভাল খাবার খাক্, আর তুমি যতদূর পার এদের দুঃখ দূর কর, আমি দেখি। এদের মত দুঃখী কখন দেখিনি।' মথুরানাথের জমিদারি এই স্থানে; সুতরাং তথায় যে অসংখ্য দরিদ্র বাস করিত, তাহা তিনি বিদিত ছিলেন। অন্যান্য সময় মথুরানাথ কোন বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার ইষ্টদেবের ইঙ্গিতমাত্রেই লক্ষ লক্ষ টাকা অবাধে ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু কি জানি কেন এসময়ে তিনি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, 'বাবা, তোমার দয়ার শরীর, দুঃখ দেখলেই তোমার কষ্ট হয়। কিন্তু এই সমস্ত লোককে খাওয়াতে যে গাদা গাদা টাকা খরচ হবে, তা ত জান না। আমি এত টাকা কোথায় পাব?'

'মথুরের এই বাক্য শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব অতি রুক্ষভাবে কহিলেন, 'কি! তুমি মনে করেছ, এই ঐশ্বর্য্য তোমার? আজ মরে গেলে কাল তোমার থাকবে? এ দুনিয়ার এক পয়সা কারুর নয়, সব মার! তোমরা বড়মানুষরা মার ভাণ্ডারী, তাঁর কাজে খরচ করবে, তাঁর সেবায় খরচ করবে, যকের মত কেবল আগলে রাখবার জন্য, কি কেবল তোমাদের আত্মতৃপ্তি করবার জন্য ভাণ্ডারী হওনি। মা কি আলাদা? মা এই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। মার আজ্ঞা—এই দুঃখীদরিদ্রদের সেবা করলে তাঁরই সেবা করা হবে। তাঁরই আজ্ঞা জেনে এই সমস্ত দুঃখী লোকের সেবা কর। যত টাকা লাগে খরচ কর। তাঁর ধন তিনি সঞ্চয় করে তোমাদের কাছে রেখেছেন কেবল তোমাদের নিজের সুখের তরে খরচ করবার জন্যে নয়। যতদূর পার এদের দুঃখ দূর কর, তাঁর আজ্ঞা।' রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যেক বাক্য বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার শিরায় শিরায় লাগিতে লাগিল, প্রত্যেক বাক্য যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত মথুর একেবারে দীনভাবাপন্ন হইয়া বারম্বার তাঁহার ইষ্টদেবতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তারযোগে কলিকাতায় বস্তা বস্তা কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করিবার আজ্ঞা পাঠাইলেন।" মথুরানাথ অবনতমস্তকে সেই ঐশী আজ্ঞা পালন করিলেন।

স্বামীজি এই সম্বন্ধে অর্থাৎ ভারতের পুনঃ পুনঃ পতনের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শাইয়া বলিয়াছেন, "তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা সহস্রবার ঠেকিয়াও এই মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠেকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অল্পদর্শী, মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক নিজের স্বার্থ সাধনাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

"বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চারের জন্য; এ কথা মনে থাকে না গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।"

স্বামীজি পরমহংসদেবের কথা সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, 'গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।' পরমহংসদেবের 'মা' আর স্বামীজির প্রকৃতি এ স্থলে একই বস্তু। বেদান্ত বলেন, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান জানা চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনিই হইয়া রহিয়াছেন। সেই জন্যই স্বামীজি জীবসেবার এক এক কেন্দ্র খুলিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ এই সমস্ত স্বজাতিসেবার কেন্দ্র সকল ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু স্বামীজি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এ সমস্ত গৃহীদের কার্য্য দৃষ্টান্ত; স্বরূপেই আপাততঃ তাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা ঐ সকল খোলা হইয়াছে। সেই জীবের সেবা আমাদের মহান্ ধর্ম্ম।

অতএব স্বজাতির রক্ষা ও সেবা আমাদের ধর্ম্মগত কার্য্য, তাহার জন্য বিদেশী পলিটিক্স্ আনিবার আবশ্যক নাই। তাহাতে কোন কার্য্যই হইবে না; কারণ, দুই চারিজন ইংরাজীবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত সকলে সে কথা গ্রাহ্য করিবে না। কারণ, এই যে দেশের শিল্পোন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সফলতার এক মহা অন্তরায় দেখা যাইতেছে। অস্মদ্দেশের শিল্পীরা যে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন করে, তাহা কেবল 'যেন তেন প্রকারেন' দুপয়সা উপায় করিবার জন্য। 'উৎপন্ন দ্রব্যটীকে জগতের আদর্শস্থানীয় করিতে হইবে; তবে তাহার সহিত সমগ্র জাতিটার মঙ্গল হইবে'—এ ভাবই তাহাদের মধ্যে বার আনা লোকের মনে হয় না, তাহারা ত আর সকলে ইংরাজিপড়া লোক নয়। তাই আমাদের ঢাকাই শান্তিপুরের কাপড় ভিতরে এক প্রকার, বাহিরে অন্য রকম। আবার দেশের উৎকৃষ্ট পাটে জল ও বালি মিশাইয়া ভারি করি। পাটটী যে দুদিন পরে পচিয়া ঢোল হইবে, সে চিন্তাই মনে উদয় হয় না এবং সেই জন্য যে ক্রেতা আগামীবারে পূর্ব্ববারের মত উচ্চ মূল্য দিতে নারাজ হইবে, তাহাও ভাবিবার ক্ষমতা নাই।

অপরদিকে দেখুন, কামার কুমর ধোপা নাপিত স্বর্ণকার প্রভৃতি ভারতীয়সকল শিল্পীরা আপনাপন জীবিকা উপায়ের হেতেড় যন্ত্রগুলির রীতিমত পূজা করিতে কখনই ত্রুটি করে না, এবং সেগুলিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে; এমন কি, মুসলমান কৃষকেরা পৌষমাসে মাঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজাও করিয়া থাকে। কারি-

কর নিজের যন্ত্রগুলি এবং বীর তাহার কৃপাণের পূজা করে, কিন্তু আপনার ব্যবসাটী সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, আপনার চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখে না, তাই লোক ঠকাইয়া কোন প্রকারে দিনপাত করিতে গিয়া সমস্ত দেশটার সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। এই প্রকারে আমাদের সকল শ্রেণীর লোকের উপজীবিকা হইতে জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, ধর্ম্মই আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত কেমন করিয়া আশা করিতে পারা যায় যে, শিল্পীরা ঠকাইতে চেষ্টা না করিয়া প্রাণপণে উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন করিবে? ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে আজ সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতিক্ষয় নিবারণ হইতেছে না, সেই ধর্ম্মশিক্ষার অভাবেই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আগন্তুক পাদ্রীদের আক্রমণ হইতে আপনাদের রক্ষা করিতে অপারক হইয়া দলে দলে বিধর্ম্মী হইতেছে, আর অমনি আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই স্বজাতিক্ষয় নিবারণ জন্যই মুসলমানাধিকারে শ্রীশ্রীচৈতন্য এবং ইংরাজাধিকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের পুণ্যভূমি পাদ্রীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিজিত হইতে বসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই পাদ্রী আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্যই পাশ্চাত্যদেশে যাইয়া তাহাদের দেশ আক্রমণ করেন এবং একাকী সেই ভীষণ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া কার্য্যতঃ আমাদের আত্মরক্ষা কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়াছেন।

শরীর রক্ষার জন্য যেমন আহার প্রয়োজন এবং রুগ্ন শরীরের জন্য যেমন পথ্য এবং ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক, তদ্রূপ জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য বেদান্তের প্রচার এবং এই ভীষণ স্বজাতিক্ষয় নিবারণ জন্য নিম্নশ্রেণীর সেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! স্বজাতি রক্ষা তোমাদের অধিকার; কারণ, বিবেকানন্দ স্বামী সে অধিকার তোমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। অতএব এই ভীষণ স্বজাতিক্ষয় যাহা ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করাইতেছে, তাহা হইতে আমাদের তোমরাই রক্ষা কর। আর বৃথা কালবিলম্ব করিও না, মৃত্যুকে প্রশ্রয় দিওনা, তোমরা সর্ব্বত্যাগী হইয়া দলে দলে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার সর্ব্বাগ্রে ঐ পদদলিত দরিদ্রদের ভিতরে কর। যদি মাতৃভূমি পুনর্জ্জীবিত করিতে চাও ত সেই আমাদের রক্তের রক্ত অস্থির অস্থি নিম্নশ্রেণীর লোকদের ধর্ম্ম এবং লৌকিক বিদ্যা শিক্ষা প্রদান কর, যাহাতে তাহারা ধর্ম্মাভাবে পাদ্রীকর-কবলিত না হয়,

ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে যাইয়া প্রাণপণে তাহার উপায় কর। প্রতি-বৎসর ভারতে এক একটী বিরাট্ ধর্ম্মসভা করিয়া কি উপায়ে পাদ্রী আক্রমণ ব্যর্থ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রতি গ্রামে সেই বিরাট্ সভার এক একটী শাখা সংস্থাপন কর আর যদি তোমরা সত্য সত্যই নিজ গর্ভধারিণী অপেক্ষা মাতৃভূমিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে ও ভালবাসিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে একদল অবৈতনিক চিকিৎসক সম্প্রদায় গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া দরিদ্রদের চিকিৎসা আরম্ভ কর, আর একদল অবৈতনিক নবীন শিক্ষকের সম্প্রদায় গঠন করিয়া জনে জনে সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান কর। এরূপ সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ যুবা শিক্ষক সম্প্রদায় দ্বারা জন্মভূমি সমাচ্ছন্ন করিলে, দেখিবে, অতি স্বল্প দিনে নিদ্রিত ভারত পুনর্জ্জাগরিত হইয়াছে। এইরূপ সমগ্র জগতের সর্ব্বপ্রকার উচ্চ শিক্ষা দিবার তোমাদেরই চিরন্তন অধিকার ছিল; তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ ভারতকে সজীব ও তাহার পুনরুদ্ধার কর! বর্ত্তমান যুগে ইহাই শ্রীভগবানের আদেশ।

বঙ্গে অকালমৃত্যু প্রতীকারের উপায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(ডাক্তার শ্রীশশীভূষণ ঘোষ এম, বি লিখিত।)

বিগত একশত বৎসরের মধ্যে, ইংলণ্ড দুইবার মাত্র মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়া,—ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ও বুয়ার সংগ্রামে— সর্ব্বশুদ্ধ ষট্চত্বারিংশ-সহস্র জীবন অকালে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে, (১৯০৭ সালে) ভারতবর্ষে, কেবল এক সপ্তাহে মহামারী উপদ্রবে সপ্তষষ্টি সহস্র লোক অকালমৃত্যু আশ্রয় করিয়াছে! ভারতে গত দশ বৎসরের প্লেগ-মৃত্যুসংখ্যা পাঁচ কোটিরও অধিক। ওলাউঠা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির উৎপীড়নে আরো কত কোটির জীবনলীলা অবসান হইয়াছে, কে গণনা করে, আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়াদি রোগে, দশ লক্ষাধিক লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই ভীষণ অকালমৃত্যুর আক্রমণে বঙ্গের জাতীয় জীবন কিরূপ অবসন্ন হইতেছে, তাহাও দেখিয়াছি। কি সামাজিক উন্নতি, কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি আধ্যাত্মিক বিকাশ,

সমস্তই পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবৎ দুরাশায় পরিণত হইবে, যদি এই দারুণ অকালমৃত্যু-স্রোত প্রতিরুদ্ধ না হয়। এ বৎসর পঞ্জাব প্রদেশে মারী-ভয়ের এরূপ দাবানল প্রজ্বলিত যে, স্থানে স্থানে গ্রাম সকল মনুষ্য শূন্য; লোকাভাবে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রেই রহিয়াছে, সংগৃহীত হয় নাই! এই হৃদয়ভেদী দৃশ্য বোধ হয়, ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোন প্রদেশে দৃষ্টিগোচর হইবে না। কেন বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, যখন সমস্ত সভ্যদেশ স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতেছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেই ইউরোপীয় মধ্যযুগের কালনিশা বর্ত্তমান? ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, সে দেশের স্বাস্থ্যহীনতা বর্ত্তমান বঙ্গের অপেক্ষা অল্প ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, মহামারী, টাইফাস জ্বর, ম্যালেরিয়া, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির উপদ্রবে প্রজাসাধারণ অভিভূত। লণ্ডন নগরে প্রতি বৎসর সহস্র অধিবাসীর মধ্যে ৮০ জন কালগ্রাসে পতিত হইত এবং ইহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক সংক্রামকরোগজনিত। এক্ষণে সেই ইংলণ্ডে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের গড় মৃত্যুসংখ্যা প্রতি সহস্র অধিবাসীর মধ্যে বৎসরে অষ্টাদশ মাত্র এবং ইহার চতুর্থাংশ কেবল সংক্রামক রোগসম্ভূত। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল কারণে এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দারিদ্র্য নিবারণ ও শুদ্ধাচারের প্রবর্ত্তন এই দুইটী প্রধান। আমরা দেখিয়াছি, যে দিন হইতে ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইয়া দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মারীভয়জনিত অকালমৃত্যুর বিভীষিকা অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতভূমি বর্ত্তমান সময়ে ঘোর দারিদ্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষ দেশব্যাপ্ত, দেশের অর্দ্ধাংশ লোকের পর্য্যাপ্ত আহার সংগ্রহ হয়না; চারি কোটি অধিবাসী বৎসরের অধিকাংশ কাল অর্দ্ধাশনবা অনশনে দিনযাপন করিতেছে। ভারতের সাধারণ প্রজা যে এরূপ দারিদ্র্যগ্রস্ত, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কেবল এই দারিদ্র্যের কারণ নির্দ্ধারণেই মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি অন্নাভাবে বলহীন ও ভগ্নদেহ সুতরাং সহজে রোগগ্রস্ত এবং অর্থাভাবে অস্বাস্থ্যকর আবাসভূমে, সংকীর্ণ গৃহে, একত্রে বহুজনবাসনিবন্ধন, সংক্রামক রোগ বিস্তারের বিশেষ সহায়। এই জন্য মহামারী ও দারিদ্র্য নিত্যসহচর। যত দিন এই অসহ্য দারিদ্র্য ভারতের সমাজশরীর জীর্ণ করিতে থাকিবে, ততদিন ইহার স্বাস্থ্যোন্নতির আশা নাই। কি রাজনৈতিক, কি সমাজসংস্কারক, কি ধর্ম্মোপদেষ্টা, যিনিই এই দারুণ

সমস্যার মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইবেন, তিনিই প্রকৃত দেশহিতৈষী স্মরণীয় মহাপুরুষ। দারিদ্র্য যেরূপ স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতিবন্ধক, অশুদ্ধাচারও তদ্রূপ। যে সকল অশুদ্ধাচারে পীড়ার বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে, সংস্পর্শ দোষ তাহার মধ্যে প্রধান। এই সংস্পর্শ বা সংসর্গ দোষ পরিহার, শিক্ষা ও অর্থ সাপেক্ষ। দরিদ্র ইচ্ছাসত্বেও সংসর্গ দোষ পরিহারে অক্ষম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অকালমৃত্যু নিবারণের প্রথম সোপান—দারিদ্র্য হইতে মুক্তি লাভ; দ্বিতীয় সোপান—সংসর্গদোষ নিবারণ। বঙ্গদেশ যে ওলাউঠা বসন্তাদির ক্রীড়াভূমি হইয়াছে, সংসর্গদোষের বৃদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ। সংসর্গদোষ কি জন্য সংক্রামক রোগ বিস্তৃতির প্রবল সহায়, তাহা ঐ সকল পীড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

অতি প্রাচীনকালে কি ইউরোপে কি অস্মদ্দেশে মারীভয় উৎপাদক সংক্রামক ব্যাধিমাত্রেই মহামারী নামে অভিহিত হইত। আয়ুর্ব্বেদবক্তা মহর্ষি চরক অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কোনরূপ বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু এই সকল রোগের সাধারণ ধর্ম্ম—বহু লোকের একসময়ে রোগগ্রস্ত হওয়া ও তন্নিবন্ধন মৃত্যুর আধিক্য বশতঃ জনপদ ধ্বংসের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে যে সকল পীড়ায় জনপদ সকল ধ্বংস হইত, তাহারা বিভিন্নলক্ষণ হইলেও "জনপদোদ্ধংসন" বা মহামারী এই সাধারণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপ খণ্ডে বহুকাল ধরিয়া বসন্ত টাইফাস জ্বর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া "প্লেগ" বা "মহামারী" নামে অভিহিত হইত। কি নিমিত্ত একরূপ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জনপদের ধ্বংস সাধিত হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসায় চরকে, ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, "বায়ু, জল, দেশ ও কাল বিপরীত গুণসম্পন্ন হইয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকে। বায়ু প্রভৃতির বৈগুণ্যের মূল অধর্ম্ম। পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্ম সেই অধর্ম্মের কারণ এবং জ্ঞানকৃত অপরাধ এই উভয়ের কারণ।" সুশ্রুতে উল্লিখিত আছে, "শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপযুক্ত কালে না হইলে, ওষধি ও জল বিগুণ হয় ও তাহাদিগের সেবনে রোগ ও মারীভয় উপস্থিত হয়। কখন পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধে বা অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হেতু দেশ ধ্বংস হয়। বিষাক্ত ওষধি ও পুষ্পের প্রবাহেও দেশ এইরূপ আক্রান্ত হইয়া থাকে। গ্রহনক্ষত্রের গতির দ্বারা অথবা শয্যা, আসন, যান, বাহন, মণিরত্ন প্রভৃতি মন্দ লক্ষণ যুক্ত হইলেও মারীভয় উপস্থিত হয়।" মারীভয় প্রাদুর্ভূত হইলে স্থান পরিত্যাগ, শান্তিকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, জপ,

হোম, দয়া, দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বর "ভূতাভিষঙ্গোত্থং" ভূতাদির দৃষ্টিজন্য, মসূরিকা বা বসন্ত রোগ শীতলা দেবীর ইচ্ছায়, বিসূচিকা বা ওলাউঠা কোন রাক্ষসীর ক্রোধে উৎপন্ন হয়, বলিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। চরকের ন্যায় গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রেতিস, দেশ, বায়ু ও জলবৈগুণ্যে মারী-ভয়ের উৎপত্তি অনুমান করিয়াছিলেন। সুশ্রুতের পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধের অনুরূপ, ইহুদিজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে, মারীভয় জিহোবার ক্রোধ হেতু বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, উপবাস, শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা মারীভয়ের কারণ দেবক্রোধপ্রশমনের চেষ্টা করিতেন।

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে মহামারী যে ঈশ্বরকোপসম্ভূত, এ বিশ্বাস বাহুকাল আধিপত্য করিয়াছে এবং ঐশ ক্রোধ উপশমের নিমিত্ত তাহারা মহোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানের বিধান করিতেন। আজিও ভারতের সকল প্রদেশে দেবদেবী পূজা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সংকীর্ত্তনাদি, মহামারী নিবারণের একমাত্র উপায় বলিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। কোন স্থানে মারীভয় প্রাদুর্ভূত হইলে, সহসা এককালে, এক রোগে বহুলোক আক্রান্ত হইতে থাকিলে সহজে এই অনুমান হয় যে, কোন একটী সর্ব্বত্র বিস্তৃত কারণ দ্বারা লোকসাধারণ সমভাবে অভিভূত হইতেছে এবং সেই কারণ, কখন দেবপিশাচাদি অতীন্দ্রিয় শক্তি, কখন গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল কখন বা জলবায়ু প্রভৃতি সাধারণ নৈসর্গিক পদার্থ বলিয়া স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে রোগ বিস্তারের মহাকারণ, সংক্রামকতাদ্বারা যে মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে আশ্রয় করিয়া মহামারী বহু বিস্তৃতি লাভ করে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই সত্য বহুকাল তমসাচ্ছন্ন ছিল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ কোন কোন রোগের সংক্রামকতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুশ্রুত—কাশ, যক্ষ্মা, জ্বর, চর্ম্মরোগ ও নেত্ররোগ সংক্রামক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবমিশ্র বসন্তপীড়া-গ্রস্ত রোগীকে শুচি থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার সংস্পর্শ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল রোগবীজ কি পদার্থ, কাহার সংক্রমণ দ্বারা এক মনুষ্য হইতে অপর মনুষ্যে তদনুরূপ রোগ উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃতি বাষ্প বা কোন

রূপ সূক্ষ্ম, তরল বা কঠিন জড়পদার্থ, রসায়ন বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই। সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তৎপল্লীস্থ অপর ১০ জনকে রোগাক্রান্ত করিয়া থাকে। আবার সেই দশজন শতাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়। এইরূপ অল্পাধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তি সকল সংক্রামক রোগের সাধারণ ধর্ম্ম। সকল দেশে সর্ব্বকালে সংক্রামক রোগের আবির্ভাব সময়ে এ নিয়মের অন্যথা দেখা যায় না। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে আবার শতসহস্র বীজোদ্ভবের ন্যায় সংক্রামক রোগবীজ শত সহস্রে বিভক্ত হইতে থাকে। জীবশক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সহিত এই সাদৃশ্য দর্শন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল রোগবীজ সজীব পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং ইহারা সূক্ষ্ম জীবাণু প্রকৃতিবিশিষ্ট, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। ক্রমে পরীক্ষার উৎকর্ষের সহিত রোগীর রক্তরসাদিতে জীবাণু পরিলক্ষিত হইয়াছে। অবশেষে বৈজ্ঞানিকেরা কোন কোন রোগবীজ জীবাণু, কোন কোনটী বা উদ্ভিদ্‌জাতীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল জীবাণু যে সংক্রামক ব্যাধির মুখ্যকারণ, ইহাদের বর্ত্তমানতা যে রোগবিশেষের কার্য্য নহে, এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কি প্রমাণ প্রয়োগ করেন? প্রথমতঃ, কোন উদ্ভিদাণু কোন রোগের কারণ বলিয়া গৃহীত হইবার পূর্ব্বে সেই রোগগ্রস্ত প্রত্যেকের দেহে সেই বিশেষ উদ্ভিদণুর বর্ত্তমানতা প্রমাণ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, সেই উদ্ভিদণু অন্য কোন সংক্রামক রোগে বর্ত্তমান থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, সেই উদ্ভিদণুকে অপর সমস্ত অবান্তর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া পুনরায় দেহান্তরে প্রবেশ করাইলে, সেই ব্যাধি উৎপন্ন হইবে। এবং চতুর্থতঃ, পরীক্ষিত দেহের রসরক্তাদিতে সেই উদ্ভিদণু প্রত্যক্ষ হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে, কোন উদ্ভিদণু রোগবিশেষের কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। অবশ্য মনুষ্যদেহ লইয়া এরূপ পরীক্ষা অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সংক্রামক ব্যাধি ইতর প্রাণী ও মনুষ্য উভয়কেই পীড়িত করে, তাহাদিগকে এইরূপ পরীক্ষায় সপ্রমাণিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যাধি যে উদ্ভিদণু বা জীবাণু সম্ভূত, তাহা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। মনুষ্যপীড়ক যে সকল সংক্রামক ব্যাধি এইরূপে প্রমাণিত হইতে পারে না, উদ্ভিদণু বা তৎসদৃশ জীবশক্তি যে তাহাদিগেরও কারণ, তাহার বলবৎ প্রমাণ বিদ্যমান

আছে এবং আশা করা যায়, শীঘ্র বা বিলম্বে সকল সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে। ওলাউঠা, মহামারী, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি অনেক সংক্রামক রোগবীজ যে, এইরূপ উদ্ভিদণু বা জীবাণু জাতীয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সংক্রামক রোগীর রস রক্ত মল মূত্রাদি নিহিত এই সকল রোগবীজের সংস্পর্শে ভূমি, জল, বায়ু, গৃহ, শয্যা বস্ত্র, আহারীয় সামগ্রী প্রভৃতি দূষিত হইয়া উঠে এবং এই সকল পদার্থের সাহায্যে সেই বীজ অন্য জীবদেহে সংক্রমিত হইয়া তদনুরূপ রোগ উৎপন্ন করে। মহর্ষি সুশ্রুত যে,—

প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
উপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং ॥

জ্বর, কুষ্ঠ, কাশ, শোষ, নেত্ররোগ, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, আলাপ, সহভোজন প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে সংক্রমিত হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিতেছে। কেন সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শ বা সংসর্গ সেই রোগ বিস্তারের মুখ্যকারণ, পূর্ব্বোল্লিখিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তাহা সহজে বোধগম্য হইবে।

ক্রমশঃ।

রামকৃষ্ণ সমিতি অনাথ ভাণ্ডার।

বহুবাজার ১২নং সার্পেণ্টাইন লেনস্থ রামকৃষ্ণ সমিতির কতিপয় সভ্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্টিত অনাথ ভাণ্ডারের কার্য্য অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। ঐ পল্লীস্থ কতিপয় চরিত্রবান্ সম্ভ্রান্ত যুবক অনাথ ভাণ্ডারের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করিতেছেন। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এই অনাথ ভাণ্ডার সংস্থাপিত হয়। সহায়সম্পত্তিবিহীনা হিন্দু বিধবাদিগকে মাসিক সাহায্য দান ও পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকদিগকে আশ্রয় ও অত্যাবশ্যকীয় জীবনোপযোগী শিক্ষাদান এই অনাথ ভাণ্ডারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ বদ্ধপরিকর হইয়া জনসাধা-

রণের যথেষ্ট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উপস্থিত ১৯টী দরিদ্র হিন্দুবিধবা এই ভাণ্ডার হইতে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন। দারিদ্রদুঃখপীড়িতা এই সকল হিন্দুবিধবাদিগকে সাহায্য প্রদানে ভাণ্ডারের সভ্যগণ সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেছেন। এক্ষণে ১০টী অনাথ আশ্রয়হীন বালক এই অনাথ ভাণ্ডারের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। এই বালকদিগের শিক্ষা এবং ভরণপোষণের সমস্ত ভার ভাণ্ডারের সভ্যগণের উপর ন্যস্ত। এই অনাথ বালকদিগকে রীতিমত শিক্ষাদানে এবং ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। এক একটী আত্মা অনন্ত শক্তির আধার, উপযুক্ত অনুশীলনে সেই শক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।

অনাথ ভাণ্ডারের সমস্ত খরচ কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির মাসিক চাঁদা ও মধ্যে মধ্যে এককালীন দান হইতে চলিতেছে। প্রতি রবিবারে ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ পল্লীস্থ গৃহস্থগণের নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া থাকেন। এই চাউল বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাও ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধনে ব্যবহৃত হয়। এই ভাণ্ডার দ্বারা লোকসমাজের যে মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে, তজ্জন্য ভাণ্ডারের সকল সভ্যগণ—যাঁহারা ইহার উন্নতিকল্পে নিয়মিত সাহায্য দান করিতেছেন—যে তৎকার্য্যানুষ্ঠান জনিত অমৃতময় ফলের ভাগী হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই ভাণ্ডারে দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের এই সাহায্যে ভাণ্ডারের জীবনীশক্তি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে।

ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি সাধনে জনসাধারণের সহানুভূতি ও যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়। ভাগ্যের তরঙ্গে বাহিত হইয়া যাঁহারা সহায়সম্পত্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছেন, এইরূপ দীনদারিদ্রদিগের দুঃখ বিমোচনে সাধারণের যাহা কর্ত্তব্য, অনাথ ভাণ্ডার তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাই প্রতিপালন করিতেছে। যথাসাধ্য শারীরিক ও আর্থিক সাহায্যের দ্বারা যাহাতে অনাথ ভাণ্ডারের মহান্ উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর সফল হয়, তদ্বিষয়ে সকলের সবিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা এই অনাথ ভাণ্ডারের উন্নতি প্রার্থনা করি।

অনাথ ভাণ্ডারের ষান্মাসিক (জানুয়ারি হইতে জুন ১৯০৭) আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয়।

১৯০৬ সালের জের	১১৫৬/১২॥	
বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্তি ...	২০০৲	
চাউল বিক্রয় হইতে ...	৪৩০॥৶১০	
চাঁদা আদায়	২৪৫॥০	
এককালীন দানপ্রাপ্তি	১২১৵০	
সুদ	২৭॥৵০	
		——২১৭৭/২॥

ব্যয়।

বাৎসরিক বিবরণী ছাপাইবার খরচ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ		৮৫॥৵৫
আতুর ও বিধবাদিগকে সাহায্যদান		১৪০৶০

অনাথ আশ্রমের ব্যয় :—

পাচকের বেতন ও বালকদিগের খাই খরচ	১৯৯।৶৫	
বস্ত্রাদি	১৯॥৵১৫	
তৈজসাদি ...	৮/৫	
ঔষধ ...	৪॥৵৭॥	
বাটীভাড়া ...	৯০৲	
পুস্তকাদি ...	৯॥৵০	
শয্যাদি ...	৬৲	
পাথেয় ...	৪॥০	
আলো ও খুচরা খরচ ...	২৫৸৶১০	
		——৩৬৭৸৶২॥০

মোট ব্যয় ৫৯৩৸৭॥০

মজুত	১৫৮৩।১৫
	——২১৭৭/২॥

নির্জ্জনে শান্তি।

(ব্রহ্মচারী তেজনারায়ণ।)

"And this our life, exempt from public haunt
Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones, good in every thing."—Shakespeare.

যিনি কখন জীবনের এক দিনও বিজন বিপিনে বাস করিয়াছেন, তিনিই জানেন, প্রকৃতির সেই নির্জ্জন কন্দরে কত সুখ, কত শান্তি বিরাজ করে। প্রকৃতির এই আনন্দের হাটে যিনি কখন একবারও আনন্দের আশে গিয়াছেন, তিনিই সেই উৎসবের মাঝে পড়িয়া আত্মহারা হইয়াছেন। সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া ইংলণ্ডের কবিপ্রবর বায়রণ কহিয়াছেন—

"There is pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lovely shore,
There is society, where none intrudes
I love not man the less, but nature more."

বাস্তবিকই ভাবুক যখন গুল্মজালাবৃতা, নিবিড় পাদপশ্রেণী সমাকীর্ণা সেই শ্যামলা প্রকৃতি মাঝে বিচরণ করে, তখন তার মনে হয়, যেন সে নূতন আলোকমাখা কি এক নূতন জগতে আসিয়া পড়িয়াছে; চারি ধারে যেন প্রত্যেক অণুতে এক একটী বিরাট্ বিশ্বের অনন্ত উৎস ছুটিয়াছে; প্রতি পল্লবে যেন চৈতন্যের মহাবিকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে; যেন প্রত্যেক তরুটী কি এক অস্ফুট ভাষায় কাহার সহিত আলাপ করিতেছে; বনফুলচয় নভপানে চাহি সাদ্র নয়নে যেন কোন্ ভূমা পুরুষের স্তুতিগান করিতেছে; যেন প্রেমবিহ্বলা গোপবালাদিগের ন্যায় কহিতেছে,—

"জীবন যৌবন ধন সকলি তোমায়!
তুমি প্রভু, নাথ মোর রাখ তব পায়!"

শাখিপরে পাখিসকল যেন কোন অজানিত দেশের অপূর্ব্ব গাথায় দিগন্ত মাতাইতেছে; প্রাণস্পর্শী বিমল সমীরণ যেন কোন অদৃষ্ট লোক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কোন এক অব্যক্ত ভাবরাজ্যে মনকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে; নভপরে তারাগুলি যেন অনন্ত সৌরকর বুকে করিয়া কাঁপিতেছে; ক্রমে যেন সমস্ত জগৎ এক ভাবসমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। পরে

মনে হয়, যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটী ভাবসমষ্টি ; আমি তার কেন্দ্র, আর তার বৃত্ত আস্বর্গ চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপিয়া অনন্তে গিয়া মিশিয়াছে। তখন সেই ভাব-ভোলা প্রাণে পূর্ণানন্দের যে বিমল নির্ঝর প্রবাহিত হয়, হে মানব! তাহার সেই অমিয়-সলিল কত মধুর, কত স্নিগ্ধ, তাহা কি জান? সেই সমগ্র জীবনের সমগ্র সুষমারাশি এক পলকে আসিয়া এক স্থানে একত্রিত হইতে কখন কি দেখিয়াছ? তাই বলি, হে প্রেমিক! যদি কখন হৃদয়মাঝে ঐশ্বরিক বিকাশ না অনুভব করিয়া থাক, যদি কখন মহাশক্তির সেই বিরাট্ নর্ত্তন না দেখিয়া থাক, ত আইস একবার এই লোকালয়ের জনকল্লোলশূন্য, সংসারের বিষবাত-অস্পর্শী, বিমল সৌরকিরণ বিধৌত এই গহন বনে; প্রকৃতির এই মহা সংকীর্ত্তন মাঝে আসিলে বিনা আয়াসে তোমার সে বাসনা পূর্ণ হইবে। সেই নির্ব্বাক্ কবির ভাষাহীন গীতি তোমার প্রাণে বিভুর আবেশ আপনি আনিয়া দিবে, সমগ্র চেতনারাশি তোমার মনের ভিতর আপনি জাগিয়া উঠিবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একান্ত সংযোগ কাহাকে বলে।

যদি তোমার মনে হয়, এ হেন নির্জ্জন প্রদেশে যাইলে তথায় জীবনের সন্তোষদায়ক সঙ্গীর বোধ হয় একান্ত অভাব হইবে, তাহা হইলে জানিও, তোমার ভাস্কর বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যশ্রেণী মাঝে যে মৈত্রীসুখ পাও, তাহা হইতে সহস্রাধিক সুখ এই বিজন কান্তার তোমায় দিতে সক্ষম। পাশ্চাত্য দার্শনিক কবি গেটে (Goethe) যথার্থই কহিয়াছেন—

> "No, thou hast given me into her deep breast
> As into a friend's secret heart to look;
> Hast brought to me the tribes of living things,
> Thus teaching me to recognise and love
> My brothers in still grove, or air, or stream."—
>
> (Faustus)

এই জগতীতলে মানবশরীরে মহাশক্তির যে সকল বিকাশ দেখিতে পাও, নিশ্চয় জানিও, তাহার উদ্বোধন তোমার ঐ জনাকীর্ণ কল্লোলমুখর নগরবাসে সাধিত হয় নাই, উহা এই বিজন শান্তিনিকেতনে মহাসাধনায় সেই আত্মার পরম আবেশ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়াছে। তথায় মনীষিগণ যখন শান্তপ্রাণে জীবনের জটিল রহস্যের গবেষণায় মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন, তখন কুহেলিকা-জাল ছিন্ন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব দিব্যালোকে আপনা আপনি উদ্ভাসিত হয়।

তখন তাঁহারা সেই জ্ঞানময় সিদ্ধান্তরাশির মহাশক্তিতে সমগ্র জগৎকে পরিচালনা করেন। সত্য বটে, জীবনের সর্ব্বক্ষণ মানবপ্রাণ এই স্বর্গীয় বিভায় অবগাহন করিতে পায় না, কিন্তু যেমন নীরব রবাব বীণার লয় তান পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রাণকে, তার মধুরতায় আপ্লুত করিয়া রাখে; সেইরূপ কালান্তরেও সেই আনন্দের ঘোর, সেই অমিয়ময়ের সুধাসিক্ত স্মৃতিরাশি শান্তিরসময়ী সুরতরঙ্গিনীর ন্যায় আজীবন সাধকপ্রাণে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়।

এইরূপে এই নির্জ্জনবাসে চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবজগতে বিচরণ করিয়া যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মাকে পুষ্ট করেন। তাই মহাপুরুষগণ আত্ম-হিতৈষী মানবসকলকে নির্জ্জনবাসের জন্য এত উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, এই চিরশান্তিমাঝে আত্মার ছায়া স্বচ্ছ হৃদযদর্পণে যত পূর্ণতায় পরিস্ফুট হয়, তত স্বার্থপঙ্কিল কুটিলতাময় গুরুভারাক্রান্ত সাংসারিক জীবনে হওয়া অসম্ভব। এই দুস্তর জীবনসমুদ্রে প্রভঞ্জনোত্থিত ফেনিল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত কেবল গভীরতা-বিহীন অসার সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা মৌক্তিকপ্রসূ শুক্তির ন্যায় তাহার অতল জলে বসিয়া নিজ হৃদয়পরে পরম রমণীয় দুর্লভ মুক্তার নির্ম্মাণে সচেষ্ট, তাঁহাদিগকে সেই উর্ম্মিমালার ভীমপ্রকম্পন স্পর্শও করিতে পারে না। জ্ঞানের গভীরতা, হৃদয়ের পূর্ণতা সমাজের ঘূর্ণাবর্ত্তে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব; তাহার জন্য নিস্তব্ধ শান্তি আবাসে ধীর চিন্তাপ্রবাহের প্রয়োজন।

অবশ্য যাঁহারা সংসারের কর্কশ চীৎকারে শ্রুতিসুখকর বীণার ঝংকার শ্রবণ করেন; সমাজের বীভৎস পৈশাচিক তাণ্ডবে আনন্দে উৎফুল্ল হন; জীবনকে কেবল দৈহিক উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়সুখের সমষ্টি বলিয়া জানেন; যাঁহারা বিলাসভবনের হাস্যলাস্যময়ী বিলাসতরঙ্গে দিবারাত্র ভাসমান; অবশ্য সেই সকল মৃগতৃষ্ণিকালুব্ধ নরকুলের এই বিজন বিপিন অতি শুষ্ক, অতি ভয়ানক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা ওই ভ্রূকুটিকুটিল করালাস্য মৃত্যুকে সংসারের মাঝে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছেন, সেই সুধীগণ লোকালয় হইতে পলায়ন করিয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লন এবং তথায় মানসিক প্রবাহকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মধ্যানে পরমা তৃপ্তি উপভোগ করেন। তাঁহারা দেখেন, সংসারে জ্বালা, বনে শান্তি; সমাজে হিংসা দ্বেষ দম্ভ, নির্জ্জনে প্রফুল্লতা পূর্ণতা স্বাধীনতা। নির্জ্জনে চিন্তা-

শীলতা, চিন্তশীলতায় জীবন; আর শান্তি জীবন-নন্দনের মন্দার কুসুম। তাই পরম বিবেকী কবি শিহ্লন মিশ্র কহিয়াছেন,—

"সন্তি স্বাদুফলা বনেষু তরবঃ স্বচ্ছং পয়ো নৈর্ঝরং।
বাসো বল্কলমাশ্রয়ো গিরিগুহা শয্যা লতাপল্লবাঃ॥
আলোকায় নিশাসু চন্দ্রকিরণাঃ সখ্যং কুরঙ্গৈঃ সহ।
স্বাধীনে বিভবেঽপ্যহো সংসারং সেবন্ত ইত্যদ্ভুতম্॥

রূপে সিদ্ধি।

(শ্রীশশিমোহন বসাক এম্ এ)।

তুমি রূপের অলীকতার অসার কথায় প্রতারিত হইওনা। রূপের অনন্ত সিদ্ধি মনুষ্যজীবনের অনন্ত সার্থকতা। রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা; হৃদয়ের আশা পিপাসার অতিমাত্র নিবৃত্তি। রূপ নিরর্থ বা অসার হইলে, জানিনা, মনুষ্য কোন্ আশায় এই সাক্ষাৎ হলাহলময় বসুধাপৃষ্ঠে নিতান্ত নিরাশ্রয় স্বরূপ বিচরণ করিবে! আর, জানিনা, কিরূপেই বা সুখে দুঃখে অবস্থার অনন্ত আবর্ত্তবিবর্ত্তের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসারারণ্যে যার পর নাই অসহায়ের ন্যায় দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিবে!

রূপ প্রেমের নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ বাহ্য অভিব্যক্তি। প্রেমের নিত্যতায় রূপের অসারতা কল্পনা মনুষ্যের বিকট আত্মপ্রতারণা। প্রেম অনন্ত; রূপও অনন্ত। প্রেম প্রাণানন্দ—হৃদয়ের অনন্ত অমৃত—তাই, রূপের পরিকল্পনায় হৃদয়ের উত্তেজনা—প্রাণের উন্মাদনা—আশার গরীয়সী উদ্দীপনা। প্রেমের অমৃত আহ্বান—নিখিলার্থসাধক আকর্ষণ—প্রেমের বলীয়সী প্রণোদনা—মনুষ্যকে অনিবার্য্য ও অপ্রতিবিধেয়রূপে রূপের অনন্ত ও অগাধ মহাসাগরে ভাসাইয়া দেয়। সেই প্রেমের উত্তালতরঙ্গাকুল মহাসাগর যখন উথলিয়া উঠে, জগতের কে তখন ব্যাকুল ও অস্থির না হইয়া মুহূর্ত্তও অবস্থিতি করিতে পারে?

রূপতৃষ্ণা মনুষ্যের স্বভাব সহজাত। রূপে অনন্ত আনন্দ। মনুষ্য আনন্দের সমাশ্রয়েই মনুষ্যত্বের নামে রূপের এত পক্ষপাতী। রূপ মনুষ্যকে আনন্দের অমৃতসাগরে ডুবাইয়া দিয়া তাহাকে দেবত্বের অধিকারী করে।

রূপপিপাসা তাহাকে অনন্তের উৰ্দ্ধরাজ্যে মোহন আহ্বানে আকর্ষণ করে; ক্ষুদ্রত্বের ক্ষীণ পরিধির বিলোপ সঙ্ঘটিত করে; আনন্দের সুধাবর্ষণে তাহাকে আশায় সঞ্জীবিত করে। সেই জন্যই রূপ মানব জীবনের আরাধ্য; রূপ মনুষ্যের অক্ষয় অমৃত; এবং, রূপ প্রাণের নিত্যসেব্য সার্থক সুখাবলম্ব। যেমন বায়ু, জল, মনুষ্যজীবনের মঙ্গল সাধন, রূপপিপাসাও তেমন মানবের অচ্ছেদ্য প্রাণসূত্র। রূপকে অসার বলিও না। রূপ নিরর্থ হইলে জীবন স্বপ্নের কল্পিত অভিধানে আখ্যাত হইত—শ্মশানেরই দ্বিতীয় চিত্রবৎ প্রতিভাত হইত।

রূপে কাব্যের সুখসঙ্গীত। রূপকল্পনা ব্যতীত কাব্যের উপাসনা হয় না। কবি প্রেমারাধনায় ধ্যানস্থ মহাযোগী। কবি প্রেমোন্মাদনার রূপ সৃষ্টি করেন। রূপের প্রাণময়ী উপাসনায় কবি আশার ভুবনপ্রাণ-মোহিনী বার্ত্তায় পৃথিবীকে ধন্য করেন। প্রেমে কাব্যের সৃষ্টি; প্রেমের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম—রূপ-সেবা; অথবা, রূপ-সেবায় আত্মার চরিতার্থতা সংসাধন। কবি আশার কথা কহেন; কেন না, রূপের সার্থকতার সুখবার্ত্তার প্রচারে তিনি প্রেমের পূজা করেন। যে রূপে মোহ আছে আশা নাই, জ্বালা আছে শান্তি নাই, আবেগ আছে তৃপ্তি নাই, তাদৃক্ বিকট ও অনর্থ বস্তুকে রূপের মহীয়সী আখ্যায় বিনির্দ্দিষ্ট করা শব্দশাস্ত্রের শোচনীয় অধঃপাত।

• কবিগুরু প্রেমের অনন্ত উৎস মহর্ষি বাল্মীকি রূপের একপরায়ণা আরাধনায় রামায়ণের জগন্মঙ্গল্যা মহাগীতি গাইয়াছেন। একবার রামায়ণের কেন্দ্রস্বরূপিণী ভুবনারাধ্যা বৈদেহীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। অহো! কি অসাধারণ ভাবমহত্ত্ব! অহো! কি অপূর্ব্ব হৃদয়সুষমা! ভাবের অখণ্ড প্রস্রবণ মহাকবি বাল্মীকি বৈদেহীচরিত্রচিত্রাঙ্কনে যারপরনাই আশাবিহ্বল হইয়াছিলেন। সীতাচরিত্র কাব্যের অনন্ত উৎকর্ষ, কবির চরম সার্থকতা; রূপের পরম আশা—প্রেমের মোহন অমৃত সঙ্গীত। এই রূপে ভোগতৃষ্ণা নাই, আত্মাহুতির অমল সম্পর্কে উহার স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা; আর্ত্তনাদ নাই, উদ্দীপনা আছে; মোহ নাই, প্রাণ আছে; নৈরাশ্য নাই, আনন্দ আছে। উহা স্থির, নিয়ত ধীর এবং প্রশান্ত। সাময়িক আবেগে উহার আবির্ভাব হয় নাই; প্রেমের অটল অচল ভিত্তির উপর উহা অক্ষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। জড়োপাসনার দুর্জ্জয় আহ্বানে মাংসাস্থিময় জড় দেহের উদ্ভ্রান্ত উন্মাদনায়

যে একরূপ অবোধ্য আপাত-মনোরম রূপতৃষ্ণা উদ্দীপিত হয়, উহা মনুষ্যকে উন্নতির উচ্চগ্রামে আকর্ষণ করা দূরে থাকুক, তাহাকে অতীব শোচনীয় ও অপ্রতিবিধেয়রূপে অধঃপাতের অন্ধকার কূপে নিমগ্ন করে। রূপের পূজায় আত্মোৎসর্গের মোহন বিলাস, মহত্ত্বের আনন্দবিকাশ। সীতা রামগতপ্রাণা, প্রেমোপাসনায় ধ্যানময়ী তপস্বিনী। রূপবিহ্বলা বৈদেহী আত্মগত সুখদুঃখ একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। প্রেম ও রূপ এই দুই ব্যবহারিক কথার কোন বৈষম্য আছে কি? প্রেমের পূজায় বৈদেহী সর্ব্বতোভাবে রূপেরই আরাধনা করিয়াছেন। কেন না, রূপপূজার মহাসিদ্ধি স্বরূপ যে সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্জ্জন, সেই পরমা সিদ্ধি লাভে বৈদেহী একেবারেই চরিতার্থ। সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও আপদে, গৃহে ও বনে জাগতিক সর্ব্ববিধ অবস্থাবৈগুণ্যে প্রেমের এবম্বিধ অবিকৃত চিত্র আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। যে তন্ময়তা, যে একনিষ্ঠতা—রূপের পরমোৎকর্ষ, তাহারই আনন্দ সাক্ষাৎকারে জানকী সতত ভাববিবশা। জগতীতলে প্রেমের এবম্বিধ পূর্ণ অমল আলেখ্য আর দ্বিতীয় উদাহৃত হয় নাই; এমন নির্ব্বিকার, এমন প্রশান্ত প্রেমগাম্ভীর্য্য কখনও কি দেখিয়াছ?

ইন্দ্রিয়সম্ভোগের দুর্দ্দম উচ্ছৃঙ্খল আর্ত্তনাদে যে অতি বিরূপ ও বিকট চাঞ্চল্য সঞ্চার হয়, আমরা অনেক বার তাদৃশ ভয়াবহ অস্পৃহনীয় চিত্তবিকারকেই রূপপূজার সর্ব্বার্থা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু যে মহাযজ্ঞে ইন্দ্রিয়সেবার সর্ব্বতোমুখী আহুতি, মেদমাংসের আমূল উৎসাদন, জড়ত্বের একেবারে বিনাশ—জগতে তাদৃশ সুখদ প্রাণদ চিত্র বড় অল্পই দেখিয়াছি। তাই, ধন্য বাল্মীকি, যিনি এমন অপার্থিব চিত্রাঙ্কনে প্রাণের পরিতর্পণ লাভ করিয়াছেন! আর, ধন্য আমরা যে তেমন সুখ-সঙ্গীত শ্রবণে কৃতার্থতা লাভ করিতেছি! সেই একসংস্থা রূপ-পূজা ঐশ্বর্য্যমোহে বিকৃত হয় নাই; সুখপ্রলোভনে বিচলিত হয় নাই—প্রাণভয়ে কদাপি সঙ্কোচ লাভ করে নাই। আমি জীবনে অনেকবার প্রেমের নামে রূপের আরাধনায় অনেককেই বিষাদের উদাসসঙ্গীত গান করিতে শুনিয়াছি। তাঁহারা রূপকে জড়ত্বের সীমাচক্রের মধ্যস্থিত মনে করিয়া—প্রেমকে ইন্দ্রিয়োচ্ছ্বাসের অনভিলষনীয় অনিয়ত বিকট ভাব জ্ঞান করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়সম্ভোগস্পৃহায় যাহার গতি ও সঞ্চার, কেমন করিয়া তাহার স্থিতি ও অবিনাশিতা সম্ভবপর? সেই জন্যই তাদৃশ উন্মত্ত চিত্ত-

বিক্ষেপ ক্ষণিক আবেগে সমুদ্ভূত হইয়া ক্ষণিক আঘাতেই একেবারে শূন্য পথে বিলয় লাভ করিয়াছে। তাঁহারা কখনও প্রমত্তভাবে হাসিয়াছেন; কখনও অসংযত রূপে কাঁদিয়াছেন; কখনও বা উদ্ভ্রান্ত উত্তেজনায় নিতান্ত অনিশ্চিতবৎ সংসারারণ্যে বিচরণ করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের এত দুঃখ, এত নৈরাশ্য। তাঁহারা যদি বুঝিতেন, রূপারাধনায় ইন্দ্রিয়বিকারের আমূল তিরোধান অবশ্যম্ভাবি ও স্বতঃসিদ্ধ, তাহা হইলে তাঁহারা কদাপি ইন্দ্রিয়সেবার মোহ-মদিরায় প্রমোদবিহ্বল হইয়া আত্মপ্রতারিত হইতেন না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, জানকীর তুলনা নাই; রামায়ণ অনুপম; বাল্মীকি প্রেমের অনন্ত ও অগাধ সমুদ্র; এবং বৈদেহী-চরিত্র রূপ-সাধনার অক্ষয় ও অনন্ত সিদ্ধি।

ইউরোপখণ্ডের আর এক জন অতিবড় প্রধান ও প্রাচীন মহাকবি রূপের পূজায় কৃতার্থ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন; তিনিও প্রেমের মোহন আহ্বানে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত ছিলেন; এবং তিনিও রূপসাধনায় সিদ্ধির আনন্দ অমৃত পান করিয়া হৃদয় পরিতর্পণ করিতে আশাবিহ্বল হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্র। তাঁহার নাম হোমার। তাঁহার সাধনা প্রবল হইলেও চরমতা লাভ করে নাই; তাই, তিনি সিদ্ধির আনন্দ সাক্ষাৎ-কারে ধন্য হইতে পারেন নাই। ইলিয়ডের মধ্যবর্ত্তিনী পাপীয়সী হেলেন। হেলেনের প্রমোদবিহ্বলতা—ইন্দ্রিয়াসক্তির পাপ ও উৎকট চিত্র মনুষ্য জাতির অনন্ত অধঃপাত। তাই, বাল্মীকির সহিত তিনি একস্থানে আসীন হইতে সমর্থ হয়েন নাই। যে ইন্দ্রিয়াসক্তিশূন্যতা—যে আত্মোৎসর্গ—যে অবিকৃত প্রেম—যে সর্ব্বতোমুখী আত্মবিস্মৃতি বৈদেহীর জগদ্বন্দ্য অমল চরিত্রের অখণ্ড সুষমা, হোমারের কোন চরিত্রচিত্রে তাহা একেবারেই অবলোকিত হয় না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, সেই পাশ্চাত্য কবিগুরু সাধনার সমুচ্চস্তরে আরূঢ় হইয়াও কি এক অজ্ঞাত মহাশাসনে সিদ্ধির সুদুরা-রোহ মহারাজ্য হইতে অপরিহার্য্য রূপে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। একিলিস ও হেক্টার যেন সেই মহাপাপেরই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপন আপন অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক কালের অতি দূরব্যবধানে জ্ঞানোজ্জ্বল বৈদিক ঋষি ধ্যানস্তিমিত-নয়নে সেই অতীন্দ্রিয় পরমার্থ রূপের জীবনময়ী উপাসনায় বিহ্বল হইয়াছিলেন।

সেই ঋজুহৃদয় ভাববিহ্বল পুরাতন আর্য্যমনীষিবর কখনও অনলে কখনও অনিলে কখনও প্রভাকরে কখনও সৌদামনীবিলসনে কখনও মেঘনিনাদে কখনও আকাশে কখনও সমুদ্রের বিশালতায় কখনও ভগবতী উমাদেবীর সুখ আবির্ভাবে এক অখণ্ড ও অপ্রমেয় রূপের প্রাণময়ী সত্তা উপলব্ধি করিয়া একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। জগতে সেই প্রাণবিমিশ্র অনুপম অমৃত সুখস্তোত্র মনুষ্যহৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে। বেদ রূপের সুন্দর সরসসঙ্গীতে মনুষ্যকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমানা প্রকৃতি যে এক অপরিচ্ছিন্না আনন্দময়ী প্রাণময়ী রূপসত্তার সুখদ সুচারু বিলসন, জ্ঞানের অনন্তভাষ্য সেই মহাগ্রন্থ তাহারই অমৃতময়ী বার্ত্তায় প্রমত্ত মনুষ্যকে আশায় উদ্বোধিত করিয়াছেন। রূপে তাঁহারা প্রেমের বিলাস নিরীক্ষণ করিয়াছেন; প্রেমের পূজায় রূপের তদ্গতধ্যানে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন এবং প্রেমের নিত্যতায় রূপের অক্ষয় চিত্রনে এই নৈরাশ্য-ব্যাকুলা অবনীকে ধন্য করিয়াছেন। সেই রূপপূজায় আনন্দের অমৃত বিলাস, ভোগের ঐকান্তিকী নিবৃত্তি এবং আশ্বাসের প্রাণসঞ্চার। রূপ আরাধনা ব্যতীত যে মনুষ্যজীবনের কৃতার্থতা অলীক স্বপ্ন, এই মহাতত্ত্ব সেই ভাগবত মহাশাস্ত্রে অতি অভ্রান্তরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই, আজ সহস্র সহস্র যুগ যুগান্তের অতি দূর ব্যবধানেও বৈদিক ঋষির মহাবাক্য সমগ্র পৃথিবীর অক্ষয় আলোক।

মহাভারতের মধ্যবর্ত্তী লোকবরেণ্য পার্থের রূপপূজায় আমি অনন্ত ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়াছি। আমি সেই রূপপূজার সার্থকতা স্মরণ করিয়া নৈরাশ্যের তিমিরাচ্ছাদনে আশার সুখ-পুলকসঞ্চার অনুভব করিয়াছি; প্রেমের আরাধনায় সিদ্ধির নিত্যতা বুঝিয়াছি এবং রূপের ধ্যানে প্রেমেরই নিত্যচিত্র নিরীক্ষণ করিয়াছি। পার্থ প্রেমের সুখবিহ্বলতায় সেই বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদেহে কোটী সূর্য্য, কোটী চন্দ্রমা, কোটী তারকা, কোটী কোটী বিদ্যুতের বিলাস-সুষমা অবলোকন করিয়া স্তিমিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। প্রেমে রূপ সৃষ্টি; পার্থের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখ প্রেমের ইয়ত্তা ও পরিচ্ছেদ নাই, তাই রূপের অনন্ততায় পার্থ একেবারেই বিকল ও বিবশ। প্রেমের মহাপরিণামে পার্থ আপনাকে সেই রূপসত্তায় আহুতি প্রদান করিয়াছেন; পার্থ তদ্গত, তন্ময়, সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মাহুতি প্রেমের পূর্ণপরিণতি। তাই অনন্ত প্রেমলোলুপ পার্থ কোটী কোটী অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাবের সহিত সেই বিরাট্ অনন্ত সৌন্দর্য্যপ্রবাহে আপনাকেও ডুবাইয়া

দিয়াছেন। এমন রূপসাধনা বড় অল্পই দেখিয়াছি, এবং রূপের এতাদৃশী আরাধনায় তাদৃশ সমুচ্চ ফলে বড় অল্প লোকই কৃতার্থ হইয়াছে। সেই জন্যই পার্থ-চরিত্র সমগ্র মানব জাতির অখণ্ড আশ্বাস। প্রেমে রূপ সঞ্চার— অদ্বৈততত্ত্বে উহার চরম পরিণতি। পার্থ সেই মহাফলে সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ।

আবার অনন্ত লীলারসরঙ্গভূমি—প্রেমের নিত্যবিলাসক্ষেত্র আনন্দের অক্ষয় অখণ্ড নিকেতন—যমুনাতীরবর্ত্তী বৃন্দাবনের অসংখ্য অবদানচিত্রিতা সুখময়ী অনন্তবৈভবপুলকিতা অনন্তভাব-বিলসিতা অনন্তামৃতবর্ষিণী মহীয়সী গাথা স্মরণ কর। সেই রূপের পূজায় মহাতপস্বিনী জগদারাধ্যা শ্রীকৃষ্ণ-গতপ্রাণা মূর্ত্তিমতী আত্মাহুতি রমণী-কুল-ললাম-স্বরূপিনী প্রেমবিহ্বলা যশোমতী অনন্ত সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রূপের এতাদৃশী মহাপূজা কি জগতে আর কখনও দেখিয়াছ? অথবা, প্রেমের তন্ময়ী পূজায় হৃদয়ের এতাদৃশ দেবদুর্ল্লভ পরিতর্পণের সুখবার্ত্তা কুত্রাপি শুনিয়াছ? আমি যতবার সেই সুখময়ী মহাগীতি শুনিয়াছি, ততবারই যেন এই লোকনিবাস পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের অনন্ত আনন্দ আস্বাদে কৃতার্থ হইয়াছি। যখন গোপালের ভুবন-প্রাণ-বিমোহন নূপুরধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিত, প্রীতির অনন্ত নির্ঝরিণী যশোমতী উন্মত্তা হইতেন; যখন মোহন বেণুরব শুনিতেন, বিহ্বলা হইয়া থাকিতেন; যখন অমৃতমধুর কথা শুনিতেন, একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইতেন। কৃষ্ণ ধ্যান—কৃষ্ণ জ্ঞান—কৃষ্ণ প্রাণ—কৃষ্ণ সর্ব্বস্বধন। কৃষ্ণ ব্যতীত পৃথিবী মহাশ্মশান—ব্রজদুলাল ছাড়া যশোমতী মৃতা। গোপালের মুহূর্ত্ত অদর্শনে যশোমতীর অসীম ব্যাকুলতা। আত্মোৎসর্গ এই মহাদেবীর অমূল্য শক্তি। তাই, রূপপূজার অনন্ত সার্থকতায় তিনি যেরূপ চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন, অবনীতে তাহার তুলনা নাই। আত্মপরায়ণতার নিরবচ্ছিন্ন অভাবে উহা সর্ব্বতোভাবে অদ্বিতীয়। এমন রূপপূজা, রূপের পূজায় প্রেমে সিদ্ধি আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই। বৃন্দাবন প্রেম-মহিমায় মনুষ্যের হৃদয়যোগে নিত্যসেব্য। তুমি শোকী হও অথবা অবস্থার নিদারুণ নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন শাসনে সহস্রধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া থাক; তাহা হইলে, বৃন্দাবন-চন্দ্রের সেই রসসঙ্গীত একবার শ্রবণ কর। তোমার হৃদয়জ্বালা অপগত হইবে; আশার মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিবে; এবং অমেয় আনন্দ লাভে জীবন সহস্ররূপে কৃতার্থ হইবে।

প্রেমবিবশ শ্রীদাম সুবলের অক্ষয় আনন্দরূপিণী মহাকাহিনী শ্রবণ কর। তাঁহারা কৃষ্ণগতপ্রাণ; শয়নে বা গোঠে, গৃহে বা অরণ্যে, নিদ্রায় বা জাগরণে কৃষ্ণব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই জানেন না; কৃষ্ণকথা ছাড়া সবই তাঁহাদের প্রতপ্ত গরলধারা; শ্রীকৃষ্ণের সুখসুন্দর বদনছবি বিনা সকলই তাঁহাদের সারশূন্য নীরস চিত্র। কৃষ্ণের রূপপূজায় তাঁহারা অবসাদে বল পাইয়াছেন, ভয়ে আশা লাভ করিয়াছেন, দুঃখে সান্ত্বনা পাইয়াছেন, বিপদে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই রূপ-পূজায় তাঁহারা শীত-গ্রীষ্ম বিস্মৃত হইয়াছেন; আত্মগত সুখ দুঃখ ভুলিয়াছেন; রোগে শান্তি পাইয়াছেন; অন্ধকারে আলোক দেখিয়াছেন। কৃষ্ণ হাসিলে তাঁহারা হাসিয়াছেন; কৃষ্ণের আনন্দে তাঁহারা উল্লাসে মাতিয়াছেন; কৃষ্ণের প্রতিপদ-বিক্ষেপে তাঁহাদের অসীম জীবন সঞ্চার হইয়াছে। কৃষ্ণ তাঁহাদেব হৃদয়রত্ন, পরমানন্দনিবাস—মস্তকের মণি। কৃষ্ণের অদর্শন তাঁহাদের অনন্ত মৃত্যু; কৃষ্ণের বিষাদ-সঙ্গীত তাঁহাদের অসহ্য তপ্তশলাকা। রূপপূজায়—প্রেমারাধনায় রাখালবালকগণ স্বার্থাহুতির জীবনময় মহিমোদ্ভাসিত অক্ষয় বিগ্রহ। এতাদৃশী তপোময়ী সাধনা বড় দুর্লভ,—আর এবম্ভূতা নিখিলার্থা সিদ্ধিও একেবারেই উপমাশূন্য।

রূপপূজায় বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীরাধা একপরায়ণা তপস্যার প্রাণদা মূর্ত্তি। এতাদৃশী তন্ময়ী বিহ্বলতা, এমন একনিষ্ঠা প্রেমারাধনা সংসারনিবাসে আদি অন্ত শূন্য আনন্দসমুদ্র। তুমি জীবনে যদি সর্ব্বতোমুখী আত্মাহুতির সেই সুখ-সঙ্গীত না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ন্যায় ভাগ্যশূন্য লোকের অবস্থা সত্য সত্যই অতীব শোচনীয়। সেই নিখিলার্থসাধিনী, মহিমময়ী পূজায় আত্মগত ভোগসুখের সর্ব্বাঙ্গীণ বিসর্জ্জন—ইন্দ্রিয়-ক্ষোভের আমূল তিরোধান। সেই প্রেমে, সেই রূপপূজায় কেবল আত্মাহুতি, কেবল অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রবাহ। শ্রীরাধার অগাধ অমল হৃদয়সমুদ্র প্রেমতরঙ্গের সুখাভিঘাতে উত্তাল। যদি সেই প্রেমমহাসাগরে চাঞ্চল্যের কোন আবিল সংস্পর্শ দেখিয়া থাক—যদি সেই মহাপ্রেমে—সেই পরমরূপসাধনায় ইন্দ্রিয়বিকারের কোন ভ্রূভঙ্গী অবলোকন করিয়া থাক—তাহা হইলে তোমার ন্যায় নরাধম জগতে নাই। এমন অমলতা, ভোগস্পৃহা-শূন্যতা, ইন্দ্রিয়শাসনগ্রামের অতিদূরবর্ত্তিনী রূপারাধনা প্রেমের অনন্ত বিজয়-সঙ্গীত। সেই প্রেমগানে বৎসকুল স্তিমিতনেত্রে স্থির রহিয়াছে; সুখবাহিনী

পুণ্য-সলিলা যমুনা বিপরীত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে; বৃক্ষরাজি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে; বন্য পশুযূথ আনন্দে বিচরণ করিয়াছে; হিংস্র জন্তু সকল নৈসর্গিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়াছে; সেই রূপাহ্বানে আলো ও অন্ধকার একীভূত হইয়াছে; শীত গ্রীষ্মের দ্বন্দ্বভাব বিলয় লাভ করিয়াছে; সেই রূপপূজায় আদি মধ্য অন্ত আনন্দসূত্রে অনুস্যূত। পরার্থে আত্মোৎসর্গ—পরার্থা তপস্থার ধ্যানময়ী মূর্ত্তিস্বরূপিণী প্রেমময়ী প্রীতিময়ী পবিত্রতাময়ী শ্রীরাধা, এই দুঃখতমিস্রাবৃত সংসারারণ্যের সুচারু অমৃত ফল। এই মহাপ্রেমের কে ইয়ত্তা করিবে?—এই রূপসাধনায় সিদ্ধির অনন্ততা কে অবধারণ করিবে? তুমি কি একটিবারও সেই মহাগীতি শুনিয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা লাভ করিবে না?

আবার গৌড়ভূমির হৃদয়রত্ন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রূপবিহ্বলতা স্মরণ কর। সেই রূপপূজার দুর্জ্জয় শাসনে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ—ভাবের অগাধ মহাসমুদ্র শ্রীগৌরচন্দ্র পার্থিব যাবতীয় বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়াছেন; সুখ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়াছেন; এবং কি এক অবোধ্য ও অনির্ব্বচনীয় মহাভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। বসুধা সেই প্রেমসঙ্গীতে মোহিত হইয়াছে; মনুষ্য সেই প্রেমবার্ত্তায় আশা পাইয়াছে; তাপীর শান্তি হইয়াছে; হতাশ উল্লাস-পুলকে মাতিয়াছে; পশুজগতে একানুবন্ধিনী মৈত্রী-সঞ্চার হইয়াছে। সেই রূপ-পূজা—প্রাণাধিকা, সরলতার পবিত্রমূর্ত্তি বিষ্ণু-প্রিয়ার আর্ত্তনাদে কদাপি প্রতিহত হয় নাই; গৌরাঙ্গময়ী মহাদেবী শচীর উদাস-বিলাপে ব্যাহত হয় নাই। রূপারাধনার সেই এক প্রতিষ্ঠা উদ্দীপনায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব পথে পথে অহোরাত্র ব্যাকুলহৃদয়ে উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত ভাবে বিচরণ করিয়াছেন। রূপসাধনায়—প্রেমপূজায়—এমন সিদ্ধি কি কখনও শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ?

মহাদেবতা খৃষ্টও রূপসাধনার অমল ও স্থির বিগ্রহ। প্রেমের উত্তাল তরঙ্গাকুল সেই লোকবন্দ্য মহাত্মা রূপপূজায় নির্ব্বিকার ধ্যানস্থ যোগী। সহস্র অত্যাচারেও তাহা স্থির; সহস্র শাসনেও তাহা ধীর; এবং সহস্র পরীক্ষায়ও তাহা সর্ব্বতোভাবেই অক্ষুণ্ণ। এই রূপপূজার অযাচিত অথচ অনিবার্য্য মহাফল অনন্ত সিদ্ধি। সেই জন্যই খৃষ্ট দেবতা—খৃষ্ট প্রেমের পরম মঙ্গল্য হিরণ্য বিগ্রহরূপে মহাসিদ্ধ যোগী।

কুলুকুলুবাহিনী প্রসন্নতোয়া ভাগীরথীতীরে রূপের সাধনে প্রেমের উন্মাদ-

নায় জ্ঞানবিহ্বল মহাযোগী ভাবাকুল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যকথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তাঁহার অনুপম সুচারু-চরিত্র-সুষমা সমগ্র জগৎকে বিমোহিত করিয়াছে। এমন সাধনা, এমন রূপপূজা, এমন প্রেমারাধনা জগতে সম্পূর্ণ অভিনব। পৃথিবীর অবসাদ—আলস্য—জড়তা—অন্ধকার সেই মহাজ্যোতির আবির্ভাবে শূন্যপথে বিলীন হইয়াছে। মুহূর্ত্ত তাঁহার নাম স্মরণে যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত পাপ-রাশি, সূর্য্যোদয়ে নৈশ অন্ধকারের, অথবা সুদীর্ঘ নিদ্রার অবসাদের পর মধুর প্রাণবিমিশ্র জাগরণের ন্যায়, কোথায় চলিয়া যায়। সহস্র সহস্র নর নারী--সংসারচক্রের আবর্ত্তবিবর্ত্তনে বিলোড়িত হইয়া অকস্মাৎ তাঁহার সমাশ্বাসময়ী অমৃতবাণী শ্রবণে, অতল আনন্দহ্রদে অবগাহন করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কে? কে তাঁহাকে বুঝিবে? কে তাঁহার অগাধ রূপসাধনার সীমা অবধারণ করিবে? রামকৃষ্ণ—রূপসাগরে রাত্রিন্দিব নিমগ্ন, প্রেম-পূজায় নিয়ত বিভোর—ভাবাবেশে তদ্গত। রূপপূজায় রামকৃষ্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন—কামিনী কাঞ্চনের সুদুর্নোচ্য আকর্ষণ শতধা ছিন্ন করিয়াছেন—জড়দেহের বন্ধন ভাঙ্গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ শুদ্ধ—শান্ত—অপাপবিদ্ধ—সত্য—শিব—সুন্দর; নিরন্তর সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিয়াছেন—কখনও হাসিয়াছেন, কখনও উন্মত্ত নৃত্য করিয়াছেন—কখনও বিশ্বরূপিণী আনন্দময়ীর নামে কাঁদিয়াছেন। এমন যোগ, এমন রূপসাধনা জগতের অতুল ও পরম বৈভব। সেই দেবারাধ্য চরিত্রচন্দ্রের সুখবিলসনে জগতে, ধমনীতে ধমনীতে নূতন প্রাণসঞ্চার অনুভূত হইতেছে। পৃথিবী যেন নূতনভাবে সঞ্জীবিত হইতেছে। তিনি সরলতায় স্বভাবের শিশু, রূপ-সাধনায় কঠোরতপাঃ যোগী, প্রেমারাধনায় সতত স্থির ও ধীর। তিনি প্রেমে প্রমত্ত, রূপে বিহ্বল, আনন্দময়ী জননীর রূপসাগরে আপনাকে ডুবাইয়া কি এক অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ভাবাবেশে সমাবিষ্ট। সেই যোগেশ্বর, সেই প্রেমিকরাজরাজ হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করিয়াছেন যে, রূপপূজায় সিদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ; কেননা, প্রেম নিত্য ও সত্য; প্রেমে রূপের পূজা। প্রেমের নামে কেমন করিয়া রূপপূজার অসারতা ক্ষণতরেও পরিকল্পিত হইতে পারে? এই মহাসত্য প্রতিপাদন করিবার জন্যই সংশয়বাদ—নাস্তিকতা—শূন্যবাদের নিষ্পেষণে চূর্ণীকৃত পৃথিবীতে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন—অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়াছেন—প্রেম নিত্য রূপ মহাসাধনা—প্রেমের নিত্যতায় রূপসাধনায় মানবের অনন্তসিদ্ধি।

তাই বলি এস ভ্রাতৃগণ! এস শোকতাপগ্রস্ত মানব! একবার প্রাণ ভরিয়া হৃদয় খুলিয়া রূপের আরাধনায় কৃতার্থ হই; একবার আনন্দময়ী জননীর অনন্ত রূপসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অমৃতত্ব লাভ করি। তুমি মনুষ্য—রূপসাধনা মনুষ্যের পরম অধিকার। তুমি সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট্ রূপসাগরের একটী তরঙ্গ—তরঙ্গ সাগর হইতে কিছুতেই বিভিন্ন নহে। তরঙ্গ ও সাগরের ভেদচিন্তা অবোধ কষ্টকল্পনা। তুমি ভীত হইও না। উন্নতির চরম পরিণামে তুমি অনন্তের অনন্ত বিস্তারে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিবে। রূপসাধনা তোমার নিরর্থা হইবে না। অগ্রসর হও। প্রেম সত্য। রূপও সত্য। হতাশ হইও না। প্রেমের পূজা কর। রূপের সাধনা কর। অন্তিমে সিদ্ধির আনন্দ সাক্ষাৎকারে ধন্য হইবে।

কাল ও কালী।

— ০ —

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ)

জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত আমরা শাস্ত্রমুখে অবগত আছি, সেই বিচারিত মতগুলি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই,—আমাদের জন্মস্থিতিমৃত্যু দৃষ্টেই উক্তরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তবাদ প্রচারিত হইয়াছে। মানুষ জন্মিতেছে, বাল্য-যৌবন-জরার মধ্য দিয়া মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছে। সুতরাং মানুষ ভাবে, এ জগতেরও একদিন জন্ম হইয়াছে, পঞ্চভূতসংঘাতে নানারূপ তরঙ্গিত হইতেছে, আবার অন্তিমে আমাদের মতই লয় হইয়া যাইবে। কেহ জগৎ জন্মিতে দেখে নাই; কেহ ইহার নিঃশেষে লয়ও দেখিবে না। "ব্যক্ত-মধ্যানি ভারত" বলিয়া ভগবান্ গীতামুখে অর্জ্জুনকে আদি ও অন্ত 'অব্যক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা সমষ্টি জগৎ বা বিরাটে এবং ব্যষ্টিজগৎ বা প্রতি জীবে সমভাবে প্রযুজ্য।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাহা প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিষয়। ভারতবর্ষীয় দর্শনকারগণ যদিও প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টিরহস্যভেদে নানারূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি আস্তিক দর্শন মাত্রেই মুখ্য-

ভাবে অধ্যাত্মপর—'আমি কে?' এই প্রশ্নের সমাধানে যত্নশীল। চিরদিন মানুষ ইহার বিচার করিয়া আসিতেছে; চিরদিনই মানুষ ইহার বিচার করিবে।

অনেক লোক অতীতের স্মৃতি ভালবাসে। অনেকে আবার ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আলো দেখিতে চায়। কিন্তু আশুবিমোহন জগৎদৃশ্যে অধিকাংশ মানব বিমুগ্ধচিত্ত—অতীত বা ভাবী পরিণাম ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই। শৈশবের স্মৃতি সকলেই ভালবাসে। বর্ত্তমান ভোগেচ্ছা মানুষকে উন্মাদ করে। ভবিষ্যতের বিশালরাজ্যে চাহিতে সকলেই ভীত হয়। যাহারা অতীত বিষয় লইয়া আলোচনা করে, তাহারা প্রায়ই অতীত-গৌরববাদী (Pessimist), যাহারা বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত, তাহারা কর্ম্মপ্রবণ ও জগন্নিত্যবাদী (Positivist) এবং যাহারা ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তাপর, তাহারা প্রায়ই ভাবী উন্নতিবাদী (Optimist)।

প্রাচীন আচার পদ্ধতি রীতি নীতি অনুসরণে একান্তনিষ্ঠ জনগণ ভবিষ্যৎ চিন্তাপর দার্শনিকদিগের প্রতি সর্ব্বদাই কটাক্ষ করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজে আমরা তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ প্রায় সকলকেই আচারহীন বলিয়া উপহাস করেন। আমি শুনিয়াছি, এতদ্দেশীয় বড় বড় দার্শনিকগণ এই আচারনিষ্ঠ আর্য্য সন্তানগণের নিকট নাস্তিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যাহারা বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত, তাহারা প্রয়োজন মত কতকটা প্রাচীনবাদীর আবার কতকটা ভাবী চিন্তাশীল দার্শনিকদিগের মত অবলম্বন করিয়া উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। পক্ষান্তরে বিচারশীল দার্শনিকগণ, যাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রহেলিকা ভেদে নিয়ত চিন্তাপর, তাঁহারা প্রাচীন আচারাদিকে অথবা বর্ত্তমান জীবনের উদ্দাম উন্মত্ততাকে উদাসীনভাবেই অবলোকন করিয়া থাকেন।

আদিম অবস্থায় মানুষ মৃগমাংসে উদরপূর্ত্তি করিত; মৃগচর্ম্ম পরিধান করিত; কুশ ছড়াইয়া আসন করিত। এখন ঐ গুলি মহাপবিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা প্রাচীন সুতরাং আচারাঙ্গ। প্রাচীনকালে বালকদিগকে গুরুগৃহে বেদপাঠ জন্য "উপনীত" করা হইত; এখনও সে আচারের জীর্ণকঙ্কাল বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়; উপনয়ন ক্রিয়া এখন 'যজ্ঞসূত্রে' পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ হিন্দু বলিতেছেন—ইহাই যথার্থ 'ধর্ম্ম'। ইহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় করিলেই তুমি অনার্য্য—

অহিন্দু। কাশীতে অবস্থান কালে উপাধ্যায় একদিন বলিলেন, গোক্ষুর-পরিমিত শিখা না রাখিলে সে ব্রাহ্মণই নহে। তখনি বুঝিলাম, আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই দীর্ঘ বেণী রাখিতেন, তাহার পরিণতি এখন গোক্ষুর-শিখায় পর্য্যাপ্ত। তিলকাদি ছিটা ফোঁটার চিহ্ন প্রাচীন সর্ব্বাঙ্গলিপ্ত বিভিন্ন বর্ণাদিরই পরিণতি কি না পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। এবম্বিধ দৃষ্টান্তে পাঠকগণ বুঝিয়াছেন, অতীতগৌরববাদী জনগণ যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মাচার বলিয়া তদনুসারেই জীবন গঠন করিতে যত্নপর হন। হিন্দু পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রাদি ইঁহাদের মতপোষক যন্ত্র। এই সকল শাস্ত্রোক্ত পন্থায় একান্তনিষ্ঠ হইয়া চলিলে যে যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ হয়, তাহাতে আমাদের সন্দেহ না থাকিলেও ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন আচার রীতি নীতি বর্ত্তমান থাকায় একমাত্র আত্মজ্ঞান—যাহাতে সর্ব্বজীবের সমানাধিকার—তাহাই জীবনের একমাত্র অন্বেষ্টব্য। দেশকালপাত্র অনুসারে আচার ব্যবহার ভিন্নরূপ হয়। কিন্তু "আমি কে" এই বিচার চিরদিন একরূপ চলিতেছে ও চলিবে। সুতরাং যাহারা অতীত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জীবনকে তদনুরূপ আদর্শে গঠিত করিতে চায়, তাহারা তদনুরূপ চেষ্টাপর হউক—আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সে যেন আমার বিচারের পরিপন্থী না হয়। "আমার পূর্ব্বপুরুষ বড় মানুষ ছিলেন, আমি এখন পরমুখাপেক্ষী—ভিখারী"—এ অভিমানে বিশেষ কিছু ফল আছে বলিয়া আমার বোধগম্য হয়না।

প্রাচীন গৌরব মতপোষকগণ প্রায়ই তামসিক প্রকৃতি। ঐহিক বা ভাবী জীবনসমস্যার সমাধানে তাঁহাদের আগ্রহ দেখা যায় না। পাড়াগাঁয়ে দেখিয়াছি, এই আর্য্যধর্ম্মের ধ্বজাধারিগণ "অগ্রে বাঁ পায়ে কি ডান পায়ে জল দিতে হইবে", এই তর্কে দিবসের অর্দ্ধেক কাটাইয়া দেন। কতকগুলি স্মৃতির আচার, কতকগুলি দেশাচার বা স্ত্রী আচার ইঁহাদের ধর্ম্মের সূত্র-স্বরূপ। ইঁহাদের কথায় প্রাণ নাই, আচারে অনুরাগ নাই, মুখে প্রতিভা নাই, জীবনে উদ্যম নাই—প্রাচীন গৌরবস্তম্ভের ভগ্নস্তূপ স্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ইঁহারা যেন মৃত্যুর ছায়ায় দণ্ডায়মান। যেন প্রদীপের ক্ষীণা-লোকে প্রাণশূন্য জীর্ণকঙ্কালগুলি অর্দ্ধনিদ্রিত। ইঁহারা জগতের ইতিহাস জানেন না, বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামের খবর রাখেন না—আহার নিদ্রা মৈথুন—ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রে—পশ্বাচার বলিয়া বোধ হয়, বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানদর্শী রাজসিকভাবে অনুপ্রাণিত। কর্ম্মশীল—ভোগের জন্য। এই দেহসর্ব্বস্ব জীবগণ স্ত্রীঅন্নাদি লাভে ব্যাকুলচিত্ত। সত্যমিথ্যায় মিশ্রিত কখন বা দৈব কখন বা পুরুষকার বিশ্বাসী এই বর্ত্তমানদর্শী জীবকুল জীবন-সংগ্রামের রহস্য কতকটা যেন বুঝিয়াছেন। বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজরীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য অপরাবিদ্যার উন্নতি এই বর্ত্তমানদর্শিগণের উদ্দেশ্য। ইহারা পেছনের দিকে চাহে না, ভবিষ্যতের জন্যও ভাবে না। যেন সেনাপতির আদেশে যুদ্ধে চলিয়াছে; অগ্রপশ্চাৎ দেখিবার তাহার অবসর নাই। 'আমি কে' ভাবিবার সময় নাই। কার্য্য করিয়া যাই-তেছে; কিন্তু নিজ ভোগের জন্য—আত্মতৃপ্তির জন্য। ইহাদের চেষ্টা ও যত্ন প্রসূত তত্ত্বগুলি আধুনিক জগতে সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহারা সামাজিক ও গৃহস্থাশ্রমী।

ভবিষ্যতের অন্তস্তলে যে সকল অনাদি সত্য রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে ব্যাকুলচিত্ত জনগণ সত্ত্বপ্রধান—দার্শনিক—মহাকর্ম্মপ্রবণ—আশ্রমত্যাগী। ইঁহারা ভূত ও বর্ত্তমান জীবন তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়াছেন। অসীম ভাবী জীবন ইঁহাদের চিন্তাক্ষেত্র। অসীম ভাবী রাজ্য—যাহাতে অনাদি কাল হইতে কত অযুতাযুত প্রাণী প্রবেশ করিয়া আর কোন সংবাদ দিতে পারে না,—তাহারই যবনিকা উত্তোলনে ইঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যত্নশীল। সে চিন্তাশীলতা তাঁহাদিগকে ও জগতের জনগণকে ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছে। যাঁহারা এই ভাবী জীবন রহস্য ভেদে সফল হইয়াছেন, তাঁহারাই জগতের নেতা—অবতার—Prophet। ইঁহারা অনাশ্রমী, অসাংপ্রদায়িক, জগদ্ধিতকারী—অন্ধকারে আলোকস্তম্ভ—অহেতুকদয়াসিন্ধু—পরহিতে জীবনধারণশীল। ইঁহাদেরই উড্ডীন পতাকার নিম্নে সহস্র সহস্র নরনারী একত্রিত হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় সূচনা করে।

এই অন্নপানাদিবর্দ্ধিত শরীর, এই রেতোরক্তসংঘাত দেহপঞ্জর, যাহা প্রকৃতির নিয়মে অবশ্যম্ভাবী লয়মুখে অগ্রসর হইতেছে, ইহার আদি কোথায়, ইহার পরিণতি কোথায়, এ চিন্তা সকল জীবেই অন্ততঃ ক্ষণেকের তরেও স্ফুরিত হয়। জ্ঞানপ্রবণ জীবগণে এই চিন্তার স্ফুরণ অত্যধিক। এইজন্য ইঁহারা ভবিষ্যতের অন্তস্তলে কি আছে, জানিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত। এই জন্য ভবিষ্যদ্দর্শী জ্ঞানী, বর্ত্তমানদর্শী কর্ম্মী এবং অতীতদর্শী অধিকাংশ স্থলেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্ত। আমরা প্রত্যেক মনুষ্যজীবন আলোচনা করি-

লেও দেখিতে পাই, বাল্য বা অতীত কাল অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, বর্ত্তমান জীবন উদ্দামতাতাণ্ডবপূর্ণ কর্ম্মবৈচিত্র্যে নিরতিশয় ব্যস্ততাপূর্ণ এবং ভাবী কাল জীবনসমস্যাসম্পূরণের অবসর প্রদান করে। বাল্যের এই অব্যক্ত ভাবে ব্রহ্মার, বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামে বিষ্ণুর এবং ভবিষ্যৎ জীবনের অব্যক্ত রাজ্যে জ্ঞানশরীর মহাদেবের অধিকার। ইহাই Indian Trinity

স্বীয় স্বীয় জীবনের আলোচনা করিয়া, এই শরীরের ক্রমপরিবর্ত্তন দেখিয়া, মানুষ আপনাতে যে বাল্য যৌবনত্ব ও বৃদ্ধত্বাদির আরোপ করে, তাহাই ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কাল বলিয়া উক্ত হয়। এই ব্যক্তিগত কালত্বই সমষ্টি জগতে অতীত বর্ত্তমান অনাগত কল্পাদি কল্পনার সহায়কারী হয়।

সূর্য্যের উদয়াস্তরূপ কল্পনা কালের জন্মদাতা। তাই কাল 'রবিসুত' বলিয়া কথিত হয়। রবিসুত কিনা সূর্য্য হইতে জাত। যদিও সুদূরস্থিত গ্রহনক্ষত্র ও পৃথিবীর গতি হইতে কালের আংশিক আভাস পাওয়া যায়, তথাপি সূর্য্যের আধ্যাসিক গতাগতি হইতেই জগতে কালের জন্ম হইয়াছে। এই বহিঃস্থ কাল আবার জীবের জন্মস্থিতিলয়রূপ পরিবর্ত্তনে মিশ্রিত হইয়া—অন্যোন্যাধ্যস্ত হইয়া মানুষকে 'কালের' বিষয় বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। এই কাল পুরাণাদিতে মহাকাল, মৃত্যু, যম, রুদ্র, বৈবস্বত, কল্প ও অন্যান্য নামে অভিহিত হয়। মানুষের অজ্ঞতা বা অল্পজ্ঞত্বই কালকে এত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। নতুবা যাহার অস্তিত্ব আধ্যাসিক, দৃঢ় মনঃসংযোগে যাহার আভাস পাওয়া যায় না, তাহার নামে মানুষ ভীত হয় কেন? অতীতদর্শী কালের নামে শিহরিয়া উঠে! কর্ম্মসংগ্রামে ব্যস্ত বর্ত্তমানবাদী জীবনের অযুত সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভেও কালের নামে অবসন্ন হয়। ভবিষ্যদ্দর্শীর কাছে কাল করযোড়ে দণ্ডায়মান—থরহরি কম্পমান—"মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" শ্রুতির নির্দ্দেশ।

মানুষের চেষ্টা—সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এই কালের হস্ত হইতে—কালের শাসন হইতে—মুক্ত হওয়ার জন্য প্রযুক্ত। ষষ্ঠী মাকালের পূজা হইতে বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি জলদনির্ঘোষ সকলই এই কালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। দণ্ডোদ্যতকর মহাকালও বিচলিত হইবার নহে। সর্ব্বগ্রাসী কালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। তাই গীতায়—অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে,—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"—আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলাসূচক কাল সর্ব্বব্যাপি—অনাদি—ব্রহ্মজ্ঞপ্তির পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত স্থায়ী। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ইহা নিত্য পদার্থ। বেদান্ত মতে আধ্যাসিক বা মিথ্যা। ইহা অজ্ঞতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; স্বস্বরূপাবাপ্তির তীব্র আলোকে কালের ছায়াও থাকে না।

এই "Idea of Time" বা কাল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া মৃত্যুভয়ে ভীত হয়; শরীরপঞ্জর ত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ করে; কারণ, এই ভূতবিকার শরীরটাকেই জীব আপন বলিয়া জানে। এই পঞ্চকোষাতীত আত্মার স্বরূপ না জানিতে পারায় জীবের কালভয়—মৃত্যুভয়। আত্মজ্ঞানে জীব অভয়ের পার প্রাপ্ত হয়। কালের কণ্ঠে অসি-প্রহারে আত্মজ্ঞ জীব কালের হনন করিয়া নির্ভয়ে বলে, "জয় কালী" "জয় কালী"! এই আত্মজ্ঞানই কালের নির্হন্ত্রী।

এই আত্মজ্ঞান বা স্বস্বরূপপ্রাপ্তি হওয়ামাত্র কাল গতচেতন-মুহ্যমান হইয়া পড়েন—জ্ঞানশক্তি—শাণিতখড়্গহস্তা—তাহার বুকে নৃত্য করেন। ভৈরবের মহাভৈরবী, ভীতির মহাভীতি মহাকালী দিক্‌দেশনিমিত্ততার উপর নৃত্য করিয়া উহাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। কোথায় বা চন্দ্র সূর্য্য—কোথায় বা গ্রহ নক্ষত্র। মহাকালীর ভীমতাণ্ডবে সৃষ্টি পরমাণুগত—দৃশ্য নাই—দ্রষ্টা নাই—দৃষ্টিও নাই। সব একাকার—শিব শবরূপে পরিণত—সংসার শ্মশান—আমিত্ব তুমিত্ব সকলি একত্বে পর্য্যাপ্ত। এই মহালয়ে কে কার খবর রাখে? মহাকালীতে সকলি লয়গত।

অতীত বা বর্ত্তমানদর্শী এই লীলাতাণ্ডবে ভীত হইয়া মহাকালীর দক্ষ হস্তদ্বয় দেখিতে চায়। বলে,—'রক্ষ রক্ষ'। ভবিষ্যদ্দর্শী মহামায়ের সব্য হস্তের উত্তোলিত অসির দিকে কণ্ঠ বাড়াইয়া দিয়া বলে, 'এই নে মা, আমি তোর জগদিন্দ্রজাল ভেদ করিয়া তোর চরণে জন্মের মত বলি হইতে আসিয়াছি। আমি অভয়ের পারে এসেছি। আমার দেহাত্মবুদ্ধির উচ্ছেদ হইয়াছে। আমার মুণ্ড ছিন্ন করিয়া তুই করে ধারণ কর্।'

মহালয়—মহাশ্মশান—চিতাবিভূতি—ইহাই ভবিষ্যদ্দর্শীর সাধন সহায়। ফেরুচীৎকার, শবসঙ্ঘাত, রুধিরাক্ত রণভূমি, রোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, ও ধ্বংসের তাণ্ডবে ভবিষ্যদ্দর্শীর আনন্দ—সে সকলকে অনায়াসে আলিঙ্গন করিয়া—দুঃখেতে সুখের ছায়া দেখিতে পায়। এই ভবিষ্যদ্দর্শীই বীরপদবাচ্য কৌল। কারণানন্দে সে কার্য্যকারণাতীত হয়। তার "উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" আত্মজ্ঞানে পরাপ্রকৃতি তার

বশীভূতা। ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা জীব পরমাত্মার সমীকরণবশতঃ মহা-মৈথুনে তাহার শিবত্ব লাভ হয়। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত মৎস্যমাংস আহারে তাহার দেহরক্ষা—সে বিধিনিষেধের অতীত। ইহাই বীরের পঞ্চমকার সাধনা। ইহাই যথার্থ কালীপূজা।

তিব্বতে তিন বৎসর।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [স্বামী অখণ্ডানন্দ।

শ্রীকেদার শৈলের পাদমূলে উপনীত হইয়া আমি যে পরমাদ্ভুত মহান্ বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, এত দিন হিমালয়ের আর কোথাও আমি সেরূপ দেখি নাই। হরপার্ব্বতীর প্রিয় বিলাসনিকেতন শ্রীকেদার শৈলের মহত্ত্ব ও চমৎকারিতায় আমি যেরূপ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলাম এবং ৺কেদারে পঁহু-ছিয়াই আমি যেমন সহজে গিরিরাজের সহিত খোলাখুলি ভাবে মিলিত হই-লাম, তেমনটী আর কোথাও হই নাই। ৺গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াও হিমালয়ের এমন অপার ও চমৎকার দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। ৺কেদারনাথে পঁহুছিয়া আমি যে মহান্ অদ্ভুত ও রমণীয় দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমি ইহাই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, হিমালয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাকে বহুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া তাহার অতি নিভৃত ও দুর্গম স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। ৺কেদারনাথে পঁহুছিয়াই আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, "হিমালয় দর্শন" অতি সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, বা তাহা কেবল হিমালয়ের দুই চারিটী তীর্থ বা প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিলেই হয় না। হিমালয় সম্বন্ধে এত দিন আমার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা ৺কেদারে পৌঁছিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাব ধারণ করিল। হিমালয় যে, আমার ধারণার অতীত, অসংখ্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ, এবং তাঁহার মহত্ত্ব ও বিচিত্রতা যে, ৺কেদারেই শত সহস্র গুণে বিকশিত দেখিতে পাইব, ইতঃপূর্ব্বে আমি তাহা একবারও ভাবিতে পারি নাই। হিমালয় দর্শন করিয়া এতদিন তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও যে, তিনি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ এবং তাঁহার প্রকৃত মহিমার ব্যাপকতা যে, আমার কল্পনার অতীত, শ্রীকেদার

শৈলের পাদমূলে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই আমি তাহার যাথার্থ্য অনুভব করিলাম এবং পদে পদে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম এবং ইহাও বুঝিলাম যে, এই মহামহিমাময় মহীধর, মনুষ্যের অজ্ঞাত বহু অদ্ভুত তত্ত্বে সদা পূর্ণ এবং কল্পনাশক্তির অতীত, অনির্ব্বচনীয়প্রভাবসম্পন্ন, এক অতি অদ্ভুত, দিব্য ধাম রচনা করিয়া চিরকালই মর্ত্ত্যের অগম্য ও অগোচর হইয়া আছেন। মনুষ্যের অগম্য এমন অদ্ভুত দিব্যধাম যে, হিমালয়ে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং যে পবিত্র দিব্যধামে পরম পুরুষ সদাশিবের সহিত সদা বিহার করেন, তাহার মহিমা অবধারণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। হরগৌরীর মহামিলনভূমি হিমালয় বা পুরুষ প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশস্থল হিমাদ্রির অপার ও অনন্ত মহিমায় সম্যক্ অভিভূত হইয়া আমি কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে, সেই "এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের" যেমন "ইতি" হয় না, তেমনি বুঝি এই মহাগিরিপ্রধানেরও "ইতি" করা যায় না। অনন্ত রূপ ও ভাবসমষ্টির আধার এবং অসংখ্য বিস্ময়কর পদার্থে পূর্ণ হিমালয়, আমার চক্ষে নিত্যই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া আরও কত অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য আমার মন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আর মনে হইল যে, যেন আমাকে এই পরম ধাম পরিত্যাগ করিয়া আর কখনও সেই ঘোর অশান্তিপূর্ণ লোকালয়ে না যাইতে হয়, এবং চিরকালই যেন গিরিরাজের অনন্ত রূপ ও অপার মহিমায় আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে পারি।

শ্রীকেদার শৃঙ্গের অপূর্ব্ব মহান্ বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার মনে হইল যেন, মহাশক্তিমান্ হিমালয়ের সমোচ্চ তুষারময় শৃঙ্গগুলি, গিরিরাজের অসংখ্য শাণিত, তীক্ষ্ণ, অব্যর্থ মহাস্ত্রের ন্যায়, সসাগরা ধরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বহু কোটি যোজন বিস্তীর্ণ, গগনমণ্ডলব্যাপী, মর্ত্ত্যের অগোচর স্বর্গ-লোককেও তাঁহার অতুল মহিমা দেখাইবার জন্য রসাতল ভেদ করিয়া সদর্পে বহু ঊর্দ্ধে ধাবিত হইয়াছেন! এবং মানবীয় শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অন্তরালে এই অতি অদ্ভুত দিব্যরাজ্যের পত্তন করিয়া রাখিয়া-ছেন! স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আর কোথাও এমন অদ্ভুত ও চমৎকার দৃশ্য আর আছে কি না বলিতে পারি না। যে মহান্ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের সানুদেশে বাবা কেদারনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, আমূল তুষারমণ্ডিত হইয়াও প্রচণ্ড গ্রীষ্মোত্তাপে তুষার-বিগলিত-কায় হওয়ায়, তাহার যে যে স্থল বাহির হইয়া

পড়িয়াছে, তাহাও দূর হইতে ঠিক যেন কাঞ্চনময় বলিয়া বোধ হইল। গিরিরাজের সেই দিব্যোজ্জ্বল, পরম সুন্দর, নির্ম্মল, সুবিশাল বপু দর্শন করিয়া তাহা কেবল বিবিধ মণিমাণিক্যে বিনির্ম্মিত বলিয়াই অনুভূত হইতে লাগিল।

সে যাহা হউক, শ্রীকেদারনাথের সুপ্রশস্ত, মহান্ দিব্যধামে উপস্থিত হইয়া আমি গিরিবরের প্রকৃত মহিমার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া পরমানন্দিত হইলাম এবং এত দিন যে, আমি কেবল তাঁহার বহিরাবরণ মাত্র দেখিতেছিলাম ও তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান যে আমার হয় নাই, তাহাও আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমাদ্ভুত ও অচিন্তনীয় বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এক দিন মহাভাগ অর্জ্জুনের যে অবস্থা হইয়াছিল, ৺কেদারে নগাধিপের সেই অনন্ত-ভাবময় দিব্য সুবিশাল মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া আমারও যেন কতকটা সেইরূপ অবস্থা হইল। দিব্য-দর্শন গিরিরাজকে যেন এখানে যথার্থ ই সেই এক অনাদি, অনন্ত, মহান্ চৈতন্য সত্তারই মহা স্থূল অভিব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়াতীত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মাই যে, অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মোহাচ্ছন্ন মানবকে অসীম ও অনন্তের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাকে স্বকীয় অপার মহিমা ও অনন্ত বিভূতি প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই ধরণীতে এই মহাগিরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার অপার করুণার অজস্র ধারায় দিগন্ত প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। করুণরসার্দ্রচিত্ত অর্জ্জুনের মোহাপনোদন করিয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ যেমন এক দিন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, অসীম ও অনন্তের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া মানবাত্মার পরম কল্যাণ সাধন করিবার জন্যই তেমনি সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরম গুহ্য সনাতন ব্রহ্মই এই অত্যাশ্চর্য্যময় পরমাদ্ভুত, মহাস্থূল, বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত ও কৃতার্থ করিতেছেন! জগন্ময়ী মহামায়ার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা যেমন তাঁহার চিন্ময়ী মূর্ত্তির আভাস পাই, মহীধরের সেই দিগ্ব্যাপী সুবিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও আমার মনে হইল, যেন ইহাও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভূমানন্দেরই স্থূল প্রতিমা!

কিছুদূর হইতেই শ্রীকেদার-শৈলের অপার গাম্ভীর্য্য ও অনন্ত মহিমায় সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকায় এতক্ষণ আর কোন দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি যে, কোথায়, কি ভাবে, এতক্ষণ বসিয়াছিলাম—

তাহাও যেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অতুলপ্রভাবসম্পন্ন নগাধিরাজের অনন্ত মহিমায় আমা "আমিত্ব"টুকুকে হারাইয়া আমি এতক্ষণ যে, অননু-ভূতপূর্ব্ব পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। সেই "দেখা"তেই যেন আমার সকল দেখার অবসান হইয়াছিল! তাহার পর অল্পে অল্পে প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন আবার দেখিলাম যে, আমি নিজেই এক অতি মনোহর, পরম রমণীয়, বিচিত্র ফুল্ল কুসুমাস্তরণের উপর বসিয়া রহিয়াছি, তখন আমার বিস্ময় আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। নিতান্তই আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাহা এই চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও লেখনীমুখে ব্যক্ত হইবার নহে! তাহার পর আমি অতিশয় বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, শ্রীকেদারের সমগ্র সমতল ভূমি এবং তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চিরশুভ্র উত্তুঙ্গ গিরিগাত্রের নিম্নভাগ, নীহারমুক্ত হইয়াই এই সময়ে কত অসংখ্য জাতীয় বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট, চিরমনোজ্ঞ বিবিধ কুসুমরাশি এবং সুকোমল ও অতি সুশোভন তৃণগুল্মা-দিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই মহাদ্ভুত, চির-প্রফুল্ল, অতি মনোরম কুসুমোদ্যানের অপার সুষমায় অমরাবতীও যে, ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নির্নিমেষনেত্রে আমি যতই সেই পরমাদ্ভুত চমৎকার দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার দর্শনলালসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার চতুর্দ্দিকেই কেবল সেই সুবিস্তীর্ণ নব-বিকশিত অম্লান কুসুমরাশির বিচিত্রবর্ণে যথার্থই আমার চক্ষু যেন ঝলসিত হইল! যেন কত অসংখ্য মহামূল্য মণিমাণিক্য বিজড়িত এক অমূল্য দেবদুর্ল্লভ রত্নসিং-হাসনে বসিয়া আমি নিজেই কত সৌভাগ্যবানের ন্যায় শোভা পাইতেছি! ধনাধিপ কুবেরের ধনাগার নিঃশেষিত করিলেও বুঝি তেমন অদ্ভুত ও অমূল্য রত্নসিংহাসন নির্ম্মিত হয় না! আহা, তাহা এমনি চমৎকার এবং তাহার এমনি অতুল প্রভা! কত শত শত বিশ্বকর্ম্মার শিল্পচাতুর্য্য বিধ্বস্ত করিয়াই না জানি বিশ্বপতির এই মহা অপূর্ব্ব রত্নসিংহাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল!

যাঁহার নিমেষে কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয়াস্ত হয় এবং যাঁহার কটাক্ষে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্য নিয়মিত, সেই অনন্তশক্তিময়ী বিশ্ব-জননী, মহামায়ার সযত্নে রক্ষিত, স্বকীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যের সারাংশ দিয়া বিনির্ম্মিত, এই মহা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, পরমশিব ভোলানাথ, বুঝি বা তাঁহার বড় সাধের

শ্মশান-বাস ও শবাসনের কথা ভুলিয়া গিয়া মা জগদম্বার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। বাবা যে, আমাদের সর্ব্বত্যাগী হইয়াও অপার ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর এবং তিনি যে, চির-বিরাগী হইয়াও পরম অনুরাগী, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই যেন তাহা এই অমরধামে সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। গিরিরাজের নয়নতারা ও মেনকার প্রাণপ্রতিমা উমা যাঁহার অঙ্কশায়িনী, তিনি যে, সামান্য ভিখারী নহেন, সর্ব্বসৌভাগ্যারোপ্যদায়িনী মা জগদম্বা যেন তাহাই সকলকে দেখাইবার জন্য বাবার এই বিচিত্র ধামকে কেবল অপার ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকরভূমি করিয়া রাখিয়াছেন! বিশ্ব-রচয়িত্রীর অদ্ভুত ও অলৌকিক রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা ও চরম নিদর্শন, বিশ্বনাথের বিশ্বমন্দিরের প্রতি অণু পরমাণুতে সম্যক্ বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। মা সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছাতেই ভোলা দিগম্বরের এই সৌভাগ্যোদয়, সদানন্দময়ী মহামায়ার অতুল সোহাগেই পরমযোগী সদাশিবের আজ এত ঐশ্বর্য্য এবং বিশ্ব-বিমোহিনী ভবানীর ভ্রূকুটীভঙ্গেই তিনি যেন সদা তটস্থ হইয়া আছেন এবং তাঁহার মনোসাধ পূরণ করিবার জন্যই তিনি জটাজিন, ভস্ম ও ভুজঙ্গমাস্থিনিচয়ের পরিবর্ত্তে বিবিধ দেবদুর্ল্লভ বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত হইয়া তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্যে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। গিরিরাজনন্দিনী গৌরীকে বক্ষে ধারণ করাতেই যেন ভোলানাথের ত্যাগ ও বৈরাগ্য সব কোথায় পালাইয়া গিয়াছে! জগদম্বা পার্ব্বতীর ইঙ্গিতেই আমাদের নেংটা বাবার এত গৌরব ও এত প্রাধান্য! আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রেমালিঙ্গনেই সেই ত্রিগুণাতীত, সর্ব্বত্যাগী, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, পরম পুরুষ মহাদেব, এই বিশ্বরাজ্যের এক মাত্র অধিপতি হইয়া মহারাজরাজেশ্বরের অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত এবং অপার করুণাময়ী জগদম্বার সহিত সদাসম্মিলিত হইয়া এই বিশ্বরাজ্যের সুশাসন করতঃ স্বীয় অসীম কর্ম্মিষ্ঠতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া এই অপূর্ব্ব লীলাভিনয় করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলি, প্রথম ভাগ। অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলির নানা সংস্করণ ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতের নানা স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাবধানতার সহিত বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত সমগ্র গ্রন্থাবলি প্রকাশের চেষ্টা এই প্রথম। সম্প্রতি প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুমান ৪।৫ খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থাবলি শেষ হইবে।

এই গ্রন্থাবলিতে স্বামীজির ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতে প্রদত্ত সমুদয় বক্তৃতা, তাঁহার গদ্য পদ্য সমুদয় লেখা, বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যত লেখা আছে, তাহাদের ইংরাজী অনুবাদ, বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কথোপকথনের রিপোর্ট ও বিভিন্ন অভিনন্দনের উত্তর, তাঁহার সমুদয় পত্র (ইংরাজী এবং অন্যান্য ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনূদিত) তাঁহার জীবনচরিত ইত্যাদি স্বামীজির সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডে স্বামীজির এক একখানি বিভিন্ন প্রকারের ছবি দেওয়া হইবে।

এই প্রথম ভাগে সিষ্টার নিবেদিতা লিখিত Our master and his message নামক একটী মনোহর ভূমিকা এবং চিকাগো বক্তৃতা, রাজযোগ ও কর্ম্মযোগ এই তিনখানি সমগ্র গ্রন্থ ব্যতীত ১২টী বেদান্ত বিষয়ক অন্যান্য বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা প্রভৃতি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই গ্রন্থ ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্ট।

নারায়ণের জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপ দুঃস্থগণের সেবার্থ প্রতিষ্ঠিত এই উৎকৃষ্ট আশ্রমটীর বিবরণ আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছি। সম্প্রতি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদিও উক্ত বৎসর সাধারণ খরচের জন্য পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ৪৪০৲ টাকা অধিক পাওয়া গিয়াছে, তথাপি পূর্ব্ববৎসরে মাননীয় লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর বাহাদুর আশ্রমের উন্নতির জন্য যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই অর্থাভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। তিনি সাধারণের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, সম্পাদক মহাশয় যদি এই কার্য্যে কয়েক জন নিঃস্বার্থ উৎসাহবান যুবকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন, তবে মুদ্রিত আবেদনাদি অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্য হইতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশ্রমের উন্নতি প্রার্থনা করি।

না পাইয়া, তীর্থযাত্রায় কেবল তাঁহাদের কষ্টই সার হইল বলিয়া মনে করেন!

এইরূপ ভ্রান্ত একজন সাধুর সহিত একবার আমার কর্ণপ্রয়াগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার কথা শুনিলে সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইবেন এবং অতিসহজেই আমার কথার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমার উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের দ্বিতীয় বৎসরের পৌষ বা মাঘ মাসে, আমি একবার ৺কর্ণপ্রয়াগে আসিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি দেখিলাম যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেশীয়, জনৈক বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধু, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিয়া উম্মুক্ত অনাবৃত স্থানে বসিয়া আছেন, এবং সেই নিদারুণ শীত অসহ্য হওয়ায় বাবাজীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হইতেছে। বাবাজীর কষ্ট দেখিয়া আমিও একটু কষ্ট অনুভব করিলাম এবং তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি যেমন তাঁহার নিকট গিয়া বসিয়াছি, অমনি তাঁহার মনের কথা তিনি আমাকে বলিয়া একেবারে অবাক করিলেন! উত্তরাখণ্ডে আমার দীর্ঘকাল অবস্থিতির কথা শুনিয়া বাবাজী আমাকে তথায় স্পর্শ-মণির কোথাও সন্ধান পাইয়াছি কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন! বাবাজী নাকি শুনিয়াছিলেন যে একমাত্র ৺বদরিকাশ্রমেই স্পর্শ-মণি পাওয়া যায় এবং সেই অমূল্য রত্ন-লাভের আশাতেই তিনি অত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ৺বদরিকাশ্রমে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্তস্থিত লম্বা লৌহনির্ম্মিত চিম্‌টাটী ক্রমাগত গিরিগাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যখন তাহা কোথাও স্পর্শ-মণির আবিস্কার করিয়া সুবর্ণে পরিণত হইল না দেখিলেন, তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না! তাঁহার দগ্ধ ভাগ্যের দোষেই যে, তাঁহার চিম্‌টাটীর লৌহজন্ম ঘুচিল না, তাহা বলিয়া তিনি কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বদরিকাশ্রম যাত্রা ও যে সম্পূর্ণ নিস্ফল হইল, তাহা ভাবিয়া তিনি অতিশয় ম্রিয়মাণ! অনন্ত লীলাময়ী, প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ স্থল হিমালয়, দর্শন করিয়া তাহার প্রকৃত মহিমাবগত হইতে পারিলে মনুষ্য দেবত্ব লাভ করিয়া যে, অপার আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার তুলনায় স্পর্শ-মণি যে, অতি তুচ্ছ বস্তু, তাহা আমি কোনও মতেই সেই বাবাজীকে বুঝাইতে পারিলাম না। বরং তাঁহার অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান দিতে না পারায় তিনি আমার উপর বিরক্ত হইয়া আর আমার সহিত একটী

কথাও কহিলেন না! সাধুর আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি অতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম! এবং ৺বদরিকাশ্রম যাত্রী সাধুগণের মধ্যেও যে, এমন প্রকাণ্ড মূর্খ আছে, তাহা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, তথা কথিত শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এরূপ আত্ম-গুবীপ্রিয় গণ্ডমূর্খের অভাব নাই। সুতরাং আমার অকিঞ্চৎকর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকই যে প্রীতি লাভ করিবেন আমি আদৌ সে আশা করি না।

ক্রমশঃ

॥ মনের অবস্থাত্রয় ॥

(ব্রহ্মচারী তেজনারায়ণ।)

সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের মন জড়চৈতন্য সমচৈতনা ও পূর্ণ চৈতন্য এই তিনটি অবস্থায় সঞ্চরণ করে। সুষুপ্তিকালে মন যে অবস্থায় থাকে তাহাকে জড় চৈতন্য, জাগ্রতকালে যে অবস্থায় থাকে তাহাকে সমচৈতন্য ও তুরীয় অবস্থায় মনকে পূর্ণচৈতন্য, আখ্যায় নির্দেশ করিলাম। ইহাদের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের দুটি বিষয় জানা দরকার; প্রথমতঃ মন জড় কিনা। দ্বিতীয়তঃ জড় বিজ্ঞানের মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম।

মন জড় কিনা, ইহার উত্তরে হিন্দুদর্শনকারগণ দেখাইয়াছেন যে মন সুক্ষ্মভূতপ্রপঞ্চের দ্বারা নির্ম্মিত তাঁহারা কহেন যে, যদি মন ভূত সমষ্টি না হইবে, তবে কি রূপে জড়ের দ্বারা উহা পুষ্ট হয়। জড়ের সংযোগে জড়েরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি কেহ কিছুদিন অনাহার করে তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার মানসিক বৃত্তিও ক্ষীণ হইতে থাকে অবশেষে একেবারে লোপ পাইয়াও যায়। তৎপরে আবার যদি তাহাকে আহার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দৈহিক পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্ফূর্ত্তিও হইতে থাকে। বাস্তবিক আমরা আরও দেখিতে পাই, কেহ যদি কদন্ন আহার করে, তাহার মানসিক বৃত্তি ও কুৎসিত হইয়া আসে আর সাত্বিক আহার করিলে মনের প্রবৃত্তিও সাত্বিক হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, যেন আমাদের

আহার হইতে কোন সূক্ষ্ম অংশ গিয়া মনকে পরিপুষ্ট করে। আর ইহা যদি সত্য হয় যে, এই জগতে জড়ের আশ্রয় ব্যতীত কোনও শক্তি প্রকাশ হইতে পারে না এবং মন যদি আত্মার চিৎশক্তির অভিব্যক্তিকারণ হয়; তাহা হইলে মন যে জড় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

এখন জড়বিজ্ঞানের দুই একটি কথা বলা যাক। জড়কে প্রধানতঃ আমরা তিন অবস্থায় দেখিতে পাই, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। আরও আমরা দেখি যে, একটি বস্তুকেই এই তিনটি অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায়; মনে কর, জেমন জল। ইহার তিনটি অবস্থা বরফ, জল ও বাষ্প। একই বস্তু আভ্যন্তরিক উত্তাপের (latent heat) তারতম্যে এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্তি হয়। পরমাণুপুঞ্জ দুই শক্তির সংঘর্ষে এই দৃশ্যমান জগৎ প্রসব করিয়াছে। সেই দুই শক্তির মধ্যে একটির নাম পারমাণবিক আকর্ষণ অপরটির নাম পারমাণবিক বিকর্ষণ (molecular attraction and repulsion)। বস্তুতঃ ইহারা দুটী বিভিন্ন শক্তি নয়, এক শক্তিরই ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই দ্বিবিধরূপধারী শক্তির সমাবেশ বশতঃ পরমাণুপুঞ্জের উপর একটি ক্রিয়া আরব্ধ হয়; এই ক্রিয়াটীর নাম পারমাণবিক স্পন্দন (molecular vibration)। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ ও শব্দ সকলই এই একই স্পন্দনের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র; ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে।

এই জড়জগৎ শক্তিসমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত; অতএব এই জড়জগতে একেবারে স্পন্দনশূন্যতা অসম্ভব, আর যদি স্পন্দনের অপর নাম উত্তাপ বা আলোক হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুর আত্যন্তিক উত্তাপ হীনতা বা আলোকাভাব এই জড়জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত প্রত্যেক বস্তুতেই উত্তাপ আছে, প্রত্যেক বস্তুই আলোক বিকীরণ করিয়া থাকে; কেবল তাহার পরিমাণ ভেদে জড়ের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, আমাদের দৃষ্টি পটহ (retina) অভ্যাস দ্বারা এরূপ গঠিত হইয়া গিয়াছে, যে উহা সমস্ত প্রকার স্পন্দন গ্রহণ করিতে অক্ষম; কেবল বিশেষ প্রকারের স্পন্দনই গ্রহণ করিতে পারে; যদি স্পন্দনের বেগ তাহা হইতে অধিক বা কম হয়, তাহা হইলে উহা দৃষ্টি-পটহের অগ্রাহ্য হইয়া যায়। তাই সকল বস্তু আমরা

সকল অবস্থাতে দেখিতে পাই না, অবস্থা বিশেষে বস্তু বিশেষ দেখা যায়। উত্তাপ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ রূপ। সেই স্পন্দন বেগ যখন আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বকের উপর আসিয়া অঘাত করে, তখনই আমরা উত্তাপ প্রভৃতির অনুভব করি। মনেকর, তুমি একটি অন্ধকার কক্ষে বসিয়া আছ, তোমার সম্মুখে একখণ্ড লৌহ রহিয়াছে। যখন তুমি উহাকে গ্রহণ করিলে, তখন উহা অতি শীতল কঠিন এবং তমসাত্মক অর্থাৎ তুমি যাহাকে আলোক বল তাহা বিকীরণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এখন তাহাতে উত্তাপ দিতে থাক অর্থাৎ তাহার পারমাণবিক স্পন্দন শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাক : ক্রমে তুমি কি দেখিবে?—প্রথমে উহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে ও উহা অল্প অল্প লালও হইতেছে, পরে আলোর বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমে সমস্ত ঘর তাহারই আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার কাঠিন্য আর নাই, সে তরলাকার ধারণ করিয়াছে। যদি তুমি উত্তাপ বৃদ্ধি করিতেই থাক, তাহা হইলে উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর এবং তরল হইতে তরলতর হইতে থাকিবে; অবশেষে উহা এত উজ্জ্বল হইবে যে, তুমি আর দেখিতে পারিবে না, চক্ষে অন্ধকার বোধ হইবে ক্রমশঃ সেই লৌহ খণ্ডটি তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হইবে; আর তাহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহাদ্বারা আমরা কি দেখিলাম?—এক শক্তির তারতম্যে, এক স্পন্দনের অল্পাধিক্যে, এক বস্তুরই এতগুলি ভিন্ন প্রকাশ হইতেছে। আর কি দেখিতে পাইলাম,—এই বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে কেবল কতকগুলিই আমাদের অনুভব সাধ্য, অপর গুলি আমরা ধরিতে পারি না। সমস্ত জড়, কি সূক্ষ্ম, কি স্থূল সকলই এই এক নিয়মের অধীন।

এখন আমাদের মন যে একটী জড় পদার্থ:ইহা পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে; তাহা হইলে ইহাও উক্ত নিয়মে পরিচালিত। এখন সাধারণ জড়ের নিয়মাবলি মনের উপর খাটাইয়া দেখা যাক। আত্মা চিৎঘনরূপ, চৈতন্য শক্তি আত্মারই ধর্ম্ম। চৈতন্যের অপর একটী নাম দেওয়া যাইতে পারে—উদ্ভাসক শক্তি; ইহাই বস্তু সকলের উদ্ভাসক। মন আত্মার অতি নিকটতম প্রদেশে অবস্থিত, কারণ, ইহা ভূতপ্রপঞ্চের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম, এখন এই মন আত্মার সান্নিধ্যহেতু তাহার চিৎশক্তির দ্বারা অভিভূত হয়; যেমন অগ্নির নৈকট্য বশতঃ অন্যবস্তুও উত্তপ্ত হইয়া

উঠে, ইহাও ঠিক সেই রূপ। তাই আত্মার চিৎশক্তি দ্বারা মনের স্পন্দন ক্রিয়া আরব্ধ হয় এবং তখনই সে অন্যবস্তুর উদ্ভাসন করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এখন যে মন আত্মা হইতে যতদূরে অবস্থিত অর্থাৎ যত স্থূল, আত্মার চিৎশক্তি দ্বারা উহা ততকম চৈতন্যময় অতএব উহার স্পন্দন বা ক্রিয়া ততকম, অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত লৌহ খণ্ডের ন্যায় তমসাত্মক, অন্যবস্তু উদ্ভাসনে অক্ষম। মনের এই অবস্থাকে আমরা অজ্ঞান, তামসিক বা জড় অবস্থা বলি। আমি উহাকে জড় চৈতন্য কহিলাম, কারণ সে অবস্থাতেও পূর্ব্বদৃষ্টান্তোক্ত লৌহখণ্ড কঠিন ও শীতল হইলেও যেমন উহাতে উত্তাপের আত্যন্তিক অভাব হয় না, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় চৈতন্যের অত্যান্তিক পরিশূন্যতা ঘটে না। যে চৈতনাটুকু তখন থাকে সে কেবল স্বাস্তিত্বজ্ঞাপক। সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া আমার অনুভব হয় "আমি অচৈতন্য হইয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এখন সুষুপ্তিকালে মন যদি বাস্তবিক সম্পূর্ণ অচৈতন্য হয় তাহা হইলে সে অবস্থায় ঐ আমিত্ব জ্ঞান ও অচৈতন্যবোধ কোথা হইতে আসিল ? যখন দেখা যাইতেছে অজ্ঞানেরও জ্ঞান রহিয়াছে তখন যে এঅবস্থায় নিশ্চিৎ চৈতন্য রহিয়াছে তাহাতে আর কিছু সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা অতি অল্প। এই অবস্থায় জাগ্রতকালে প্রাপ্ত সংস্কার সকল অতি সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া উহার ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মনের ক্রিয়া না থাকা প্রযুক্ত সেই সংস্কার গুলির বিকাশও থাকে না যেমন এক খণ্ড লৌহ যখন উহা স্থূলতম অর্থাৎ কঠিন অবস্থায় থাকে তখন তাহার ভিতর মলা বা অন্য কিছু পদার্থ আছে, তাহা তুমি জানিতে পার না ; কিন্তু যখন আভ্যন্তরিক উত্তাপের (lalent heat) প্রকাশ করিয়া তাহাকে তরল করে তখনই তাহার ভিতরকার বস্তু ব্যক্ত হয়। সেই রূপ মনও চৈতন্যশক্তি দ্বারা যত অধিক স্পন্দিত হইতে থাকে, ততই তাহার ভিতরের সংস্কাররাশি পরিস্ফুট হয়।

চৈতন্য শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মন যেমন এই জড় চৈতন্যাবস্থা হইতে সমচৈতন্যাবস্থায় আসিতে থাকে, মধ্যে সে আর একটি অবস্থার ভিতর দিয়া যায়। ইহারাই নাম স্বপ্নাবস্থা। এই অবস্থায় মনের স্পন্দন এই টুকু মাত্র হয় যে উহাদ্বারা সে স্বগর্ভ নিহিত সংস্কার সমূহকে প্রকাশ করিতে পারে কিন্তু সে অবস্থায় সে বহির্জগত উদ্ভাসনে অক্ষম। ক্রমে চৈতন্য শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের স্পন্দন আরও বৃদ্ধি হয় তখন যে অবস্থাটি ফুটিয়া উঠে

তাহাকেই আমরা জাগ্রত বা চৈতন্যাবস্থা; (concious state) বলি আমি ইহাকেই সমচৈতন্যাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কারণ, এই অবস্থাতেই জড় এবং চৈতন্যের মধ্যে একটি সমতা (equilibrium) দেখিতে পাওয়া যায়। জড়ের জড়শক্তি (inertia) এবং চৈতন্যের চিৎশক্তি (mental vibration) ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপর তুল্যরূপ শক্তিমান হইয়া এই সাম্য আনয়ন করে! এই অবস্থায় মন জড়ও বটে কারণ অতি সূক্ষ্ম (অতীন্দ্রিয়) বস্তু সে অনুভব করিতে অক্ষম এবং বাস্তবিক তখন সে সমস্তটা চৈতন্যময়ও নয়, তাহার কিছু অংশ অচৈতন্য ভূমিতে (sub-conscious plane) অবস্থিত; আবার সে চৈতন্যও বটে কারণ সে স্থূল বস্তুর গ্রহণ করে এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তুর ক্ষীণ আভাস পায়। এই অবস্থায় মানসিক শক্তির যে নানা প্রকার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণও সেই এক মনের স্পন্দন। যাহার মন যত পরিমাণে আত্মার চিৎশক্তিগ্রহণে সক্ষম তাহার মানসিক স্ফূর্ত্তিও তত অধিক—সে তত সূক্ষ্মদ্রষ্টা।

তৎপরে যদি মনের স্পন্দন আরও অধিক বৃদ্ধি করা যায়, তখন মন তুরীয় ভূমিতে আরূঢ় হয়। মনের সেই তুরীয় অবস্থাকে পরচৈতন্য বা পূর্ণ চৈতন্য অবস্থা বলে (super-conscious state)তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ সমাধি অবস্থা বলি) এই অবস্থায় মন এত সূক্ষ্ম হইয়া আসে যে, সে আর স্থূল জড় দেখেনা, সে তখন জড়ের সূক্ষ্মভাবের উদ্ভাসক হয়, অতীন্দ্রিয় বস্তু সকল তখন তাহার দৃষ্টি গোচর হয়। এবং পূর্ব্বকথিত বাষ্পাবস্থায় লৌহের ন্যায় সে বিশ্বব্যাপক হইয়া পড়ে এই জন্যই সে অবস্থায় মন অনন্ত উপলব্ধির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্র জগৎ তখন অনন্তে মিশাইয়া যায়; এই ক্ষুদ্র "আমি" বিরাট "আমি"ত্বে পরিণত হয়। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার ন্যায়, ইহারও আকার ভেদ আছে। ইহার প্রথম অবস্থা হইতে অবস্থা বিশেষ পর্য্যন্ত মনের স্পন্দনের বৃদ্ধি ও চৈতন্যের ক্রম বিকাশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। এই অবস্থাকেই বোধ হয় আমাদের যোগবিদ্‌রা সবিকল্প সমাধি বলিয়াছেন। কারণ এ পর্য্যন্ত মনের মনত্ব আছে অর্থাৎ মন ও আত্মার, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের দ্বৈতবোধ রহিয়াছে। পরে এই সমাধি যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় তখন মন এত সূক্ষ্ম হইয়া আসে যে তাহার চৈতন্য হইতে পার্থক্য আর থাকে না, সে উহাতে বিলীন হইয়া যায়।

আধুনিক জড় বিজ্ঞানেরও এই মত যে জড়ের সূক্ষ্মতমাবস্থা ও শক্তি (force) এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য নাই বোধ হয়; এবং কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্‌রা এ পর্য্যন্ত বলেন যে শক্তির ঘন সন্নিবেশের নামই জড়বিন্দু (matter is the vertex of force)। এই অবস্থায় মন আর নাই, এক চৈতন্য, এক আত্মাই বিদ্যমান; জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান সকলই লয় হইয়া এক অবিভক্ত অবস্থা বিরাজ করে। এই অবস্থাকেই বোধ হয় যোগবিদ্‌রা নির্ব্বিকল্প সমাধি বলেন; এবং ইহাই বোধ হয় আমাদের দার্শনিকদের স্বরূপাবস্থান।

সংবাদ।

দুর্ভিক্ষ—গত শ্রাবণ মাসের ২য় সংখ্যায় ৬১৯০॥/৭পাই মোট জমা হইয়াছিল। তার পর কতকগুলি চাউলের থলে ১১।৶০আনায় বিক্রয় হয়। অতএব মোট জমা ৬২০১৶৴৭ পাই।

উক্ত সংখ্যা উদ্বোধনে খরচের দিকে নোয়াখালি জিলার কার্য্যে মোট খরচ ২৭১৮৸/০ আনার স্থলে ভুলক্রমে ২৭১৭৸৴৩পাই হইয়াছিল এবং তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত খরচগুলি বৃদ্ধি পাইবে—

বেলুড়মঠ হইতে যে সব খরচ হইয়াছে সেই তালিকায়—

বর্ত্তমান কার্য্যের রিপোর্ট ছাপান—৩৩।০

খুচরা	॥৶০	
পোষ্টেজ	৭৸/০	
অতএব এই তালিকার মোট	২৬৭॥৶৩	
সর্ব্বশুদ্ধ খরচ		৬০৭৭৸/৯পাই
হস্তে বাকি		১২৪/১০ „
মোট		৬২০১৶৴৭পাই

স্বামী অভেদানন্দ সম্প্রতি ইংলণ্ডে আছেন এবং অনেকেই আশা করেন যে তিনি তথায় ক্লাস করিবেন এবং বক্তৃতাদি দিবেন। তিনি ইংলণ্ডে পদার্পণ কালে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

গত জুলাই মাসে স্বামী বোধানন্দ কনেক্টিকাট প্রদেশের ওয়েষ্টকর্ণওয়াল নামক স্থানের আশ্রম পরিদর্শন করেন। তাঁহার আগমনে যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন সকলেই বিশেষ প্রীত এবং উপকৃত হন।

পিটস্‌বার্গ কেন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশ হেতু বন্ধ আছে।

স্বামী পরমানন্দ আশ্রমে থাকিয়া ক্লাস করিতেছেন।

অধ্যাত্ম সঙ্গীত।

রাম প্রসাদী সুর।

শ্যামা পদ সরোবরে আমার মন মীন খেল্‌তে ছিল।
লোভ জেলে মায়া জালে ভবের হাটে তুলে দিল॥
মদন মদ মাৎসর্য্য, ক্রোধ খরিদ্‌দার হল,
যখন যে পায়, যার হাতে যায়, আছ্‌ড়ে অচেতন করিল॥
পিছ্‌লে পাছে পলায় মীন, পাপ পাঁশ গায় মাখাল,
অঙ্গের শীতল জল, পাঁশেতে সব টেনে নিল॥
প্রবল দস্যুর হাতে, কতক্ষণ প্রাণ থাকে বল,
অন্তরে জল ছিল বলে, এখন প্রাণ রহিল॥
লক্ষ্মী বলে ঐ জলে, তলিয়ে গিয়ে খেলা ভাল,
ওরে এ জীবনে জীবন গেলে, পাবে চতুর্ব্বর্গ ফল॥

৺লক্ষ্মী নারায়ণ দত্ত।

স্বামী শিষ্য সংবাদ। *

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

স্বামীজি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী দুপুর বেলা বিশ্রাম করিতেছেন। শিষ্য আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিলেন স্বামীজি গোপাল লাল শীলের বাগান বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। শিষ্যকে বলিলেন চল্ আমার সঙ্গে গাড়ীতে যাবি এখন্। উভয়ে গাড়ীতে চলিয়াছেন। বাগবাজারে গঙ্গা দর্শন হওয়ামাত্র স্বামীজি আপন মনে পড়িতেছেন "গঙ্গা তরঙ্গ রমণীয় জটা কলাপং ইত্যাদি"। স্তবের তাল তরঙ্গে যেন গঙ্গা ভাসিয়া চলিয়াছে। শিষ্য ভাবিতেছেন ইনি কি নিজেই নিজের গুণ পড়িতেছেন। একখানা রেল ইঞ্জিন বাগ্‌বাজার হাইড্রলিক্ ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। স্বামিজী শিষ্যকে বলিতেছেন "দেখ দিকি কেমন সিঙ্গির মত যাচ্ছে। শিষ্য বলিতেছে "ও ত জড়"। পেছনে ওর মানুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে।

স্বামীজি। বল্ দিকি চেতনের লক্ষণ কি?

শিষ্য। যেখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাই চেতন।

স্বামীজি। যেখানে জান্‌বি natureএর againstএ rebellion সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ। দেখ্‌না একটা সামান্য পিঁপ্‌ড়েকে মার্‌তে যা, সেও জীবনের জন্য একবার rebel কর্‌বে। যেখানে struggle, যেখানে rebellion সেখানেই জীবনের চিহ্ন, সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ। শিষ্য আমাদের এ দেশে ত আমরা চেতনবান হইয়াও সভ্যজগতের সাম্‌নে জড়বৎ হইয়া রহিয়াছি।

স্বামীজি। তোদের hypotnise করে ফেলেছে। তোদের রাজারা তোদের বল্‌ছে তোরা হীন—পরাজিত—তোদের কোন শক্তি নাই—তোরাও আজ হাজার বচ্ছর থেকে ভাব্‌ছিস্ আমরা হীন অকর্ম্মণ্য পরাজিত। ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস্। এ দেহও ত তোদের দেশের মাটী থেকে জন্মেছে। কিন্তু আমি ওরূপ ভাব্‌তে শিখি নাই। তাই দেখ্‌না তাঁর ইচ্ছায় যারা আমাদের এত হীন মনে করত তারা আমাকে দেবতার মত খাতির

---

* এই প্রবন্ধটি গত ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়।

করেছে। তোরাও যদি এমন ভাব্‌তে পারিস যে আমাদের ভেতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে এবং শক্তি যদি জাগাতে পারিস্‌ ত তোরাও আমার মত হতে পারিস্‌।

শিষ্য। ভাব্‌বার শক্তি কই। ছোটকাল থেকে এ কথা বুঝিয়ে দেয় এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টা নাই। লেখাপড়া কেবল চাকরী লাভের জন্য হচ্ছে বইত নয়। আমরাও তাই শিখে আস্‌ছি।

স্বামিজী। আমরা এসেছি তাই দেখাতে। তোরা এই তত্ত্ব শেখ্‌ বোঝ্‌ ও অনুভূতি কর্‌—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে এই ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্‌ উঠ—জাগ—আর ঘুমিও না। সাদা কথায় বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস massএর ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি centre করব—এবং এদের দ্বারা এই সকল কাজ কর্‌বার মতলব কর্‌ছি।

শিষ্য। অতি উত্তম Idea. কিন্তু সকলই অর্থসাপেক্ষ।

স্বামীজি। তুই কি বল্‌ছিস্‌, মানুষই টাকা করে টাকায় কখন মানুষ করে শুনেছিস্‌? তুই যদি কথায় কাজে এক হতে পারিস্‌ ত জলের মত টাকা তোর পায়ে এসে পড়্‌বে।

শিষ্য। মহাপুরুষরা ভাল ভাল কায করে যান্‌ বটে কিন্তু সময়ে আবার সব ভেঙ্গে যায়।

স্বামীজি। যে পরে কি হবে. সর্ব্বদা এভাবে, তার দ্বারা কোন কার্য্য হতে পারে না। তুই যা বুঝেছিস্‌ করে যা। কি হবে না হবে ও ভাববার দরকার কি? একটুকুত জীবন—তা আবার কি হবে না হবে ভাব্‌লে কি কোন কাজ হতে পারে?

বলিতে বলিতে গাড়ী বাগান বাড়ীতে পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে অনেক লোক স্বামীজিকে দর্শন করিতে বাগানে এসেছেন। স্বামিজী সকলের সহিত কথা কহিতেছেন। Mr. goodwin স্বামীজির কাছে গরুড়ের মত দাঁড়াইয়া আছে। যেন Service মূর্ত্তিমান্‌। শিষ্যের সঙ্গে ইতি পূর্ব্বে তার খুব পরিচয় হয়েছে। উভয়ে স্বামিজীর সম্বন্ধে Animated Conversation করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজি শিষ্যকে ডাকিলেন! বলিলেন—তুই কি কঠ-উপনিষদ কণ্ঠস্থ করেছিস্‌?

শিষ্য। না, পড়েছি। শঙ্করভাষ্য সমেত।

স্বামীজি। উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। আমার ইচ্ছা তোরা এখানা কণ্ঠে করে রাখ্। নচিকেতার শ্রদ্ধা, সাহস, বিচার ও বৈরাগ্য এগুলি—আন্‌বার চেষ্টা কর্। শুধু পড়্‌লে কি হবে?

শিষ্য। আপনি কৃপা করবেন্—যাতে অনুভূতি হয়।

স্বামীজি। ঠাকুরের কথা শুনেছিস্ ত—তিনি বল্‌তেন 'কৃপা বাতাস ত বইছে তুই পাল্ তুলে দেনা।' কেউ কারে কিছু কত্তে পারে রে বাপ? আপনার নিয়তি আপনার হাতে। গুরু কেবল এইটুকু বুঝিয়ে দেয়। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়। জল বায়ু কেবল সহায়কারী মাত্র।

শিষ্য। তবে বাইরের সহায়তাও ত চাই।

স্বামীজি। হাঁ চাই। তবে জানিস্ কি—ভেতরে না থাক্‌লে—শত সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সব্বারই একসময় হয়ে আসে। কারণ সবই ত ব্রহ্ম। বিকাশের তারতম্য মাত্র। সময়ে সব হতে পারে "কালেনাত্মনি বিন্দতি"।

শিষ্য। আমার যে দেরী শয়না। হবে হবে করে হয়ত কত জন্ম কাটায়েছি।

স্বামীজি। ভয় কি! যখন এসে পড়েছিস্—এইবারই হয়ে যাবে। মুক্তি—সমাধি—এসব জানিস্ কি কতগুলি প্রতিবন্ধ দূর করে দেওয়া আত্মা সূর্য্যের মত জ্বল্‌ছে। যেন তাকে মেঘে ঢেকেছে। সেই মেঘও সরিয়ে দেওয়া আর সূর্য্যেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ইত্যাদি"। এই যত যত পথ দেখ্‌ছিস্ সবই এই প্রতিবন্ধ দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। তা যে যেভাবে আত্মানুভব করেছে সে সেই ভাবে উপদেশ বলে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন। ইহাতে সর্ব্বজাতি—সর্ব্বজীবের সমান অধিকার। ইহাই—সর্ব্ববাদী সম্মত মত।

শিষ্য। হাঁ পড়ে শুনে এরূপ একটা আভাস পাই বটে কিন্তু আজও প্রত্যক্ষ হল না। প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ করে।

স্বামীজি। হাঁ এর নামই ব্যাকুলতা। এইটা যত বেড়ে যাবে ততই প্রতিবন্ধ রূপ মেঘ কেটে যাবে। ততই শ্রদ্ধার সমাধান হবে। ক্রমে আত্মা করতলমলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে হবে। আমাদেরও ঐরূপ হয়েছিল।

শিষ্য। আপনার ঐ গানটী বড় চমৎকার। "একরূপ অরূপ নাম বরণ ইত্যাদি"। যেন অনুভূতি করে ঐটী লিখেছিলেন।

স্বামীজি চুপ্ করিয়া রহিলেন। শিষ্য আবার বলিতেছেন—অনুভূতি না হইলে শাস্ত্র মাত্র পড়া বৃথা।

স্বামীজি। তা বই কি? এই অনুভূতিই ধর্ম্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার নিয়ম সকলেই মেনে চল্‌তে পারে। কতগুলি বিধি নিষেধ সকলেই পালন কত্তে পারে কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা। গোপী-উদ্দাম-উন্মত্ততা।

শিষ্য। কৃষ্ণলীলার ঐটে আমি ভাল বুঝ্‌তে পারি না।

স্বামীজি। ও একটা ভাব আছে। তবে জান্‌বি ওতেও একটু মেয়ে মানুসের গন্ধ আছে। হাজার কর—তবু পুরুষ মেয়ে এ ভাবটা কিছুতেই যায় না। আত্মজ্ঞানে লিঙ্গভেদ নাই।

বলিতে বলিতে 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কথা হইল। স্বামীজি বলিতেছেন জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। যেন rocketএর মত উঠেছিলেন, তার পর যে আঁধার সে আঁধার। কিন্তু সর্ব্বত্রই জয়দেব কেবল gingling of wordsএর দিকে বেশী নজর রেখেছেন। শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন বল্ দিকি গীতগোবিন্দের রচনায় কোথায় poetry খুব বিকাশ হয়েছিল?

শিষ্য। বোধ হয় অভিসার বর্ণনে।

স্বামীজি—হাঁ "পততি পতত্রে ইত্যাদি" ঐ line দুটীতে অনুরাগের-ব্যাকুলতার—culmination. আত্মদর্শনের জন্য ঐরূপ অনুরাগ হওয়া চাই। প্রাণের ছট্‌ফটি হওয়া চাই।

শিষ্য। কিন্তু বৃন্দাবনলীলা আমার কাছে কেমন মেয়েলি মেয়েলি বোধ হয়। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী।

স্বামীজি। হাঁ অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির। আবার গীতা—সিংহনাদে চারিদিক স্তব্ধ। মহাবীরত্ব—আবার তেমনি গভীর—শান্ত।

শিষ্য। কর্ম্মের এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্ত্তক হইয়াও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্ম্মহীন। অস্ত্র ধরিলেন না।

স্বামীজি। যে দিকে চাইবি শ্রীকৃষ্ণ perfect জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিযোগ সকলের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। তবে জান্‌কি এখন বাঁশী বাজিয়ে জীবের উদ্ধার হচ্চে না। এখন চাই খাঁড়া খরশান এখন চাই মার মার কাট কাট। ধনুর্দ্ধারী

রাম, মহাবীর, মাকালী এদের পূজা চাই। মায়ের পূজায় রক্ত চাই—নরবলি চাই।

শিষ্য। হাঁ মশায়, এখন এ অধঃপতিত জাতির আলোচাল কাঁচাকলায় উদ্ধার হবে না।

স্বামীজি। আমি এদেশে দেখ্‌ছি যারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, অধিকাংশ স্থলেই তারা full of morbidity—almost cracked brains and sometimes fanatic. মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন না আছে তোদের ইহকাল—না আছে তোদের পরকাল। দেশ ঘোর তমে ছেয়ে ফেলেছে। তাই ইহজীবনে দাসত্ব —পরলোকে অনন্ত নরক।

শিষ্য। পাশ্চাত্য দেশের রজোভাব দেখে আপনার আশা হয় কি যে তারা ক্রমে সাত্ত্বিক হবে।

স্বামীজি। বলিস্ কি? তারা বিরোচনের বংশ। মহারজোগুণসম্পন্ন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে! তাদের যোগ হবে না তবে কি আর্য সন্তানের বংশধরগণ—তোদের হবে। তোদের ভোগ দেখে আমার মেঘদূতের সেই "বিদ্যুৎ বন্ত ললিত বসনা ইত্যাদি" এর চিত্র মনে পড়ে। আর তোদের ভোগের হচ্ছে কি না ছেড়া কেঁথায় শুয়ে সেঁত্ সেঁতে ঘরে বছরে বছরে শোরের মত বংশবৃদ্ধি"। Begetting a band of famished beggers & slaves মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্ম্মঠ কত্তে হবে। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম—নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽনয়ায়।

শিষ্য। আমাদের মুনি ঋষিগণ ও কি খুব রজোসম্পন্ন ছিলেন?

স্বামীজি। তা নয় ত কি? এই ত দেশ জয় কর্‌তে কর্‌তে চলেছে এইত তাঁরা সুমাত্রা জাপানে প্রচারক পাঠিয়েছে। এই রজোগুণের ভেতর দিয়ে না গেলে কিছু হবার যো আছে কিরে বাবা?

রাত্রি হইয়াছে। Miss Muller এমন সময় আসিয়া পঁহুছিলেন। স্বামীজি শিষ্যকে তাঁহার কাছে পণ্ডিত বলিয়া Introduce করিয়া দিতেছেন। Miss Muller কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অল্প কথালাপের পর Miss Muler উপরে গেলেন। শিষ্য স্বামীজির সঙ্গে আবার নীচে নামিয়া আসিলেন।

স্বামীজি। দেখ্‌ছিস্ কেমন বীরের জাত এরা। কোথায় বাড়ী দূর! খুব বড় মানুষের মেয়ে। তবু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে কোথায় এসে পড়েছে।

শিষ্য। হাঁ মশায় আপনি খুব মজাই দেখালেন। কত সাহেব মেম আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত। একালে এ বড়ই আশ্চর্য্য।

স্বামীজি। কি হয়েছে এখন। শরীর যদি থাকে তবে আরো কত কি দেখ্‌বি তোদের মত উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোল পাড় কত্তে পারি। মান্দ্রাজেও জন কতক আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা কোথাও প্রায় জন্মেনা। কিন্তু এদের nerve এ শক্তি নাই muscle এ শক্তি নাই। Brain ও nerve দুটো সমানে develop না হলে হচ্ছে না। Iron nerve and great inteligent brain and the whole world is at your feet.

স্বামীজির খাবার হয়েছে। শিষ্যকে বলছেন চল্ আমার খাবার দেখ্‌বি। রুটী ও মাংস মাত্র খাবার হয়েছে। নিজে খাচ্ছেন ও শিষ্যকে দিচ্ছেন। শিষ্য আহ্লাদে প্রসাদ পাচ্ছেন রুটী খেতে খেতে বল্‌ছেন—মেলাই তেল চর্ব্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচী হতে রুটী ভাল। লুচী রোগীর আহার। রাত্রে শুক্‌নো খাবি। ভাত ফাত একেবারেই নয়। মাছ মাংস fresh vegetable এসব খাবি। মিষ্টি কম। খেতে খেতে বল্‌ছেন—হ্যাঁরে কখানা রুটী খেয়েছি? আর কি খেতে হবে? যেন স্মরণ নাই—খাচ্ছেন না কি? যেন বাহ্যজ্ঞান নাই যেন ভোলা মহেশ্বর। যথার্থ ভোলানাথই—যে স্বামীরূপে শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এ কথা কয় জনে জানে? বুঝিয়াই বা কয়জনে পেলে? ধন্য যাঁহারা এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছেন ধন্য যাঁহারা এই মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিয়াছেন!

শিষ্য কলিকাতায় ফিরিতেছেন। গাড়ী না পাইয়া হেঁটেই কলিকাতা যাচ্ছেন। আর রাস্তায় ভাবিতেছেন আবার কাল কখন স্বামীজিকে দর্শন কত্তে যাব। প্রাণও কলিকাতায় যেতে চায় না। পেছনে যেন মন্ত্র আকর্ষণে কে টান্‌ছে।

ক্রমশঃ

উদ্বোধনের প্রচলিত নিয়মানুসারে আগামী প্রথম পক্ষ কার্ত্তিকের উদ্বোধন বন্ধ রহিল। ২য় পক্ষ কার্ত্তিকের সংখ্যা ১৮শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে।

জগদম্বা।

(স্বামী বোধানন্দ।)

মনুষ্যের মনোগত ভাব বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেকেই মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে। এই স্বাধীনতা লাভের জন্যই সাধু ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন, দস্যু অপহরণ করিতেছে, ঘাতক হত্যা করিতেছে ও ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতেছে। এই ইচ্ছার প্রেরণায় সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই দুঃখের পার বা নিঃশ্রেয়স লাভে যত্নবান্ হইতেছে।

সংসার ভাল মন্দ দুইটী জিনিসের সংমিশ্রণ। কেহই এখানে নিরন্তর সুখ বা অবিচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করে না। তবে সুখ দুঃখের তারতম্য আছে। কেহ অধিক সুখ ও অল্প দুঃখ কেহ বা অধিক দুঃখ অল্প সুখ ভোগ করে। এই সুখ দুঃখের ধাতা কে বিচার করিয়া দেখিলে "কর্ম্ম" ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। যদি বল ইহার ধাতা ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বর পরম কারুণিক, ও সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে পরম কারুণিক ঈশ্বরের এরূপ নির্দ্দয়ের ন্যায় ব্যবহার কেন হইল? তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ তাহা হইলে জীবগণকে দুঃখভাগী না করিয়া নিরন্তর সুখী করিলেন না কেন? দয়াময় ঈশ্বরেরই বা কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার এইরূপ পক্ষপাতিত্বেরই বা হেতু কি?

এই প্রশ্নগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় জগতে এমন একটী শক্তি আছে যাহার প্রভাবে এই রূপ বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত চলিতেছে। সেই শক্তিই ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখের কারণ। দয়া বা করুণা এই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইতেছে, আবার নির্দ্দয়তা নিষ্ঠুরতা ও এই শক্তি-প্রসূত। এই শক্তিই জীবগণকে সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দান করিতেছে আবার এই শক্তিই রোগ ও মহামারীরূপে দুঃখবিধান করিতেছে। এই শক্তির অনুশাসনে জীব কর্ম্ম করিতেছে ও কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতেছে। এই অচিন্ত্য ও অব্যক্ত শক্তিই জগতের আদিকারণ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন খেলা মাত্র।

সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। একমতে এই বিশ্বসংসার জনৈক অসামান্য

বিশ্ব বহির্ভূত পুরুষের কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে। কুম্ভকার যে রূপ মৃত্তিকা সাহায্যে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণের দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ ঈশ্বর নামক এক শক্তিমান পুরুষের বুদ্ধিবলে তদ্বহিঃস্থ উপাদান সাহায্যে এই সংসার সৃষ্ট হইয়াছে। শুধু এই নহে, সংসার সৃষ্টির পর, সংসারের যাবতীয় সৎ ও ভাল বস্তু তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার যাবতীয় অসৎ বস্তু অর্থাৎ পাপাদি অপর এক অসৎ পুরুষ বা সয়তান দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর শুদ্ধ, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, তাঁহার দ্বারা অশুদ্ধ ও পাপময় দ্রব্য বা ভাবের সৃষ্টি কদাচ হইতে পারে না। এইমতাবলম্বিগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় অসীম ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্টও করিয়া থাকেন। যদি ঈশ্বর এইরূপ হইলেন, তাহা হইলে, সংসারস্থ যাবতীয় বস্তু তাঁহার অন্তর্ভূত হইবে। ইহার পুণ্য, পাপ, দোষ, গুণ, ভাল, মন্দ সমস্তই সেই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে তাঁহার অদ্বিতীয়, অসীম ইত্যাদি আখ্যা অপ্রামাণ্য হইবে। অদ্বিতীয় ও অসীম শব্দে আমরা বস্তু ভাব ও কারণান্তরের অভাব বুঝিয়া থাকি। আবার ঈশ্বরই যদি একমাত্র সদ্বস্তু হন, তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে উপাদানরূপ অন্য বস্তু কোথা হইতে আসিল? যদি বল উপাদান কিছু ছিল না তাঁহার ইচ্ছা বা শক্তিবলে বিশ্বোৎপত্তি হইয়াছে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে এই বিশ্ব সংসার বীজরূপে তাঁহাতেই নিহিত ছিল। বিশ্বসংসারের যাবতীয় ভাবও সুতরাং সেই ঈশ্বরে নিহিত ছিল অবশ্য স্বীকার্য্য। এই মতবাদিগণ কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পুণ্যের কর্ত্তা ঈশ্বর ও পাপের কর্ত্তা সয়তান। ইহা বলা ও যা, পুণ্যের কর্ত্তা ও পাপের কর্ত্তা উভয়কে সমশক্তিমান বলাও তাই। ইঁহাদের মতের দুইটী দোষ আছে। একটী এই যে, যে সংসার পূর্ব্বে ছিলনা সেই সংসারের উৎপত্তি। অপরটী ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাব। এইজন্য এই মতটী সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নহে। ইহা ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্য মতটী ন্যায় ও যুক্তি বিশিষ্ট। এইমতে সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই ইহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও বহুরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, স্বাস্থ্য রোগ প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্ব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বসংসার অব্যাকৃতরূপে তাঁহাতেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল এবং প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইবে। তিনিই বিভু, তিনি সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

মানুষ স্বভাবতঃ প্রতিমা বা প্রতীক উপাসক। যতক্ষণ আমরা এই ব্যবহারিক জগতের অন্তর্ভূত রহিয়াছি ততক্ষণ আমরা অমূর্ত্ত্য ব্রহ্মের উপাসনায় অক্ষম। যিনি বাক্য মনের অগোচর সেই নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ আরাধনা দেহ মন বুদ্ধি অভিমান বিশিষ্ট মনুষ্যদ্বারা সম্ভবপর নহে যদি আমরা আত্মাকে এই সমস্ত উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের স্বরূপ উপাসনার অধিকার জন্মিতে পারে। অথবা যতক্ষণ উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রহিয়াছে, ততক্ষণ আমরা সমূর্ত্ত্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা প্রতীক উপাসক। যেখানে একমাত্র সদ্ব্রহ্মই বর্ত্তমান সেখানে আর দ্বৈতভাব কোথা হইতে আসিবে? তথায় সাধক সমস্ত অভিমান শূন্য হইয়া সদ্ব্রহ্মেই অবস্থিত হন। তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকেনা। যেমন জলের বুদ্বুদ জলে মিশাইয়া গেলে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ সাধকও সেই অবস্থায় উপাধি ও অভিমান বর্জ্জিত হইয়া কেবল ব্রহ্মেই বিরাজ করেন। অতএব যে পর্য্যন্ত এই অদ্বয়স্থিতিলাভ না হয় সে পর্য্যন্ত সাধক দ্বৈত উপাসক—তিনি কোনও প্রতীক বা প্রতিমার উপাসনা করিতেছেন। প্রতিমা বলিলেই যে মৃত্তিকা প্রস্তর বা দারুময় পুত্তলিকা প্রভৃতি স্থূল পদার্থ বুঝিতে হইবে তাহা নহে। মন, বুদ্ধির দ্বারা যাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় তাহাও প্রতিমা। এই মনপ্রসূত প্রতিমা গুলিকে সূক্ষ্ম প্রতিমা বলা যাইতে পারে। স্থূল, সূক্ষ্মভেদে প্রতিমা উপাসনার বিশেষ ভেদ নাই। কারণ উভয়ই প্রতিমা। আবার সর্ব্বশক্তিমান, অসীম, অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা সসীম, সান্ত মন ও বুদ্ধির দ্বারা কখনও সম্ভব হয় না। যাহা মনবুদ্ধির গোচর তাহাই সসীম ও ক্ষুদ্র। অতএব সাধক যতক্ষণ এই দৃশ্যমান ব্যবহারিক জগতে অণুমাত্রও সম্বন্ধ রাখিয়াছেন অথবা যতক্ষণ তাঁহার অণুমাত্রও অভিমান আছে ততক্ষণ তিনি যাহা ভাবিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন বা উপাসনা করিতেছেন তৎ সমুদয়ই প্রতীকারাধনার অন্তর্ভূত। যখন তিনি মন বুদ্ধির অতীত হইতে পারিবেন, যখন "আমি আমার" ভাবের লেশমাত্রও থাকিবে না, যখন সাধকাভিমানও থাকিবে না, তখন তিনি কি অবস্থা লাভ করেন তাহা তিনিই জানেন। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাম্ কার্য্যার্থং ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা"। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিরাকর নিষ্কল হইলেও উপাসকগণের সৌকর্য্যার্থে মূর্ত্তিমান বা রূপবিশিষ্ট কল্পিত হইয়া থাকেন।